হামামাতুল বুশরা
(সুসংবাদবাহী পায়রা)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

“আমাদের পায়রা ক্রমবর্ধমান ভালোবাসার পাখা মেলে
ঠোঁটে শত-সহস্র সালামের ডালি নিয়ে
উড়ে যায় নবীজির দেশের পানে যিনি আমাদের প্রভুর প্রেমাস্পদ,
রসূলদের নেতা ও সৃষ্টির সেরা (সা.) ॥”

জনপদ-জননী মক্কা শরীফের অধিবাসী
পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের নামে-

হামামাতুল বুশরা
(সুসংবাদবাহী পায়রা)

লেখক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম

প্রথম প্রকাশ: রজব, ১৩১১ হিজরী, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ
প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ: ২০১১

অনুবাদক: মাওলানা ফিরোজ আলম, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.
প্রকাশনায়: আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

হামামাতুল বুশরা
(সুসংবাদবাহী পায়রা)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

হামামাতুল বুশরা
(সুসংবাদবাহী পায়রা)

প্রকাশনায়	**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ** ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ভাষান্তর	**মাওলানা ফিরোজ আলম** কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.
প্রকাশকাল	**নভেম্বর ২০১১**
সংখ্যা	২০০০ কপি
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
গ্রন্থস্বত্ত্ব	ইসলাম পাবলিকেশন ইন্টারন্যাশনাল
মুদ্রণে	**বাড-ও-লিভস্** বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Hamamatul Bushra
(The Dove of Glad Tidings)
Shushangbadbahi Payera

by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah and Imam Mahdi as
Translated into Bengali by
Maulana Feroz Alam
Pubilshed by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
ISBN 978-984-991-025-1

মুখবন্ধ

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) পবিত্র মক্কা নিবাসী তাঁর এক শিষ্যের মাধ্যমে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত আরবদের মাঝে তাঁর আগমন বার্তা ও এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ লাভ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ সনে অর্থাৎ তাঁর জামা'ত প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক যুগেই **'হামামাতুল বুশরা'** গ্রন্থটি আরবীতে রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি (আ.) একাধারে দাজ্জাল, ইয়া'জুজ-মা'জুজ, দাব্বাতুল আরয-এর আবির্ভাব, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ, নুযুলে ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা, তাঁর মুহাদ্দাস হওয়া, ফিরিশ্তাদের প্রকৃত পরিচয় ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এটা জ্ঞানপিপাসুদের জন্য জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার। এতে নতুন নতুন অনেক তথ্যের অপূর্ব সমাহার রয়েছে। এই পুস্তকের Title page-এ হযরত আকদাস (আ.) যে আরবী পংক্তিটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর হয়ে লিখেছেন সেটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য-

"আমাদের পায়রা ক্রমবর্ধমান ভালোবাসার পাখা মেলে
ঠোঁটে শত-সহস্র সালামের ডালি নিয়ে
উড়ে যায় নবীজির দেশের পানে যিনি আমাদের প্রভুর প্রেমাস্পদ,
রসূলদের নেতা ও সৃষ্টির সেরা (সা.) ॥"

পুস্তকটি আরবীতে রচিত বিধায় আমরা অর্থাৎ বাংলাভাষীরা এতদিন এই গ্রন্থের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। পাঠকবৃন্দ যেন এই জ্ঞানের অফুরন্ত প্রস্রবণ থেকে বঞ্চিত না থাকেন-এ জন্য এ বইয়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন এই পুস্তকটি বঙ্গানুবাদ করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এবং অন্যান্য যারা একাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দিন। আমীন।

এই বঙ্গানুবাদ খোদা-প্রেমিকদের জন্য সত্য চেনার পথ উন্মোচন করুক এ দোয়াই করি।

মোবাশশের-উর-রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
২০ নভেম্বর ২০১১

অনুবাদকের কথা

জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী একজন আরব, সৈয়দ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মক্কী ১৮৯২ সনে ভারত পরিদর্শনে আসেন। সফরকালে তিনি হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সংবাদ পান এবং কাদিয়ানে এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করেন। তিনি পবিত্র মক্কার আমের উপত্যকায় অবস্থিত তাঁর নিজ জনপদে ফিরে যাবার পূর্বে কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে কিছুদিন অবস্থান করেন। দেশে পৌঁছে তিনি ২০শে মহররম ১৩১১ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে প্রেরিত একটি পত্রে লিখেন, তিনি নিজ দেশে অনেক মানুষের কাছে তাঁর (আ.) বাণী পৌঁছিয়েছেন। চিঠিতে তিনি তাঁদের ইতিবাচক মনোবৃত্তি ও ধ্যান-ধারণাও তুলে ধরেছেন। সেই সাথে তাঁকে শুভসংবাদ দিয়ে বলেছেন, তিনি আমের উপত্যকার নেতা সৈয়দ আলী ত্বাই সাহেবকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। তিনি এতে বড়ই আনন্দিত হন আর তাঁর ঠিকানায় বই পাঠানোর অনুরোধ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে পত্র লিখতে বলেন যেন তা মক্কা শরীফের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও আলেমদের মাঝে বিতরণ করা যায়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এই পত্রটিকে সত্য প্রচারের জন্য অদৃশ্য হাতের সাহায্য বলে বিবেচনা করেন। একই বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সনে তিনি সম্পূর্ণ আরবী ভাষায় **'হামামাতুল বুশরা'** রচনা করেন যা রজব ১৩১১ হিজরী অর্থাৎ ১৮৯৪ এর একেবারে গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি স্বীয় দাবীর যথার্থতা ও নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে পূত:পবিত্র গ্রন্থ কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে নেয়া বহু সুস্পষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করেন; একইভাবে এমন সব বিষয়ও উত্থাপন করেন যা মুসলিম উম্মাহ্'র জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর মাঝে দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু, হযরত ঈসা (আ.)-এর নাযিল হবার তাৎপর্য এবং উম্মতের মাঝে তাঁর আগমনের প্রকৃত স্বরূপ উল্লেখযোগ্য। এর সাথে তিনি সে সকল আপত্তি জোরালোভাবে খন্ডন করেছেন যা তাঁর দাবীর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া প্রদানকারী আলেমরা উত্থাপন করেছেন। তিনি বইটি শেষ করেছেন একটি কবিতার মাধ্যমে যাতে তিনি যুগের রোগ-ব্যাধি ও রহমান

খোদার পথের দিশারী একজন পথ-নির্দেশকের আবশ্যকতা এবং নবীকূল-সর্দার আর জ্বিন ও মানবকূলের গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা-গীত গেয়েছেন। তাই এ পুস্তক আরবী ভাষাভাষীদের জন্য এক বিরল উপহার।

এ পুস্তকে টিকা ও পাদটিকা শেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাধারণত **'মিনহু'** (অর্থাৎ এটি লেখকের পক্ষ থেকে) লিখেছেন।

আরও কিছু টিকা রয়েছে যা এই সংস্করণে অনুবাদককে সংযোজন করতে হয়েছে যা ভিন্ন Font-এ রেখে মূল টিকা থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে। মূল বইটি আরবী ভাষায় আরব আলেমদের উদ্দেশ্যে লেখা বিধায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআন শরীফের আয়াতগুলিও টানা দীর্ঘ বাক্যের অংশ হিসেবে লিখেছেন। সেই রীতি ও স্বাদ অক্ষুন্ন রাখার জন্য আমরা কুরআন শরীফের আয়াতসমূহের সাথে অনুবাদ দেইনি। তাই পাঠকবৃন্দ দয়া করে আয়াতের অনুবাদ দেখে নিবেন।

এ পুস্তকের অনুবাদের কাজে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তারা হলেন-সর্বজনাব আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মনসুর আহমদ এবং মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। যাঁদের অবদান ছাড়া বর্তমান অনুবাদ হয়তো প্রকাশ করা সম্ভব হতো না তাঁরা হলেন জনাব আব্দুল মোমেন তাহের সাহেব (ইনচার্জ, আরবী ডেস্ক, লন্ডন) এবং মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব (মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ)। এ ছাড়া আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী, কেন্দ্রীয় আরবী ডেস্কে কর্মরত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। খোদা তা'লা তাঁদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দিন।

মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের আকুতি, এই কিতাব সত্যান্বেষীদের জন্য সঠিক সরল পথের দিশারী সাব্যস্ত হোক এবং তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাগণ এদ্বারা উপকৃত হোন। আমীন।

দোয়া প্রার্থী,

ফিরোজ আলম
ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

ঢাকা
২০ নভেম্বর ২০১১

লেখক পরিচিতি
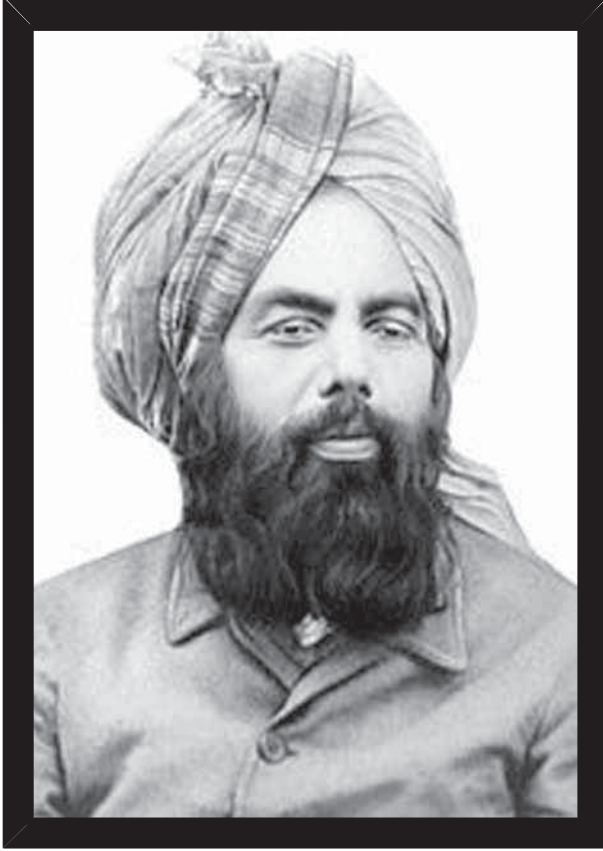
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর

বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২০০ টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল বা প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

সূচিপত্র

রহমান খোদার বন্ধুদের প্রতি যে শত্রুতা রাখে সে নিজ ঈমানকে হেলায় নষ্ট করে

আমি আমার কোন কোন গ্রন্থে বলেছি, আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে ঈমান থেকে বঞ্চিত রাখেন যারা তাঁর ওলীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এভাবে ঈমান নষ্ট হওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছু লোক আমার সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তারা বলে, আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসূলের জীবনাদর্শ অনুসরণের ফলে ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং কোন মুসলমানের শত্রুতায় ঈমানের ক্ষতি হতে পারে বলে আমরা মনে করি না বরং আমরা বলবো এসব উক্তির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই এবং এসব নিছক সন্দেহকারীদের সন্দেহ বৈ আর কিছুই নয়।

সুতরাং স্মরণ রেখ! এটি এত দুর্বল এক ধারণা যা হরিণ শাবক বা ঘুঘু-ছানার চেয়েও দুর্বল। এ ধারণাটি এমন প্রকৃতির লোকদের মাথায় চিন্তাশক্তির অভাবে উদ্ভব হয়েছে যাদের সুস্থ চিন্তা-ভাবনা লোপ পেয়েছে আর যারা পার্থিব জগতকে কৃপণের মত আঁকড়ে ধরে আছে এবং যারা নিগূঢ় ধর্মীয় তত্ত্ব সম্পর্কে উদাসীন।

এ সম্পর্কে মূল কথা হলো, গোটা মানব জাতিকে দেহ বিশিষ্ট এক মানুষের সাথে তুলনা করা যায়; যাদের কিছু হলো মাথা, কিছু হলো হৃদয়, যকৃত, পরিপাকতন্ত্র, বৃক্ক ও শ্বাস-প্রশ্বাসতন্ত্র তুল্য এবং তাঁরা মানব জাতির মূল নির্যাস; আর কিছু হচ্ছে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে মাথা, হৃদয় বা অন্য কোন প্রধান অঙ্গ সদৃশ বানিয়েছেন তাঁদেরকে মানুষ নামের জীবের জন্য জীবনের উৎস বা মূল নির্ধারণ করেছেন। মানুষ যেমন এসব প্রধান-প্রধান অঙ্গ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না তেমনিভাবে নবী-রসূল, সিদ্দীক, মুহাদ্দাস, শহীদ ও সালেহ্দের মত নেতাদের অস্তিত্ব ছাড়া মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত থাকতে পারে না। তাই স্পষ্টভাবে বুঝা গেল, ওলীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ।

সুতরাং নৈকট্যপ্রাপ্ত এই শ্রেণীর প্রতি যে চরম বিদ্বেষ ও বিবাদে লিপ্ত এবং এই প্রিয় গোষ্ঠির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যে বিরত হয় না, অনুশোচনাও করে না এবং খোদার কাছে আত্মসংশোধনের জন্য দোয়াও করে না, যে গালাগালি, অভিসম্পাত, হাসি-ঠাট্টা ও ঝগড়া বিবাদ অব্যাহত রাখে, খোদার দৃষ্টিতে তার চূড়ান্ত শাস্তি হলো ঈমান বিনষ্ট হওয়া। হিংসা, কদাচার ও অবাধ্যতার মাঝে তাকে ছেড়ে দেয়া। যার ফলশ্রুতিতে এক পর্যায়ে সে শয়তানের দলভুক্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর রহস্য হলো, খোদার প্রিয় বন্ধুরা (আওলিয়াউল্লাহ্) এমন এক শ্রেণীভুক্ত, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ভালোবাসেন

আর তাঁরা আল্লাহ্কে ভালোবাসেন। প্রভুর সাথে তাঁদের একটি দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। তাঁদের প্রতি তাঁর অনুপম দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম অনুগ্রহ থাকে। আল্লাহ্ ও তাঁদের মাঝে এমন কিছু রহস্যজনক ব্যাপার থাকে যা তাঁদের প্রেমাস্পদ (আল্লাহ্) ছাড়া আর কেউ বুঝে না। সুতরাং খোদা তা'লা তাঁদেরকে অভাবনীয়ভাবে ভালোবাসেন। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা রাখে তিনি তার প্রতি শত্রুতা রাখেন আর যে তাঁদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন তিনি তাঁর সাথে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক রাখেন। কেউ জানে না, কেন তিনি তাঁদেরকে এতটা ভালোবাসেন আর কেন তাঁদের জন্য ভালোবাসার সকল দাবীকে পূর্ণ করেন আর কেনইবা তাঁরা প্রিয়দের শ্রেণীভুক্ত হলেন!

খোদার রীতি হলো, তিনি তাঁদের হৃদয়কে সত্যে পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁদের হৃদয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানের ধারা সঞ্চালন করেন। তিনি তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র করেন এবং তাঁদের মাঝে পবিত্র প্রজ্ঞার পরিস্ফুটন ঘটান আর পরিণতি উপলব্ধি করার ও ধ্বংসস্থল সম্পর্কে সাবধান থাকার জ্ঞান দান করেন। সকল কল্যাণ তাঁদের দিকে প্রবাহিত করেন আর সকল অকল্যাণ হতে তাঁদের দূরে রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে কুরআনের তত্ত্ব ও নবী (সা.)-এর সুন্নতের জ্ঞান দান করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁদের লালন-পালন করেন ও নিজ পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁদেরকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতে ভূষিত করেন, একই সাথে এমন সকল বিষয় ও স্থান যা স্খলণের কারণ হতে পারে তা থেকে সুরক্ষিত রাখেন ও তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁদেরকে ইসলামের (সীমানা ও শিক্ষার) রক্ষণাবেক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করেন যা সকল কল্যাণের উৎসস্থল। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ কল্যাণের অফুরন্ত সঞ্জীবনী ধারা প্রতিনিয়ত তাঁদের দিকে প্রবাহিত হয় আর এই ঐশী প্রস্রবণের কল্যাণে তাঁদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকারের জ্যোতি বা আলোর ফুৎকার করা হয়। মানুষ চেষ্টা করে পুণ্যকর্ম করে আর তাঁরা করেন সহজাত প্রেরণায়। তাঁদের হাতে পুণ্যকর্ম তাঁদের সুস্থপ্রকৃতির তাড়নায় সাধিত হয়, কৃত্রিমভাবে নয়। যেভাবে ঝর্ণা প্রবল বেগে প্রবহমান থাকে এঁদের মাঝে (প্রকৃতিতে) সাধুতা সেভাবে বিরাজ করে। কঠিন কাজ সম্পাদনে অন্যদের যেমন কষ্ট হয় তাঁদের তা হয় না। ভয়ের মুহূর্তে তুমি তাঁদেরকে পর্বতের মত অবিচল দেখতে পাবে এবং চরম বিপদের সময় তাঁদের বীরত্ব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাঁরা চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হন এবং চরিত্র বিধ্বংসী সকল কাজকে তাঁরা এড়িয়ে চলেন। তাঁরা অপারগতায় নয় বরং ভালোবাসার প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর

সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন। বিপদের ভয়াবহতার ভয়ে নয় বরং খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা প্রাণ উজাড় করে দেন। নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে হলেও প্রভুর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁরা সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না। তুমি তাঁদের মধ্যে নোংরা স্বভাব ও মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করার অভ্যাস দেখবে না। তাঁরা (অর্থাৎ ওলীগণ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল এবং মানুষের চাওয়া-পাওয়ার, আশা-আকাঙ্খার মূল কেন্দ্র আর এতিম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন। তাঁরা পঙ্কিলতা, কুটিলতা এবং সকল প্রকার অন্ধকার থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা অলৌকিক ও ঈমানী ঐশী নূরের জ্যোতিতে বলীয়ান হয়ে থাকেন। তাঁদের হৃদয়-আঙ্গিনা এমন আধ্যাত্মিক প্রাণীকূলের বিচরণস্থল যারা অন্যদের কাছে ভয়ে ধরা দেয় না। তাঁরা খোদার দ্বারে সেজদাবনত অবস্থায় থাকেন। তাঁদের আত্মা তাঁর ভালোবাসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে। তাঁরা কুপ্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে পরিহার করেন। প্রবৃত্তি ও এর তাড়না কাকে বলে তা তাঁরা জানেন না। খোদা তা'লা নিজ প্রজ্ঞানুসারে যেভাবে চান তাঁদের পরিচালিত করেন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার ফলে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন। তারপর করুণাবশত তাঁদেরকে নিজ বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ, সাধুতা, পুণ্য ও সাফল্যের প্রতি আহবান করেন।

যারা তাঁদেরকে গ্রহণ করেন এবং প্রতিটি কথায়, কাজে ও ওঠা-বসায় তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরা যাঁদের আনুগত্যের বাহিরে যান না আর তাঁরা যেসব নির্দেশ দেন তা উপেক্ষা করেন না, তাঁরা সৌভাগ্য নিয়ে ঘরে ফিরেন, আর সৌভাগ্যবানদের ন্যায় সফলতা লাভ করেন। তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করেন, তাই তাঁরা কল্যাণমন্ডিত।

এক কথায়, এমন সম্মানিত লোকদের সেবা করা সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। তাঁদের ভালোবাসা তত্ত্বজ্ঞান লাভের কারণ হয়, তাঁদের ভালোবাসা খোদার ভালোবাসার নামান্তর। তাঁদের স্তুতির ফলে সফলতার বাগডোর লাভ হয়। পক্ষান্তরে তাঁদের দোষ খুঁজে বেড়ানো পাপাচারিতার লক্ষণ। তাঁদের দুর্বলতার সন্ধান পুণ্যকে মিটিয়ে দেয়। আন্তরিকভাবে তাঁদের ভালোবাসায় কষ্ট সহ্য করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চিত করে। যারা তাঁদের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয় না, তাঁদের জামা'তভুক্ত হয় না, তাঁদের দলে যোগ দেয় না বরং তাঁদের শত্রুতা করে এবং তাঁদের প্রতি বিরোধ রাখে, ঝগড়া করতে গিয়ে সীমাহীন ক্রোধ প্রদর্শন করে আর কথোপকথনের সময় ভদ্রতাকে জলাঞ্জলি দেয়, আল্লাহ্ এমন

মানুষদের সকল কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন এবং তিনি তাদের ধ্বংস করে দেন আর তারা খোদার ক্রোধভাজন হয়ে তাঁর শাস্তি ও অভিসম্পাতের শিকার হয়। খোদা তাদের হৃদয় থেকে ঈমানের স্বাদ ও তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেন আর ঐশী সাহায্য বঞ্চিত অবস্থায় তাঁদেরকে অন্ধকারে ক্ষতিগ্রস্তরূপে ছেড়ে দেন।

অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমরা যা বললাম তা-ই বিরোধীদের ঈমান নষ্ট হবার আধ্যাত্মিক কারণ। বাহ্যিক যেসব কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সত্য থেকে দূরে থাকে সে কারণগুলো তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট। আর তা হলো, তারা সকল কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে যুগ-ইমাম ও যুগ-খলীফার বিরোধিতা করে, অথচ তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং খোদার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত। অতএব যখনই তারা তাঁর বিরোধিতা করে এবং তাঁর পথকে পরিহার করে তখনই তারা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং সত্য ও সঠিক পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। এই দুর্ভাগ্য তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় আর পরিণতিতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এটি জানা কথা, সত্যের প্রতি ন্যায় ও অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে আহ্বানকারীর যে বিরোধিতা করে, ভ্রান্তির গহ্বরে নিপতিত হওয়া তার জন্য অবশ্যম্ভাবী। কারণ সে এমন ব্যক্তির বিরোধিতা করে যে খোদার পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, ভ্রান্তিমুক্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত। অধিকন্তু এটাও জানা কথা, বিরোধিতা বাড়ার পাশাপাশি বিরোধীরাও ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত হতে থাকে। ফলে সে যুগ ইমামকে প্রদত্ত সত্য, প্রজ্ঞা ও সততা ভিত্তিক প্রতিটি বিষয় প্রত্যাখ্যানে ব্যগ্র হয় বরং বলা যায়, এটি সেই চরম শত্রুতার অবধারিত পরিণাম। কেননা শত্রুতা যখন বাড়তে থাকে, তখন তা বিরোধীকে ক্রমশ দুর্বিনীত করে তোলে; ফলে একদিন সে চরম বিরোধিতা আরম্ভ করে, যা তাকে ধ্বংস করে এবং তার ঈমান হরণ করে আর সে লাঞ্ছিতদের সারিভুক্ত হয়। লক্ষ্য করো, তুমি যখন বুঝে–শুনে একটি পথ অবলম্বন কর আর এটিও জান যে, সে পথ সোজা পথ যা তোমাকে নিরাপদে গন্তব্য ও গৃহে পৌঁছাবে-কিন্তু তোমার সাথে যদি এক দুর্ভাগা শত্রু থাকে, তোমার প্রতি শত্রুতা যাকে এমন এক ভিন্ন পথ অনুসরণে প্রবৃত্ত করে যে পথে ডাকাত, হিংস্র প্রাণী, সাপ ছাড়াও অন্যান্য বিপদাপদও বিদ্যমান তাহলে সন্দেহাতীতভাবে সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলো। যদি সে ধ্বংস হয় তাহলে তোমার বিরোধিতাই হলো তার ধ্বংসের কারণ। সুতরাং চিন্তা কর আর খোদাকে ভয় কর, সদা সত্যবাদীদের সাথে থাকো। কোন সত্যবাদীকে কষ্ট দিবে না আর যে তাঁর সাথে যুদ্ধ করার মত পরীক্ষায় নিপতিত তাকেও

সাহায্য করবে না বরং যারা সে যুদ্ধের তামাশা দেখে তাদের সাথেও ওঠা-বসা করবে না। এরা কষ্ট দিয়ে ও দোষারোপ করেই সন্তুষ্ট। তারা এমন কথায় কান দেয় যার মাঝে তাঁর বিষয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের রেস থাকে। সুতরাং তওবাকারীর সাথে তওবা কর। কেননা পুণ্যবানরা এমন এক দলভুক্ত যদি আল্লাহ্ তাঁদেরকে সাহায্য করতে চান তাহলে নিজ সন্নিধান থেকে তিনি উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশ করেন আর শত্রুদের এমনভাবে ধৃত করেন যা তারা ভাবতেও পারে না। তিনি নিজ প্রিয় বান্দাদের কখনও লাঞ্ছিত করেন না। আমি তোমাকে পরামর্শ দেবো, তুমি তাঁদের সাথে ঝগড়া করবে না আর রুগ্ন বোধ-বুদ্ধি ও দুর্বল ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁদের কথার বিরোধিতা করবে না কেননা তোমার কাছে বইয়ের পাহাড় থাকলেও তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির সামনে টিকতে পারবে না। কারণ তাঁদেরকে তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে জ্ঞান ও গভীর ব্যুৎপত্তি দেয়া হয় আর তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে প্রদীপ্ত করা হয়, তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা হয়, তাঁদের ইন্দ্রিয় প্রখর করা হয় এবং খোদার হাত তাঁদেরকে স্খলন থেকে রক্ষা করে। তুমি প্রায়শঃ তাঁদের মুখ থেকে এমন সব কথা শুনবে যা তোমার দৃষ্টিতে কুফরি বাক্য আর মুরতাদের ধ্যান-ধারণা বলে মনে হবে। কিন্তু যদি তুমি ও তোমার মত ব্যক্তিরা তাঁদের কথা সম্পর্কে সুস্থ ও উদার মন-মানসিকতা নিয়ে চিন্তা কর আর আল্লাহ্‌র কাছে বোধশক্তির জন্য দোয়া কর তাহলে তুমি দেখবে, তাঁদের কথাগুলো প্রজ্ঞার পরিচায়ক ও তত্ত্বজ্ঞানের অমূল্য রত্ন। যদি পুণ্যবান হও তাঁদের কথা বুঝার পর তা গ্রহণ কর। আর যদি দুর্ভাগা হও তাহলে অস্বীকার করে চল, হঠকারীতায় লিপ্ত থাক আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পন্থা বেছে নাও। কিন্তু জেনে রেখো, পরিণতিতে নিজ ঈমানকে তুমি স্বয়ং ধ্বংস করবে আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা জেনে-শুনে নিজেদের ঈমানকে নষ্ট করে আর তারা হেদায়াত পাওয়ার নয়।

হে হতভাগা! ত্বরাপ্রবণ হয়ো না আর এমন এক বান্দা যাঁকে খোদা তা'লা মনোনীত করেছেন তাঁকে কাফির বলো না। তুমি জান, সে নামায পড়ে, রোযা রাখে, ক্বেবলামুখী হয় আর তুমি তাঁর মাঝে পুণ্যবানদের ছাপ এবং সুন্নত অনুসরণের লক্ষণও দেখতে পাও। তিনি যে পরাকাষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানের দাবী করছেন সে সম্পর্কে তাড়াহুড়ো করে কোন কথা বলো না কেননা ইসলামের অনুসারী এমন অগণিত মানুষ রয়েছেন যাঁদেরকে তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা দান করা হয়, কিন্তু একজন স্থুলবুদ্ধি ও কান্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি তাঁদের কথা বুঝতে পারে না। চিরসত্য ও সঠিক উৎস থেকেই তাঁদেরকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়। তাঁদের বুদ্ধি ও মেধার তীক্ষ্ণতা জাতির সম্মিলিত জ্ঞানের

তুলনায় অধিক প্রাধান্য রাখে। তাঁদের মেধা সকল প্রকার সূক্ষ্ম-বুদ্ধির চয়েও বেশি গভীরতা রাখে। তাঁদের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। শয়তান যখনই তাঁদের কোন ক্ষতি করতে চায় তখনই জ্বলন্ত ধূমকেতু তার পিছু ধাওয়া করে। তাঁদের তূণ খালি হয়ে গেলেও কোন তীর তাঁদের আঘাত করতে পারে না। তাঁদেরকে তত্ত্বজ্ঞানের সূক্ষ্মতায় সমৃদ্ধ করা হয়। ভাব প্রকাশে তাঁরা গভীর দক্ষতা রাখেন। তাঁদের উপস্থাপনা অন্যদের ব্যাখ্যার তুলনায় বেশী যুক্তিপূর্ণ হয় আর তাঁদের কথার ধরণ অত্যন্ত স্পষ্ট হয় আর নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাঁদের হৃদয় কল্যাণের পিছু ছুটে। তাঁরা জগতের জন্য ভিত্তি এবং ধর্মের জন্য খুঁটি স্বরূপ। তাঁদের পবিত্র অস্তিত্ব সৃষ্টিকূলের জন্য তেমনই গুরুত্ববহ, যেমনটি জীবনের ক্ষেত্রে আত্মা গুরুত্বপূর্ণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে খোদা তা'লা তাকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দেন। কখন তিনি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ধৃত করেন আবার কখনও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছাড় ও অবকাশ দেন। কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় এসে পড়ে তখন বজ্রপাতের অগ্নি তাঁর সঞ্চিত সব পুঁজিকে জ্বালিয়ে ভষ্মিভূত করে দেয় আর তাঁর অবস্থা এমন হয়ে যায় যেন তার কখনও কোন অস্তিত্বই ছিল না।

হে চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, হে চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা খোদা! আমি তোমার দয়ার ভিখারী। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন আর মানুষকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না এবং তাকে তত্ত্বজ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের পদমর্যাদায় উপনীত করেছেন। কল্যাণ ও শান্তি তাঁর সেই উম্মী নবী ও রসূলের প্রতি বর্ষিত হোক যিনি সকল নবী ও প্রেরীত শিক্ষককূলের নেতা এবং এমন লোকদের নেতা যাঁরা ওহীর আলোকে কথা বলতেন এবং যাঁরা প্রজ্ঞা ও ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানের কথা লিখে গেছেন। যিনি কখনও কলম ধরেননি এবং নিজের কোলে স্লেট রেখেও লিখেননি। অর্থাৎ তিনি বাহ্যত অক্ষর জ্ঞানহীন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সর্বোত্তম যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বের সকল সৃষ্টির তুলনায় তিনি শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। তাঁর সঠিক পথ প্রদর্শনকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত সাথী এবং পূত-পবিত্র বংশের প্রতিও শান্তি আর কল্যাণ বর্ষিত হোক।

অত:পর যা বলতে চাই তা হলো, আমার কাছে মক্কা শরীফ তথা তীর্থভূমি মক্কা থেকে একটি পত্র এসেছে। পত্র পাঠে অবগত হলাম, এ পত্র আমার হাতে বয়'আতকারী এক বন্ধু লিখেছেন। তিনি চান, আমি যেন আমার বিষয়টি মক্কাবাসীদের অবহিত করি। তাঁদের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখা আমার পছন্দ নয় বরং এমন কিছু কথা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা তাঁদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবে, এমন তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হবে যার মাধ্যমে তাঁদের মতামত, চিন্তাধারা ও

অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হবে। এক পর্যায়ে এ সংকল্প আমার হৃদয়ে ছেয়ে যায় এবং মক্কাবাসীদের জন্য আমার হৃদয়ে কিছু অপ্রকাশিত বিষয় ফুৎকার করা হয় আর এক পর্যায়ে আমার মন ও মনন এতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি তা এক পত্রে লিখে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলাম। এরপর মনে হলো, মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে আমি এটি পুস্তক আকারে সংকলিত করে ছেপে প্রচার করতে পারি যেন অনুসন্ধিৎসুদের জন্য তা এক প্রদীপ্ত সূর্য হিসেবে কাজ করে।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে এখন আমরা তা আরম্ভ করছি। কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে যে পত্রটি পেয়েছি তা তুলে ধরতে চাই। এরপর আমরা যে পত্র প্রেরণ করেছি তা লিপিবদ্ধ করবো। এ কাজে আমাদের সফলতা সেই খোদার হাতে ন্যস্ত যিনি তাঁর নিজ বান্দাদের বন্ধু এবং সবচেয়ে বড় দয়ালু।

মক্কা শরীফের এক সম্মানিত অধিবাসীর পত্র

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক এবং যুগ-মসীহ্ হযরত গোলাম আহমদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত, কল্যাণ এবং সর্বোত্তম অভিবাদন! খোদা সদা তাঁর সহায় হোন! হে বিশ্বজগতের প্রভু! তুমি এই দোয়া গ্রহণ কর।

পর সংবাদ হলো, আমি নিরাপদে ও মঙ্গলমত মক্কা পৌঁছেছি। আমি যখনই কোন বৈঠকে বসি, আপনাকে স্মরণ করি আর আপনার কথা বলি এবং পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে আপনি যে সকল দাবী করেছেন এর উল্লেখ করি। মানুষ শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়। কেউ কেউ সত্যায়ন করেন আর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমরা যেন শুভক্ষণে তাঁর দেখা পাই।

হজ্জের মাসের ব্যস্ততা শেষে যখন মহররম শুরু হলো আমি একদিন 'আলী ত্বাঈ' নামে আমার এক সাথীর বাড়ী অতিক্রম করতে গিয়ে তাঁর কাছে বসলাম। তিনি আমার কাছে ভারত এবং আমার সফর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমার যা জানা ছিল তাঁকে জানালাম এবং আপনার দাবী সম্পর্কেও অবহিত করলাম। আমি তাঁকে যতটা সম্ভব ভালভাবে বুঝিয়েছি। এতে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, তিনি একজন কোমল প্রকৃতির মহান মানুষ, একজন মু'মিন তাঁকে দেখলেই তাঁর সত্যায়ন করবে। আমি তাঁকে যে সকল কথা বুঝিয়েছি তিনি সকলের নিকট সেগুলো প্রচার করে যাচ্ছেন। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনি কবে মক্কা আসবেন? আমি তাঁকে বলেছি, খোদা চাইলে তিনি অচিরেই আসবেন।

আপাতত: নিজ দাবীর সপক্ষে আরবী ভাষায় তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লাহ্ চাইলে তিনি সেগুলো পাঠাবেন। এ কথাগুলোই আলী ত্বাঈ'কে আমি বলেছি। আমি যখন এ পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম তখন তাঁকে বললাম,

আমি আমাদের নেতাকে একটি পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন তিনি আমাকে বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর রচিত বইগুলো পাঠানোর অনুরোধ করুন আর তিনি নিজেও যেন শীঘ্রই মক্কা আসেন। উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ্‌র অনুমতি হলেই তিনি আসবেন। আমি তাঁকে আরো বলেছি, যদি অশান্তির আশংকা না থাকতো তাহলে তিনি যেসব বই লিখেছেন তা আমি ফেলে আসতাম না, সাথে নিয়ে আসতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি ভয় পেলেন কেন? আপনি তা নিয়ে আসলে ভাল হতো। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমাদের নেতাকে আমার নামে বই পাঠানোর অনুরোধ করে লিখুন। আমি তা বিতরণ করবো এবং মক্কার সম্ভ্রান্তদের এবং সকল শ্রেণীর আলেমদেরকে আমি এ সম্পর্কে অবহিত করবো। আমি কারো কথার ভ্রুক্ষেপ করি না। তিনি আরও বলেছেন, আমি জানি মু'মিন এই ব্যক্তির দাবীর কথা শুনে আনন্দিত হবে আর মুনাফিক ক্ষেপে যাবে।

আলী ত্বাঈ নামের উল্লেখিত এই ব্যক্তি আমের উপত্যকায় (ঘাঁটি) বসবাস করেন। তিনি একজন সম্পদশালী পুণ্যবান ব্যক্তি, বেশ কয়েকটি বাড়ী ও বিশাল ধন-সম্পত্তির মালিক এবং অনেক বড় ব্যবসায়ী। অতএব আপনি তাঁর নামে নিম্নের ঠিকানায় বই পাঠান, ইনশাল্লাহ্ তা মক্কা শরীফে পৌঁছে যাবে।

প্রাপক: আলী ত্বাঈ

খড় ব্যবসায়ী

মহল্লা: আমের উপত্যকা (ঘাঁটি), মক্কা শরীফ।

মৌলানা নূরউদ্দীন, মৌলানা হাকীম হোসামুদ্দীন এবং শ্রেণীভেদে ছোট-বড় সকল ভাইয়ের প্রতি সালাম রইল। বিশেষ করে ফযল দ্বীন, তাঁর ভাগ্নে এবং মৌলানা আব্দুল করীম প্রমুখকে। আমরা তাঁদের জন্য হেরেম শরীফে দোয়া করছি। আপনি আমার সহস্র সালাম গ্রহণ করবেন।

ইতি

বিনীত (সামাদ খোদার তুচ্ছ এক বান্দা)

মোহাম্মদ বিন আহমদ,

আমের ঘাঁটি

২০ মহর্‌রম ১৩১১ হিজরী।

উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আমার নিষ্ঠাবান বন্ধু

প্রিয় মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মাক্কী!

আমার ধর্মবন্ধু,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

পরসংবাদ, আপনার পত্র পেয়েছি এবং আগাগোড়া পড়েছি। পত্রে আপনি যা লিখেছেন এর প্রতিটি কথা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। আপনি ভালভাবে ও নিরাপদে স্বদেশ ও নিজ বাড়ীতে পৌঁছেছেন আর বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হতে পেরেছেন বলে আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ। মহাত্মন ও সম্মানিত সাইয়েদ আলী ত্বাঈ-এর সচ্চরিত্র, প্রশংসনীয় আদর্শ, সুন্দর গুণাবলী এবং আমার বৃত্তান্ত শুনে তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহবোধ এবং এতে তাঁর আনন্দিত হওয়ার যে চিত্রটি আপনি তুলে ধরেছেন এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। একই সাথে আমি এই সম্ভ্রান্ত, পুণ্যবান ও সুস্থচিন্তার অধিকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ এবং খোদার কাছে চিরকাল আপনার ও তাঁর জন্য কল্যাণ, বরকত, কৃপা ও করুণার ভিখারী।

আমার হৃদয়ে এ চেতনা সঞ্চার করা হয়েছে, তিনি একজন পবিত্রচেতা ও পুণ্যবান সুপুরুষ। আমাদের কাজে তিনি সহায়ক হতে পারেন। খোদা তা'লা তাঁর সুদৃষ্টি ও সদিচ্ছার কল্যাণে তাঁর মাধ্যমে আমাদের কিছু কর্ম সম্পাদন করবেন। খোদা যেভাবে চান স্বীয় ধর্মের সমর্থনে পরিকল্পনা করেন। আর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য যাকে চান মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগান আর নিজ ধর্মের জন্য যাকে চান সেবক নিযুক্ত করেন। আমি আমার অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে বুঝতে পেরেছি, আপনি আপনার পত্রে যে পুণ্যবান ব্যক্তির প্রশংসনীয় দিকগুলো তুলে ধরেছেন তিনি খোদার পথে একজন বীরপুরুষ আর

সত্য প্রকাশ, প্রচার, সত্যের সমর্থন ও একে সুদৃঢ় করার কাজে কোন সমালোচকের সমালোচনার ভয় তিনি করেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাঝে বীরত্ব, স্বচ্ছ চিন্তাধারা, দানশীলতা, খোদাভীতি ও তাকওয়াসহ অনেক প্রশংসনীয় গুণাবলী ও অনুপম নৈতিক চরিত্রের সমাহার ঘটিয়েছেন। যেভাবে আল্লাহ্ তাঁকে সম্পদ ও প্রাচুর্য প্রদানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, একইভাবে তাঁকে খোদার পথে নিষ্ঠা প্রদর্শন ও সংগ্রামের সুযোগ দিয়েছেন আর তিনি তাঁকে ইহকাল ও পরকালে নিয়ামতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। খোদা যখন বান্দার কল্যাণ চান এভাবে তাকে নিজ সন্নিধান থেকে ভাল কাজ ও পুণ্যকর্ম করার শক্তি প্রদান করেন এবং তিনি তাকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় ধর্মীয় কাজ করার, জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার, চিন্তা-ভাবনা করার, বই-পুস্তক প্রচারের ও অভিশপ্ত শয়তানী রীতি-নীতিকে লন্ডভন্ড করার বিষয়ে সোচ্চার হবার বিশেষত্ব প্রদান করেন। এক্ষেত্রে সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। সে যদি মনে করে, তাঁর নিজ প্রাণ উৎসর্গ করলে বা রক্ত বিসর্জন দিলে ধর্মের কল্যাণ হতে পারে তাহলে হাসিমুখে শাহাদত বরণে সে প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন সে নিজ দেহ, হৃদয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বুদ্ধি ও মেধা তথা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে খোদার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খোদার আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশের অনুগমনে নিয়োজিত করে আর প্রভুর বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও ঔদাসীন্য দেখায় না আর প্রতিটি মুহূর্ত সত্যের শত্রুর বিরুদ্ধে সাবধান থাকে। ভয়াবহ বিপদ ও যন্ত্রনাদায়ক কষ্টের আশংকা থাকলেও সে খোদার শিক্ষার প্রসার ও একে সমুন্নত রাখার জন্য কোমর বেঁধে নেমে যায়। সে বীরদর্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে অবতীর্ণ হয় আর ভীরুতা ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন কাকে বলে সে তা জানেও না। ভয়াবহ কোন দুর্দৈব এবং সর্বগ্রাসী কোন বিপদের মুখেও সে পিছিয়ে থাকে না এবং ধর্মের খাতিরে নিশিথে বাহন হাঁকায় আর এ লক্ষ্যে সকল বন্ধুর পথ ও উঁচু পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করে । এই সম্ভ্রান্ত যুবকের উপকারার্থে আমার নিজের অবস্থা এবং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমি যে হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত এর কিছুটা তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমি তাঁর সামনে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্পষ্ট করবো আর আমার জীবনের কোন কোন দিক সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করবো যেন তিনি আমার সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন আর বিশ্ব-প্রতিপালকের ইচ্ছা কী সে সম্পর্কে তিনি যেন চিন্তা করেন ও জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

অতএব, হে ভাই সকল! খোদা আপনাদের প্রতি করুণা করুন এবং আপনাদের

সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এ যুগে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে খোদা তা'লা জগতকে পাপাচার, কুফরী, শির্ক, বিদ'আত, বিভিন্ন প্রকার অবাধ্যতা এবং খ্রিষ্টানদের চক্রান্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেয়েছেন। তিনি আরও দেখেছেন, হৃদয়-জগৎ বিশৃঙ্খলায় ভরে গেছে। মানব বসতি হোক কিংবা কৃষিক্ষেত্র হোক সব জায়গা থেকে কল্যাণ নামের বিষয়টি উবে গেছে। জলে ও স্থলে ভ্রষ্টতা ছেয়ে গেছে আর সর্বত্র নৈরাজ্যবাদী বাহিনী প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং পুণ্যবানদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে।

তিনি দেখেছেন, মানুষ অর্থহীন ও ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট। তারা এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রতি এমনসব কথা আরোপ করে যেগুলো থেকে মুক্ত থাকাটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি আরও দেখেছেন, খ্রিষ্টানরা এক দুর্বল বান্দাকে খোদা বানিয়ে বসেছে আর তারা তার ঈশ্বরত্বের পক্ষে তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এক বিশাল জনগোষ্ঠিকে ইতোমধ্যে পথভ্রষ্ট করেছে। যেভাবে শয়তানের বংশ শয়তানের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে চলে সেভাবে প্রত্যেক রুগ্ন-হৃদয় ব্যক্তি তাদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে। তারা সূক্ষ্ম চক্রান্তের ভিত্তিতে প্রকাশ্য যাদু উপস্থাপন করছে।

তারা এমন সব চক্রান্তের জালে ফেলে মানুষকে নিজ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে যার কোন শেষ নেই। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ অগণিত মূর্তিপূজারী এবং বহু অজ্ঞ ও কান্ডজ্ঞানহীন মুসলমান তাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। মুরতাদরা তাদের (অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের) আনুগত্য স্বীকার করে মিথ্যাকে সত্য বানানোর অপপ্রয়াসে লিপ্ত। তারা তাদের ভ্রান্ত কথাবার্তার প্রতি ঈমান এনে মিথ্যা ধর্মে প্রবেশ করেছে আর ইসলাম ধর্মের পোষাক খুলে ফেলেছে, যার ফলে ভ্রষ্টতা তাদেরকে সর্বগ্রাসী বন্যার মত গ্রাস করছে। তাদের উপর বিপর্যয় সর্বগ্রাসী মহামারীর ন্যায় ছেয়ে গেছে এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এদেশে এমন কোন বংশ বা গোত্র নেই যাদের কেউ না কেউ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি। ইসলাম ধর্মের জন্য এটি এক ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছে যার কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না আর প্রথম যুগেও এর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া ভার। আমি যদি তাদের সকল নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত চিত্র আপনার সামনে তুলে ধরি তাহলে আপনি কেঁপে উঠবেন, আপনার হৃদয় ভীতি ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের সমস্যা দেখে আপনি কাঁদতে আরম্ভ করবেন।

ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্বের সপক্ষে তাদের কাছে প্রলাপসম একমাত্র যুক্তি হলো, তিনি নিজ শক্তিবলে সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন আর ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে মৃতকে জীবিত করেছেন এবং সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন, তিনি স্বয়ং স্থিতিশীল এবং অপরকে স্থিতিদাতা। তিনি হলেন স্বয়ং খোদা এবং খোদা হলেন স্বয়ং তিনি। এদের উভয়কে দু'টি পূর্ণাঙ্গীন সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিষের মত একাকার করে ফেলা হয়েছে আর এদের উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক দিক থেকে সাব্যস্ত। তিনি অনাদি, স্থায়ী আর তিনি হলেন অবিনশ্বর। একদিকে তারা সৃষ্টির মাঝে খোদার বিভিন্ন রূপ রয়েছে বলে দাবী করে অপরদিকে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে একে মসীহ্‌র দেহের মাঝে সীমাবদ্ধ করে, যার কোন স্পষ্ট প্রমাণ তাদের কাছে নেই।

তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালমন্দ করে এবং তাঁর প্রতি বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে। তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো, দোষারোপ করা বা তাঁকে অপমান করা ছাড়া তারা কোন কথাই বলে না। ইসলামের বিরুদ্ধে ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবমাননায় তারা সহস্র সহস্র বই লিখেছে এবং সেগুলোকে মুদ্রণের পর বিভিন্ন দেশে বিতরণ করে অভিশপ্ত ইবলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। যখন তাদের নৈরাজ্য এ পর্যায়ে পৌঁছলো এবং তারা সৃষ্টিকুলের একটি বিরাট অংশকে বিভ্রান্ত করলো, তখন দয়ালু ও সম্মানিত খোদা তাঁর নিজ বান্দাদের তদারকি এবং তাদেরকে কাফিরের খপ্পর হতে মুক্ত করতে উদ্বেলিত হলেন। তাই তিনি ধর্মের সমর্থন ও সংস্কার সাধনে, সমুজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থাপন করতে, এর বাগানকে সতেজ করার জন্য, নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা, নিজ প্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্তজনের সম্মান প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং শত্রুদের ক্ষতিগ্রস্থ প্রমাণ করার লক্ষ্যে নিজ বান্দাদের মধ্য হতে একজনকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে স্বীয় ইলহামের মাধ্যমে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। নিজ কৃপায় আমায় প্রতিপালন করেছেন আর আমাকে বুদ্ধি-মেধা প্রদানের মাধ্যমে জোরালো সাহায্য ও সমর্থন জুগিয়েছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে ঐশী জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন। আর এর সাথে দিয়েছেন নিদর্শন, যাতে আমার কাছ থেকে মানুষ অন্তর্দৃষ্টি ও দৃঢ়বিশ্বাসের সঞ্জীবনী সুধা লাভ করতে পারে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপ আমার জাতির জন্য! তারা আমাকে চিনেনি, মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে, গালমন্দ করেছে, কাফির আখ্যা দিয়েছে আর আমাকে সেভাবে অভিশাপ দিয়েছে যেভাবে কাফিরকে অভিশাপ দেয়া হয়। তাদের সকলেই পাষন্ডতা, কঠোর ব্যবহার, ক্রোধ এবং অগ্নিশর্মা মনমানসিকতা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ফুলের বিনিময়ে আমাকে কাঁটা উপহার দেয়া

হয়েছে, এরপরও তারা অন্যায় আচরণ থেকে বিরত হয়নি। তারা মহান হিতাকাঙ্খীর কথা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, অপরাধী জাতির জন্য যে সতর্কবাণী ছিল এটাকেও তারা ভুলে বসেছে আর এটাকে ভিত্তিহীন আখ্যায়িত করেছে। মানুষকে তার খোদার পথ অবলম্বন করা থেকে বিরত রেখেছে এবং নিজেদের ফুৎকারের জোরে সত্যের জ্যোতিকে নির্বাপিত করার হীন চেষ্টা করেছে। আমি যে পথই অবলম্বন করেছি তারা তাতে বাঁধা সৃষ্টি করেছে। তাদের দুস্কৃতির কারণে আমাকে অনেক কষ্ট ও বেদনা সইতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি তাদেরকে অত্যন্ত কোমলভাবে, নম্রতার সাথে সম্বোধন করেছি আর সর্বোত্তম হিতোপদেশ দিয়েছি। আমি পরম ধৈর্য প্রদর্শন করতঃ তাদের ছাড় দিয়েছি এবং মার্জনা করেছি। কেননা তারা সত্যের বিভিন্ন বিকাশ ও এর বিবিধ রূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান এবং এর উৎসকে চিনে না। তারা ঘুমন্ত মানুষের ন্যায় শুধু এপাশ ওপাশ করে।

তারা সত্যের নিগুঢ় তত্ত্বকে অনুধাবন ও এর স্বরূপ অনুসন্ধান না করেই সে সম্পর্কে আমার সাথে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। আমার বিরুদ্ধে যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে তারা কোন কিছু উপস্থাপন করতে অপারগ। আমার উপর তারা অজ্ঞ ও নির্বোধদের মত আক্রমণ করেছে। তারা গালমন্দ, কুফরিবাজি ও অপবাদ প্রদানের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার অলিক স্বপ্ন দেখে আর তারা এমন বিষয়ের অনুসরণ করে যার সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই আর সত্যিকার অর্থে তারা মুত্তাকীদের পথ পরিহার করেছে। তারা কুধারণা, অভদ্রতা, মিথ্যা রটনা ও সত্যের বিরোধিতা হতে কোনক্রমেই বিরত হয়নি বরং তারা শুধু মিথ্যা সাক্ষ্যই দিয়েছে আর বিতর্কের ক্ষেত্রে কেবল শয়তানী চক্রান্তেরই আশ্রয় নিয়েছে। যখন তাদের সৃষ্ট অশান্তির আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আর অশান্তির ধুম্রজাল সৃষ্টির জন্য তারা অগ্রসর হলো তখন আমি আমার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নিজ সন্নিধান থেকে সাহায্য ও সমর্থনের আকুতি জানিয়ে বললাম-

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ (সূরা আ'রাফ : ৯০)

তখন আমার প্রভু আমাকে নিদর্শনের মাধ্যমে সাহায্য করলেন আর আমার বিষয়টিকে কল্যাণের জ্যোতিতে আলোকিত করলেন এবং অনুসন্ধিৎসুদের কাছে আমার সত্যতা সাব্যস্ত করলেন। তবুও তারা আমার পথ ছাড়েনি আর তারা তাদের অপকর্মে ক্ষান্ত হয়নি। তারা মানতে অস্বীকার করেছে অথচ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে। তাদের অস্বীকার করার মনোবৃত্তি এবং হৃদয়ের কঠোরতা আমাকে বিস্মিত করে। তারা আমার সত্যতা ও

গৃহীত হবার লক্ষণাবলী দেখা সত্ত্বেও সত্যমুখী হয়নি আর প্রত্যাবর্তনের কোন মানসিকতাও তাদের নেই। বড়ই আক্ষেপ তাদের জন্য! তারা ঘটনার স্বরূপ বুঝে না, নিদর্শনকে গ্রহণ করে না বরং তা দেখে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং চোখ থাকতেও অন্ধ সাজে। আর তারা আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং ইসলামের জ্যোতিকে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় আর কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। সত্য স্পষ্ট ও সূর্যালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা সম্মানবোধ, হিংসা ও কার্পণ্য তাদের কাল্ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা লেপন করেছেন, যে কারণে তারা সত্যকে সেভাবে দেখে না যেভাবে চক্ষুষ্মান দেখে। তারা ইহুদীদের মত হয়ে গেছে। আচার-আচরণ, নিয়্যত ও সংকল্পের ক্ষেত্রে তাদেরই অনুকরণ করছে। দু'টি পদচিহ্ন পরস্পর যেমন সামঞ্জস্য রাখে এরাও তেমনিভাবে একাকার হয়ে গেছে আর এখনও এরা ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রতিনিয়ত এরা বাড় বেড়েই চলেছে।

হেদায়াত দানের মাধ্যমে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন আর যাঁদেরকে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এঁরাই আমার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে আর প্রদীপ্ত মন নিয়ে আমার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তাঁদের হৃদয়ের জ্যোতি তাঁদের সামনে আমার সত্যতার বিষয়টি প্রকাশ করে আর আমি তাঁদের যা বলি তাঁরা তা গ্রহণ করে। তাঁরা সেসব বোকা ও অজ্ঞদের মত নয়, বরং তাঁরা খোদাভীরুদের রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং সৌভাগ্যবানদের পথ অবলম্বন করে এবং পুণ্যবানদের শিষ্টাচারকে তাঁরা অনুকরণ করে। খোদা তা'লা তাঁদের প্রতি নিজ পক্ষ থেকে প্রশান্তি দান করেছেন এবং তাঁদেরকে বিশ্বাসীদের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তাঁরা খোদাকে ভয় করে চলে এবং খোদার মহান মর্যাদার কথা মাথায় রেখে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাঁরা সে ব্যক্তির মত নন যে পরকালকে ভুলে বসে থাকে ও এ সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে, ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভালোবেসে তার পিছু ছোটে এবং পুণ্যবান লোকদের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয় আর পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়িয়ে বেড়ায়, পৃথিবীবাসীদের পথভ্রষ্ট করে এবং মু'মিন জাতিকে কাফির আখ্যা দেয়।

আমার বন্ধুরা সকলেই মুত্তাকী কিন্তু তাঁদের মাঝে অন্তর্দৃষ্টিতে যিনি সবচেয়ে প্রখর, সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে নমনীয়, বিনয়ী, ঈমান ও আত্মসমর্পনের পরাকাষ্ঠা, ভালোবাসা, তত্ত্বজ্ঞান, খোদাভীতি, বিশ্বাস ও অবিচলতায় সবচেয়ে দৃঢ় ব্যক্তি হলেন একজন সুপুরুষ! তিনি সম্মানিত মুত্তাকী, পুণ্যবান আলেম,

ফকীহ, মুহাদ্দিস, মহিমান্বিত সিদ্ধহস্ত চিকিৎসক, মহা মর্যাদাবান, হাজীউল হারামাইন, হাফেযে কুরআন, কুরাইশ গোষ্ঠীভুক্ত হযরত উমর ফারুকের বংশোদ্ভুত, তাঁর উৎকৃষ্ট উপাধিসহ তাঁর সম্মানিত নামটি হলো ভেরানিবাসী মৌলভী হাকিম নূরউদ্দীন। ইহকালে ও পরকালে খোদা তাঁকে প্রভূত প্রতিদানে ভূষিত করুন। যাঁরা আমার হাতে নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সাথে বয়'আত করেছেন তাঁদের মাঝে তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি। খোদার খাতিরে জগত বিমুখতা, ত্যাগ স্বীকার ও ধর্মসেবার ক্ষেত্রে তিনি এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্নভাবে ইসলামের নামকে সমুন্নত করার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেছেন। আমি তাঁকে এমন আন্তরিক লোকদের অন্যতম দেখতে পেয়েছি যাঁরা খোদার সন্তুষ্টিকে অন্য সকল আকর্ষণ তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির তুলনায় প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আমি তাঁকে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেয়েছি যাঁরা খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকে এবং যাঁরা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সম্পদ ও প্রাণ উজাড় করে দিয়ে চেষ্টা করে, যাঁরা সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞ চিত্তে জীবন কাটায়। তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী একজন সুপুরুষ, স্বচ্ছ প্রকৃতি সম্পন্ন সহিষ্ণু, সম্মানিত এবং উত্তম গুণাবলীর ধারক, যিনি জৈবিক বা দৈহিক কামনা-বাসনা দমনকারী। তিনি কোন নেকীর সুযোগ হাতছাড়া করেন না আর কোন কল্যাণের সুযোগ বিনষ্ট হতে দেন না বা পুণ্যের কোন স্থান ও সুযোগ তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ধর্মকে সমুন্নত রাখার খাতিরে স্বীয় রক্ত পানির মত প্রবাহিত করতে তিনি আগ্রহী। খাতামান নবীঈন (সা.)-এর ধর্মের সমর্থনে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়া, সকল পুণ্যের পথ অনুসরণ করা এবং বিদ্রোহীদের সৃষ্ট সকল নৈরাজ্যের মূলোৎপাটনে যে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়াই হলো তাঁর জীবনের পরম বাসনা। অতএব আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ, তিনি আমাকে দান করেছেন এমন এক পরম নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী, পান্ডিত্যের অধিকারী, মহিমান্বিত, ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ও গভীর চিন্তাবিদ, খোদা অন্বেষণে সচেষ্ট এমন এক মানুষ যিনি পরম আন্তরিকতার সাথে শুধু খোদার খাতিরে ভালোবাসেন, যাঁকে কোন প্রেমিক এই দৌড়ে হারাতে পারেনি। এছাড়া আমি খোদা তা'লার প্রতি এ জন্যও কৃতজ্ঞ কেননা তিনি আমাকে আলেম, পুণ্যবান ও তত্ত্বজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নিষ্ঠাবান ও মুত্তাকী এমন জামা'ত দান করেছেন যাদের চোখের পর্দা অপসারণ করা হয়েছে এবং তাঁদের হৃদয়কে নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ করা হয়েছে। তাঁরা সত্যকে দেখে চিনতে পারেন। খোদার পথে তাঁরা সদা পুণ্যকর্মে সচেষ্ট থাকেন আর অন্ধদের মত

আচরণ করেন না। তাঁদেরকে সত্যের বর্ষনোন্মুখ প্রবল বৃষ্টির কল্যাণ লাভের জন্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের মুষলধার বৃষ্টির পানি গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেয়া হয়েছে। তাঁদেরকে সত্য সুধা মাতৃদুগ্ধের মত পান করানো হয়েছে এবং খোদার ভালোবাসা লাভ ও তাঁর ক্ষমা প্রাপ্তির পথ অন্বেষণ তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র।

এঁদের একজন হলেন সম্মানিত আলেম মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মহান ভাই, সাইয়েদ মৌলভী মোহাম্মদ আহসান। খোদা জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর সাথী হোন এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁর সহায় হোন। তিনি একজন পুণ্যবান ও মুত্তাকী সুপুরুষ যিনি ইসলামের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখেন। নিজ ক্ষুরধার রচনাবলীর মাধ্যমে তিনি বিরোধী আলেমদের অজ্ঞতার ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছেন এবং তাদের আগুনকে নির্বাপিত করে সুস্পষ্ট আলোর দিশা দিয়েছেন, একইসাথে প্রবহমান ঝর্ণার পানি দিয়ে ক্রমবর্ধমান ফিৎনার ঝড়গুলোকে মিটিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি, কুরআন ও হাদীস সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানের বিশাল ভান্ডার দান করেছেন। হাদীস পর্যালোচনা ও এর শ্রেণী-বিভক্তির ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা বিস্ময়কর। দ্বিমত পোষণকারীরা তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এক মুহূর্তও টিকতে পারে না। তারা সকল ক্রোধ, কোপ, প্রতিযোগিতার বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ ও মনোসংযোগ সত্ত্বেও তাঁর ভয়ে সেভাবে পালিয়ে যায় যেভাবে গাধা সিংহের ভয়ে পালিয়ে থাকে। এটা সত্য ও নিষ্ঠাবানদের প্রতি খোদার সাহায্য বৈ আর কিছুই না। একই সাথে তিনি পবিত্রচিত্ত, খোদাভীরু, আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রচুর ক্রন্দনে অভ্যস্ত এক ব্যক্তি যিনি খোদার মহিমা অনুধাবন করে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং দীনহীনদের মত জীবন যাপন করে থাকেন।

এ হলো আমার বন্ধুবর্গের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা আমি আপনার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি। এটি আমার প্রভুর অনুগ্রহ ও তাঁর অপার রহমত বৈ কিছু নয়। শৈশব কাল থেকে আর যখন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি আমার প্রতি তাঁর একান্ত স্নেহশীল আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার অভিভাবকত্ব করেছেন এবং আমায় লালন পালন করেছেন। আর এভাবেই তিনি খাঁটি আরব বংশোদ্ভুত লোকের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ করিয়েছেন। তাঁরা আন্তরিকতা ও স্বচ্ছ হৃদয়ে আমার হাতে বয়'আত করেছেন। আমি তাঁদের ভেতর আন্তরিকতার জ্যোতি, সততার ছাপ এবং সকল প্রকার পুণ্যের লক্ষণ দেখেছি। মহান তত্ত্বজ্ঞানে তাঁরা সমৃদ্ধ বরং তাঁদের কেউ কেউ জ্ঞান ও সাহিত্যে অসাধারণ দক্ষতা রাখেন আর তাঁদের নিজ জাতির মাঝে সুপরিচিত। এঁদের কেউ কেউ আমার সত্যায়ন করে আমার দাবীর পক্ষে এবং অস্বীকারকারীদের যুক্তি খন্ডন

করে প্রবন্ধ লিখেছেন।* আমি দেখেছি তাঁরা আমার সাথে প্রীতি ও ভালোবাসার গভীর সম্পর্ক রাখেন আর তাঁরা ভারতের একটি বিশেষ শ্রেণীর আলেমদের মত নন। তাঁরা বিষয়টি অনুধাবন করার পর হঠকারিতা দেখিয়ে অস্বীকার করেন না। এ কারণটিই আমাকে আরবী ভাষায় বই লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে এবং এসব সম্ভ্রান্ত ও সৌভাগ্যবানদেরকে তবলীগ করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছে।

আপনাদের কাছে আমার এ সকল পুস্তিকা পাঠানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি শুনেছি, পথে কিছু সরকারী কর্মচারী তল্লাশীর উদ্দেশ্যে সেসব বই খুলে পড়ে আর নীচ ধারণার বশবর্তী হয়ে এগুলো সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে। সুতরাং হে সম্মানিত ভাইয়েরা! আপনারাই বলুন, আমি তা কীভাবে পাঠাতে পারি? কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করলে এগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছুতে পারে? এ উদ্দেশ্য সাধনে আমি এখানে আমার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করছি। হে আরবের সম্ভ্রান্ত ভাইয়েরা! মনে প্রাণে আমি আপনাদের সাথে আছি। আমার প্রভু আমাকে আরবদের বিষয়ে শুভসংবাদ দিয়েছেন আর তাঁদের সাহায্য করার, সঠিক পথ প্রদর্শনের এবং অবস্থা সংশোধনের জন্য তিনি আমার প্রতি ইলহাম করেছেন। খোদা চাইলে আপনারা এ কাজে আমাকে সফল হতে দেখবেন।

হে সম্মানিত ভাইসকল! কল্যাণময় ও মহিমান্বিত খোদা ইসলামের সমর্থন ও সংস্কারের জন্য আমার নিকট বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং আমার প্রতি একাধারে কল্যাণবারি বর্ষণ করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর উম্মতের সংকট কালে আমার প্রভু আমাকে অনুগ্রহরাজী, কল্যাণবারি, বিজয় ও ঐশী সাহায্যের শুভসংবাদ দিয়েছেন। অতএব হে আরববাসী! আমি এই আধ্যাত্মিক নিয়ামতে আপনাদেরকেও অংশীদার করতে চাই। আমি অধীর আগ্রহে এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। সুতরাং বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মহান প্রভু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা কী আমার সাথে একীভূত হতে আগ্রহী?

*** টিকা :**

এ পুস্তিকার নাম হলো 'ইকাযুন নাস' (মানুষের জাগরণ), আমার এক প্রিয় বন্ধু, আলেম ও মুত্তাকী আস্‌সাইয়েদ মুহাম্মদ সাঈদ তরাবলুসী শামী আননেশার আলহামীদানী যিনি সিরিয়া নিবাসীদের মধ্য থেকে নিষ্ঠা ও সততার সাথে আমার হাতে সর্বপ্রথম বয়'আত করেছেন (তিনি এই পুস্তিকা রচনা করেছেন)। আমি এটিকে আমার এ পত্রে যোগ করেছি যেন সকল জ্ঞানী পাঠক তা থেকে উপকৃত হতে পারেন।

(লেখকের পক্ষ থেকে)

এ কথা সত্য, এদেশের আলেম সমাজের একাংশ নিরলসভাবে আমার অমঙ্গল কামনা করে আর আমার বিষয়ে দৈবদুর্বিপাকের অপেক্ষায় রত আর তারা আমার বিরুদ্ধে একাধারে কুফরী ফতোয়া লিখে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে আমি মনে মনে এ দোয়াই করেছি, হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা খোদা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্য পরিজ্ঞাতা! হে আমার আল্লাহ! তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত তুমি নিজেই এর সঠিক মিমাংসা করে দাও। তখন আমার প্রভু একান্ত দয়াপরবশ হয়ে নিজের পক্ষ থেকে শুভসংবাদ স্বরূপ আমার প্রতি ইলহাম করলেন এবং বললেন,

إنک من المنصورين. وقال": يَا أَحْمَدُ بَارَکَ اللّٰهُ فِيکَ، مَا رَمَيتَ إِذْ رميتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمَى، لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آباؤُهُمْ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ المجرِمينَ". **وقال** "قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي. هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَإِنَّا كَفَيْنَاکَ الْمُسْتَهْزِئِينَ". وقال" :أَنْتَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّکَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ وَمَا أَنْتَ بِفَضْلِهِ مِن مَجَانِينَ. وَيُخَوِّفُونَکَ مِنْ دُونِهِ. إِنَّکَ بِأَعْيُنِنَا. سَمَّيْتُکَ الْمُتَوَكِّلَ، يَحْمَدُکَ اللّٰهُ مِنْ عَرْشِهِ. وَلَنْ تَرْضَى عَنْکَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ واللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ". *

---

* **টিকা ঃ** (ইলহামের অনুবাদ)

'নিশ্চয় তুমি সাহায্যপ্রাপ্তদের অর্ন্তভুক্ত' এবং তিনি বলেন, 'হে আহমদ! খোদা তোমায় কল্যাণমন্ডিত করেছেন, যখন তুমি নিক্ষেপ করেছো তখন তুমি করনি বরং খোদা নিক্ষেপ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, তোমার মাধ্যমে সে জাতিকে সতর্ক করা যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি আর অপরাধীদের পথ যেন স্পষ্ট হয়ে যায়'। তিনি আরও বলেন, 'আমি যদি তা মিথ্যা রচনা করে থাকি তাহলে এর অপরাধ আমার বিরুদ্ধে বর্তাবে। তিনি স্বীয় রসূলকে হিদায়াত ও সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন সে একে সকল ধর্মমতের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করতে পারে, আল্লাহর কথা অলঙ্ঘনীয় আর আমরা উপহাসকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য যথেষ্ট'। তিনি আরও বলেন 'তুমি তোমার প্রভুর করুনায় স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আর তাঁর কৃপায় তুমি উন্মাদ নও, তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের বিষয়ে তোমাকে ভয় দেখায়, তুমি আমাদের স্নেহদৃষ্টিতে রয়েছো। আমি তোমার নাম মুতাওয়াক্কেল (খোদার প্রতি ভরসাকারী) রেখেছি। আল্লাহ্ আরশ থেকে তোমার প্রশংসা করেন। ইহুদী ও খ্রিষ্টান কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। তারাও ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করেন আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।'

(অনুবাদকের পক্ষ থেকে)

অতএব আল্লাহ্ তা’লা সেই মুসলমান আলেম সমাজকে ইহুদী শব্দের আওতাভুক্ত করেছেন যাদের কাছে বিষয়টি ইহুদীদের মতই ঘোলাটে হয়ে গেছে। যাদের অন্তর, আচার-আচরণ ও মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা, অপবাদ লেপন আর মিথ্যা প্রচারণা পরস্পর সদৃশ হয়ে গেছে। এসব আলেম নিজেদের কথা ও কাজে এবং ইসলামী সততার মান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (সা.)-এর তাকীদপূর্ণ নির্দেশকে পরিহার, পরিত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষকদের সামনে এই সামঞ্জস্য প্রমাণের পাশাপাশি তারা যে সীমালঙ্ঘণকারী তাও প্রমাণ করেছে।

এ নাম প্রাপ্ত হওয়ার পর আমি মনে করতাম, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আবির্ভূত হবেন আর আমিই যে সেই ব্যক্তি এ বিষয়ে আমার ধারণাই ছিল না। নিজের পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ যে রহস্য অগণিত বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা’লা গোপন রেখেছেন তা আমার কাছে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত আমি জানতেই পারিনি আমিই হলাম সে ব্যক্তি। আমার প্রভু তাঁর ইলহামে আমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন,

"يَا عِيسَى إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، إِنَّا جَعَلْنَاكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وأَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةٍ لا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ. وَأَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِى وَتَفْرِيدِى، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ".*

এটি সে দাবী, যা সম্পর্কে আমার জাতি আমার সাথে বিবাদে লিপ্ত আর তারা আমাকে মুরতাদ মনে করে। তারা সত্য ইলহাম লাভকারীর মাহাত্ম্য ও সম্মানের

---

* **টিকা ঃ** (ইলহামের অনুবাদ)

‘হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করবো আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের (দোষারোপ) থেকে তোমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করবো এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান করবো। আমরা তোমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম বানিয়েছি। আমার দৃষ্টিতে তোমার এমন এক অবস্থান রয়েছে যা সম্পর্কে সৃষ্টি অবগত নয়। আমার তৌহীদ ও একত্ববাদ আমার কাছে যতটা প্রিয় তুমি আমার দৃষ্টিতে তেমনিই পদমর্যাদা রাখ। নিশ্চয় তুমি আজ আমাদের কাছে সম্মানিত ও বিশ্বস্ত।

(অনুবাদকের পক্ষ থেকে)

তোয়াক্কা না করে তাঁর সাথে চিৎকার করে কথা বলে। আর বলে, সে কাফির, মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল। সরকারের পক্ষ থেকে যদি শাস্তির ভয় না থাকতো তাহলে তারা আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। আমার এবং আমার বন্ধুদের কষ্ট দেয়ার জন্য ছোট বড় সবাইকে তারা ক্ষেপিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সীমালঙ্ঘণকারীদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আমি সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদার নামে শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি একজন মু'মিন মুসলমান! আমি আল্লাহ, তাঁর সমস্ত কিতাব, সকল রসূল, সব ফিরিশ্‌তা ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখি আর এ-ও বিশ্বাস রাখি, আমাদের রসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং খাতামান্ নবীঈন। এরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলে, এ ব্যক্তি নবী হবার দাবী করে আর ঈসা (আ.) সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলে।* আর বলে, তিনি মৃত্যুর পর সিরিয়ায় সমাধিস্থ

** টিকা ঃ*

তারা বলে, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীসে ঈসা (আ.) ও প্রতিশ্রুত দাজ্জালের উল্লেখ যেভাবে করা হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয়, ঈসা ইবনে মরিয়ম দাজ্জালকে বধ করার জন্য আসবেন। আর প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ডান চোখে কানা এক ব্যক্তি হবে যেন তার চোখ স্ফীত আঙ্গুর সদৃশ। তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে কাফ-ফে-রে (ك ف ر) লেখা থাকবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম সদৃশ নিয়ামত ও আগুন থাকবে আর যাকে সে জান্নাত বলবে তা আসলে জাহান্নাম হবে। আর সে এমন এক চোখ বিশিষ্ট হবে যার ওপর একটা কঠিন পর্দা আচ্ছাদিত থাকবে। সে কোকড়া চুল বিশিষ্ট এক যুবক হবে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে আবির্ভূত হবে, সে ডান বাম সর্বত্র বিপর্যয় ডেকে আনবে। পৃথিবীতে তার অবস্থান হবে চল্লিশ দিন। কোন ক্ষেত্রে সে দিন বছর সমান, কোন স্থানে মাসের সমান আর কখনও সপ্তাহের সমান। আর বাকী অঞ্চলে তার দিনগুলো পৃথিবীবাসীদের সাধারণ দিন সদৃশ হবে। পৃথিবীতে তার গতি এমন মেঘ সদৃশ হবে যাকে বাতাস প্রবল গতিতে ধেয়ে বেড়ায়। সে আকাশকে নির্দেশ দেবে আর তা বৃষ্টি বর্ষণ করবে। সে জমিকে আদেশ দিবে আর তা ফসল ফলাবে। পৃথিবীর সম্পদ ভান্ডার তার সেভাবে আনুগত্য করবে যেভাবে মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির আনুগত্য করে থাকে। সে এক টগবগে যুবককে ডাকবে আর তাকে তরবারী দিয়ে সেভাবে দ্বিখন্ডিত করবে যেভাবে লক্ষ্য স্থির করে তীর নিক্ষেপ করা হয়। এরপর সে তাকে আহবান করবে আর সে চাঁদের মত হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার ডাকে সাড়া দেবে। দাজ্জালের এহেন দৌরাত্বের সময় আল্লাহ্ তা'লা মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.)-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দুই ফিরিশতার ডানায় ভর করে দু'টো জর্দা রং-এর চাদর পরিহিত অবস্থায় দামেস্কের পূর্ব দিকে একটি শুভ্র মিনারের কাছে অবতরণ করবেন। যখন তিনি মাথা নত করবেন তা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে

হয়েছেন। অধিকন্তু সে তাঁর অলৌকিক নিদর্শনাবলীতে ঈমান রাখে না। আর তিনি যে পাখির স্রষ্টা, মৃতদের জীবনদাতা, অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত এবং আজ

(চলমান টিকা)

আর যখন তিনি মাথা তুলবেন তখন সে সকল ফোটা মুক্তার মত শুভ্র দেখাবে। যে কাফিরের গায়েই তাঁর নিঃশ্বাস লাগবে সে অবশ্যই মারা যাবে। তাঁর নিঃশ্বাস তাঁর দৃষ্টির মতই সুদূর প্রসারী। তিনি তার পিছু ধাওয়া করে লুধ তোরণে তাকে ধৃত করবেন এবং হত্যা করবেন। এরপর ঈসা (আ.)-এর কাছে এক জাতি আসবে যাদেরকে আল্লাহ্‌ দাজ্জালের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁদের চেহারার মলিনতা দূর করবেন এবং জান্নাতে তাঁদের পদমর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর দাজ্জালের এ তান্ডব-লীলা চলাকালে আল্লাহ্‌ তা'লা ঈসা (আ.)-কে ওহী করে বলবেন, আমি এমন কিছু লোকের উদ্ভব ঘটিয়েছি যাদের সাথে যুদ্ধ করে জিততে পারে এমন দু'টো হাত কারো নেই। তাই তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে নিরাপদে পাহাড়ের দিকে চলে যাও। এমন অবস্থায় খোদা তা'লা ইয়াজুজ মা'জুজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে আসবে। তাদের প্রথম দলটি তাবরিয়া উপসাগরের পাশ দিয়ে পার হবার সময় এর সমস্ত পানি পান করে নি:শেষ করে ফেলবে, সেই বাহিনীর শেষ দলটি সেই পথ দিয়ে যাবার সময় বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল! তারা তাদের পথচলা অব্যাহত রাখবে আর যাত্রার এক পর্যায়ে তারা খামার পর্বতে পৌঁছবে যা বাইতুল মোকাদ্দাসের এক পাহাড়। তখন তারা বলবে, পৃথিবীবাসী সকলকে আমরা হত্যা করেছি। চল, এখন আকাশের অধিবাসীদের হত্যা করি। তখন তারা আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে আর খোদা তা'লা তাদের তীর তাদের প্রতি রক্তে রঞ্জিত করে ফেরত পাঠাবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ.) নিজ সাহাবীদেরসহ অবরুদ্ধ হবেন। তোমাদের কারো কাছে এখন একশত দিনার যেমন মূল্য রাখে সে অবস্থায় তাদের একজনের কাছে একটি বলদের মাথা এর তুলনায় অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। সুতরাং তখন আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ.) এবং তাঁর সাহাবীগণ খোদার কাছে দোয়া করবেন। ফলে খোদা তা'লা এদের ঘাড়ে এক প্রকার ফোঁড়া সৃষ্টি করবেন যার ফলশ্রুতিতে এরা সকলে একসাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। এর পর খোদার নবী ঈসা (আ.) এবং তাঁর সাহাবীগণ সমতল ভূমিতে অবতরণ করবেন কিন্তু বিঘত পরিমাণ জায়গাও তাদের লাশ ও এর দুর্গন্ধ থেকে তাঁরা মুক্ত দেখতে পাবেন না। এরপর খোদার নবী ঈসা (আ.) এবং তাঁর সাহাবীগণ দোয়া করবেন। তখন খোদা তা'লা এমন সব পাখি প্রেরণ করবেন যারা উট সদৃশ দীর্ঘ গলা বিশিষ্ট হবে। তারা তাদেরকে বহন করে যেখানে খোদা চাইবেন সেখানে নিয়ে ফেলবে। আর মুসলমানরা এরপর সাত বছর পর্যন্ত নিজেদের তীর, ধনুক ও অস্ত্র রাখার খোপগুলো পুড়িয়ে সময় কাটাবেন। এরপর খোদা তা'লা মুষলধারে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যার ফলে কোন কাঁচা ঘর বা তাঁবু অবশিষ্ট থাকবে না। তা ভূ-পৃষ্ঠকে বিধৌত করে পরিষ্কার করে

পর্যন্ত জীবিত আকাশে বসে আছেন সে এ বিশ্বাসও পোষণ করে না। আল্লাহ্ তা'লা যে তাঁকে ও তাঁর মাকে শয়তানী স্পর্শ ও এর যাবতীয় কুফল থেকে

(চলমান টিকা)

ফেলবে। পুনরায় ভূমিকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হবে, তুমি ফলফলাদি উৎপন্ন কর এবং বরকত ফিরে পাও। সে যুগ তখন এমন কল্যাণময় হবে যে একটি পুরো গোষ্ঠির জন্য একটি ডালিমই যথেষ্ট হবে এবং এর ছিলকা এত বড় হবে তাদের সকলেই সেই ডালিমের ছালের তলে ছায়া লাভ করতে সক্ষম হবে। আর তখন দুধে এত বরকত হবে যে, দুগ্ধবতী একটি উট কয়েক গোষ্ঠি মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে আর একটি দুগ্ধবতী গাভী এক গোত্রের জন্য এবং একটি দুগ্ধবতী ছাগল একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। এমনই এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা একটি নির্মল আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত করবেন যা তাদের বগলে গিয়ে লাগবে এবং যা সকল মু'মিন ও মুসলমানের রূহ কবজ করবে। তখন একমাত্র দুস্কৃতকারী শ্রেণী অবশিষ্ট থাকবে যারা গাধার মত পরস্পরের সাথে প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হবে এবং তাদের উপর কিয়ামত নেমে আসবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশের অভিপ্রায় নিয়ে পূর্ব দিক থেকে আসবে আর ওহুদ প্রান্তরের নিকটে পৌঁছুবে অর্থাৎ মদীনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। তখন ফিরিশ্‌তা তার মুখ সিরিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দেবে সেখানে সে ধ্বংস হবে আর তার ত্রাস মদীনায় প্রবেশ করবে না। মদীনার সেদিন সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে, প্রত্যেক দ্বারে দু'জন করে ফিরিশ্‌তা কর্তব্যরত থাকবে। পৃথিবীতে তার অবস্থান চল্লিশ দিন হবে আর সে চন্দ্রোজ্জ্বল একটি গাধায় চড়ে ঘুরে বেড়াবে, যার দু'কানের দূরত্ব হবে ৭০ গজ। তখন ঈসা (আ.) ন্যায়বিচারক ও মিমাংসাকারীরূপে (হাকাম-আদাল) আবির্ভূত হবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর বধ করবেন এবং যুদ্ধ রহিত করবেন। উট পরিত্যক্ত হবে, এতে চড়ে কেউ দূর-দূরান্তে ভ্রমন করবে না। মুসলমানদের একটি শ্রেণী সদা সত্যের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে আর কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা অপরাজিত থাকবে। তখন ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন এবং তিনি বিয়ে করবেন আর তাঁর সন্তান হবে। অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, দাজ্জাল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে জলজ্যান্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল আর তামীম দারী (রা.) তাকে দেখেছেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছেন, তিনি লাখাম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন সঙ্গীসহ একটি সামুদ্রিক জাহাজে যাত্রা করেন। একমাস তাঁরা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকেন এরপর তাঁরা সূর্য্যাস্তের সময় একটি দ্বীপে পৌঁছান। তারা অগ্রবর্তী নৌকায় বসে দ্বীপে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁদের সাথে এক কেশবহুল মারাত্মক নোংরা এক জীবের (দাব্বার) দেখা হয়, কেশাধিক্যের কারণে তাঁদের জন্য এর সম্মুখ আর পশ্চাত কোনটি তা বুঝা সম্ভব হয়নি। তাঁরা তাকে দেখে বলেন, সর্বনাশ! তুমি কে হে ? সে বলল, আমি গুপ্তচর। তোমরা গির্জার অমুক ব্যক্তির কাছে যাও, তিনি তোমাদের খবরাখবর জানার জন্য

পরিপূর্ণভাবে মুক্ত রেখেছেন সে এ কথায়ও ঈমান রাখে না আর উল্লেখিত নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রে তারা উভয়েই বিশেষভাবে বাছাইকৃত এবং

(চলমান টিকা)

উদগ্রীব। তিনি বললেন, যখন সে আমাদের সামনে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল আমরা কালক্ষেপণ না করে সরে পড়লাম কেননা আমাদের আশংকা হলো, সে আবার শয়তান নয় তো? তিনি বললেন, এরপর আমরা দ্রুত হেঁটে গির্জায় প্রবেশ করে সেখানে এক বিশালাকার ব্যক্তি দেখতে পেলাম। তেমন গঠন ও দৃঢ়তা সম্পন্ন মানুষ আমরা পূর্বে কখনও দেখিনি। তার হাত-পা ছিল লৌহ শিকল দিয়ে বাঁধা। আমরা তাকে দেখে বললাম, সর্বনাশ! তুমি আবার কে? সে বলল, তোমরা আমার খোঁজ-খবর নিতে ব্যস্ত হচ্ছো, কিন্তু বল-তোমরা কারা? তাঁরা বললেন,আমরা একটি সামুদ্রিক জাহাজে আরোহন করেছিলাম তারপর সমুদ্র আমাদের নিয়ে এক মাসব্যাপী উত্তাল ছিল। এরপর আমরা এই দ্বীপে প্রবেশ করলাম এবং আমাদের সাথে বহুকেশ বিশিষ্ট ভয়ংকর প্রাণীর দেখা হয়। সে আমাদের বললো, আমি গুপ্তচর। সে বললো, অমুক গির্জায় যাও, তাই আমরা তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসলাম। সে বললো, আমাকে বিসান অঞ্চলের খেজুর বাগান** সম্পর্কে বল? তাতে কি এখনও ফল ধরে?

*** পাদ টিকা ঃ*

অদৃশ্যের এই সংবাদটি সাক্ষ্য দেয়, এ হাদীসটি রসূলুল্লাহ্ (সা.)- হতে বর্ণিত নয়। কেননা, কুরআনও দ্ব্যর্থহীনভাবে এই শিক্ষার পরিপন্থী। নোংরা দাজ্জালের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সুস্পষ্ট গ্রন্থে বলেন-

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(সূরা জিন : ২৭-২৮) অতএব তিনি দাজ্জালকে কীভাবে অদৃশ্যের সুস্পষ্ট, সঠিক ও বাস্তব পরিস্থিতি মোতাবেক সংবাদ দিলেন? আর দাজ্জাল কীভাবে বলতে পারে, এই নিরক্ষর আরব নবীকে অনুসরণ করার মাঝেই মানুষের মঙ্গল নিহিত? কেননা তিনি সত্য; অথচ দাজ্জাল হলো কাফির; সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে না। তাই তিনি কীভাবে তাঁর নবী (সা.)-এর আনুগত্যের নির্দেশ তাকে দিতে পারেন? এছাড়া মানুষের বিশ্বাস অনুসারে সে নিজেকে ছাড়া অন্য কোন খোদায় বিশ্বাসী নয়। তাই প্রশ্ন হলো, একথা সে কীভাবে বলতে পারে, সত্ত্বর আমাকে আবির্ভূত হবার অনুমতি দেয়া হবে? বরং এ বক্তব্য সাব্যস্ত করছে সে গীর্জা হতে আবির্ভূত হবে না বরং আল্লাহ্র ইলহাম ও ওহীর ভিত্তিতে আবির্ভূত হবে। এমনটি হলে তার নবীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ তাঁরা তাকে সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। সুতরাং চিন্তা কর এবং উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

(লেখকের পক্ষ থেকে)

অনন্য অসাধারণ, নবী রসূলদের কেউই এ বিষয়ে তাদের শরীক নয়-সে একথাও স্বীকার করে না।

(চলমান টিকা)

আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে তা আর ফল দিবে না। সে বললো, আমাকে তবরিয়া উপসাগর সম্পর্কে বল। তাতে কি পানি আছে? আমরা বললাম, তাতে প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। সে বললো, এর পানি অচিরেই শুকিয়ে যাবে। সে বললো, আমাকে জগর ঝর্ণা সম্পর্কে বল। ঝর্ণায় কি কোন পানি আছে? স্থানীয় অধিবাসীরা কি এখনও ঝর্ণার পানি দ্বারা চাষাবাদ করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ- তাতে অনেক পানি আছে আর স্থানীয়রা চাষাবাদও করছে। সে বললো, আমাকে নিরক্ষরদের মাঝে প্রেরিত নবী সম্পর্কে বল, তাঁর কি খবর? আমরা বললাম, তিনি মক্কায় আত্ম প্রকাশ করেছেন আর বর্তমানে মদিনায় অবস্থান করছেন। সে বললো, আরবরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, তাদের কি অবস্থা? আমরা তাকে বললাম, তিনি আশেপাশের আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছেন আর তারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। সে বললো, তারা তাঁর আনুগত্য করলে ভালই হতো আর এখন আমি তোমাদেরকে আমার নিজের সম্পর্কে বলছি। আমি মসীহ্, আমাকে অচিরেই আবির্ভূত হবার নির্দেশ দেয়া হবে। আমি বের হবো, পৃথিবীতে ভ্রমন করবো আর মক্কা মদীনা ছাড়া সকল জনপদে চল্লিশ রাতে পৌঁছুবো। এ দুটো জনপদ আমার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। যখনই আমি এ দু'টোর কোনটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করবো তখন একজন ফিরিশ্তা উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে আমার মুখোমুখী হবে আর আমাকে বাঁধা দেবে। এর প্রতিটি দ্বারে একজন করে পাহারাদার ফিরিশ্তা নিযুক্ত থাকবে। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, শোন! সে সিরিয়া ও ইয়েমেনের সমুদ্র অর্থাৎ লোহিত সাগরের দিক হতে আসবে না বরং পূর্ব দিক থেকে সে অগ্রসর হবে আর মহানবী (সা.)-এর হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করেন। (মুসলিম)

আমি বলবো, হাদীসে এই যে স্ববিরোধ ও বৈপীরিত্য দেখা যায় এ সম্পর্কে কারো কারো ধারণা বরং অধিকাংশ মানুষ মনে করে, এ হাদীসগুলো আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হবে। সত্যিকার অর্থে এরা মস্তবড় ভুল করেছে। এটি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কারা ধৈর্যশীল মু'মিন এবং কারা ত্বরাপ্রবণ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী তা প্রকাশার্থে একটি পরীক্ষা মাত্র। আপনি অবগত আছেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজ নবীদের প্রতি রূপক ও উপমা সম্বলিত ভাষায় ওহী করে থাকেন। সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের ওহীতে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যার একটি হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্ন দেখে আমি অনুরূপভাবে এক রাতে দেখলাম, যেন আমরা উকবা বিন রাফে'র গৃহে অবস্থান করছি, সে আমাদের জন্য ইবনে তাবের বাগান থেকে কিছু টাটকা খেজুর নিয়ে আসলো। আমি এর যে তা'বীর করেছি তা হলো, এ পৃথিবীতে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে আর পরকালে আমাদের পরিণাম শুভ হবে

তারা বলে, এ ব্যক্তি ফিরিশ্‌তা ও তাঁদের আরোহণ ও অবতরণে বিশ্বাসী নয় আর মনে করে, সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্র ফিরিশ্‌তার দেহ। আর মুহাম্মদ (সা.) যে খাতামুল আম্বীয়া, রসূলদের শিরোমনি এবং তাঁর পরে যে কোন নবী নেই এবং

(চলমান টিকা)

এবং আমাদের ধর্মের পরিণতিও সন্তোষজনক হবে। আবু মূসার হাদীসেও এ ধরনের একটি বিষয় দেখা যায়। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি তরবারী ঘুরালাম আর এর ধারালো দিকটি ভেঙ্গে গেলো। এটি সেই বিপদের দিকে ইঙ্গিত করছে ওহুদের যুদ্ধের দিন মু'মিনগণ যার সম্মুখীন হয়েছে। এরপর আমি পুনরায় তরবারী চালালাম তখন সেটা তার পূর্বের অবস্থা থেকেও ভাল অবস্থা ফিরে পেল। খোদা যে বিজয় দান করেছেন এবং মু'মিনদের পুনরায় সমবেত করেছেন তার মাধ্যমে এটা পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব চিন্তা কর, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কীভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়কে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। নবীদের সত্যস্বপ্ন যে এক প্রকার ওহী এটা তোমার অজানা নয়। অতএব এখেকে প্রমাণিত হলো, নবীদের প্রতি ওহী কোন কোন সময় এক প্রকার রূপক বিষয় আর উপমা ব্যক্ত করার অর্থেও হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায় সময় এমন ওহীর ব্যাখ্যা বা তা'বীর করতেন। ওহীর তা'বীর বা অর্থ করার দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। যেমন, স্বর্ণের কঙ্কণ, জামা ও গাভী এবং অন্যান্য আরও অনেক স্বপ্ন রয়েছে যা মুসলমানদের মাঝে সুবিদিত। সেগুলো আর তোমার কাছে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আরও একটি স্বপ্নে দেখেছেন, মসীহুদ দাজ্জাল তার দু'হাত দু'ব্যক্তির কাঁধে রেখে কাবা শরীফের তওয়াফ করছে। এই ওহীকে যদি আমরা বাহ্যিক অর্থে নেই তাহলে দাজ্জালের মুসলমান মু'মিন হওয়া আবশ্যক হয়ে যায় কেননা তওয়াফ করা মুসলমানের চিহ্ন। অধিকন্তু এই সকল হাদীস এ বিষয়টিও প্রমাণ করে, দাজ্জাল মহানবী (সা.)-এর যুগেও ছিল আর তামীম দারী তাকে দেখেছেন। অথচ মুসলমানরা বিশ্বাস করে, সে শেষ যুগে আবির্ভূত হবে এবং সকল জনপদে প্রবেশ করবে। সে সব দেশের মালিক হবে, সকল দেশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করবে আর মক্কা-মদীনা ছাড়া তার যুগে এমন কোন দেশ নেই যা সে করতলগত করবে না। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এর সাথে বিরোধ রাখে আর এসব কাহিনীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। প্রথমতঃ তুমি চিন্তাশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুসলিম শরীফের সেই হাদীসটি প্রত্যক্ষ কর যা হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে মৃত্যুর একমাস পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর অথচ এর প্রকৃত জ্ঞান শুধু আল্লাহ্ই রাখেন। আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, পৃথিবীতে এখন যে-ই জীবিত আছে তার বয়স আরও একশ' বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেই সে মারা যাবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, ধরাপৃষ্ঠে এখন জীবন্ত কোন প্রাণী আর একশ' বছর পর জীবিত থাকবে না। মুসলিম শরীফ এই হাদীস বর্ণনা করেছে। সহীহ্ বুখারীও একই বিষয় উল্লেখ করেছে যার

তিনিই খাতামান নবীঈন সে এ কথাও-বিশ্বাস করে না। এ সবকিছু মিথ্যা ও সত্যের অপলাপ। আমার প্রভু পবিত্র, আমি এমন কোন কথা বলিনি, এটি ঢাহা মিথ্যা। আল্লাহ্ ভালোভাবেই জানেন, তারাই দাজ্জাল। আমার কথার অন্তর্নিহিত

(চলমান টিকা)

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এর ভিত্তিতে বুঝা যায়, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের একশ' বছর পর দাজ্জালের মৃত্যুতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহীর ভিত্তিতে কসম খেয়ে যা বলেছেন তার ব্যতিক্রম কীভাবে হতে পারে? এক্ষেত্রে এই কসমটি সাব্যস্ত করছে প্রদত্ত সংবাদটি বাহ্যিক অর্থে পুরো হবে এর রূপক অর্থ করা যাবে না আর কোন ব্যতিক্রমও হবে না। আর যদি তাই হয় তাহলে কসম খেয়ে কী লাভ? অতএব অনুসন্ধিৎসু ও গবেষকের ন্যায় চিন্তা করে দেখ। দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসের বিষয়বস্তুকে রূপক অর্থে গ্রহণ না করলে এই দুই হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া ভার। অতএব আমরা বলবো, দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসের অর্থ হলো, শেষযুগে খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে মিথ্যাবাদীদের একটি দলের প্রাদুর্ভাব হবে। হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, তারা তাদের ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা ও মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে নিজেদের পূর্বপুরুষের সাথে এমন সাদৃশ্য রাখবে যেন এরাই তারা। পার্থক্য হলো, তাদের পিতা-পিতামহ শিকল ও বেড়িতে আবদ্ধ ছিল কিন্তু এরা সেই কারারুদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হবে, আল্লাহ্ তাদের বেড়ি অপসারণ করবেন আর তারা উত্তর দক্ষিণে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। পৃথিবীবাসীদের জন্য তাদের প্রাদুর্ভাব অনেক বড় একটি বিপদ হবে। সুতরাং যেভাবে তামীম দারী দাজ্জালকে রসূল করীম (সা.)-এর যুগে সত্য দিব্যদর্শনে দেখেছেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গির্জার ভেতর লৌহ শিকলে সে আবদ্ধ ছিল, যা একটি রূপক জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাপার, সেভাবেই ইসলামের প্রাধান্যের যুগে খ্রিষ্টানরা কোপগ্রস্ত ও পরাজিত শক্তি হবে, যাদের হাত বাঁধা এবং তারা গির্জায় আবদ্ধ থাকবে। ১২শ' বছর পর তাদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে আর আল্লাহ্ তাদের বেড়ি ও শিকল খুলে দিয়েছেন। তিনি পরীক্ষাস্বরূপ নিজ সন্নিধান থেকে তাদেরকে জাগতিক জ্ঞানের পোষাক পরিয়েছেন আর তারা ইচ্ছামত পৃথিবীতে নৈরাজ্য বিস্তার করেছে। এটি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি অবধারিত বিষয় ছিল। নিদর্শনাবলী দু'শ বছর পর প্রকাশিত হবে সম্বলিত হাদীসে এদের প্রাদুর্ভাবের দিকে ইঙ্গিত ছিল। এই ঘটনাগুলো ১১শ' বছর পার হবার পর প্রকাশিত হবে। এতে আরও ইঙ্গিত ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতীর্ণ হবার প্রতি, যিনি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের নির্বাক করে দিবেন। এরপর আমরা যখন খোদার বাণীর দিকে লক্ষ্য করি তখন একে দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কিত হাদীসের আক্ষরিক অর্থের পরিপন্থী দেখতে পাই। আমরা এতে এ বিষয়ের ক্ষীণ কোন সম্ভাবনা বা এর

তাৎপর্য্য না বুঝে তারা আমার উপর আক্রমণ করেছে আর আমার কথার তত্ত্ব তারা অনুধাবন করতে পারেনি। আমাদের বক্তব্যের এক দশমাংশও তারা

(চলমান টিকা)

প্রতি কাল্পনিক কোন ইশারাও দেখি না। বরং তা এমন সব কল্পনা ও চিন্তার সম্পূর্ণভাবে মূলোৎপাটন করে। সত্যান্বেষীর জন্য আল্লাহ্‌র এ উক্তি-

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ *(সূরা আলে ইমরান : ৫৬)*

যথেষ্ট নয় কি? এই আয়াত এ কথার অকাট্য প্রমাণ বহন করে, মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর উত্তরাধীকারী হবে এবং এর অধিবাসীদের উপর আধিপত্য রাখবে। কেননা, মুসলমানগণ হযরত মসীহ্‌কে সত্যিকার অর্থে অনুসরণ করে আর খ্রিষ্টানরা নিছক দাবী হিসেবেই মান্য করে। চিন্তাশীলদের একথা অজানা নয়। আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন বাস্তবে তাই ঘটেছে। প্রথমবার ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে আর বর্তমান যুগে খ্রিষ্টানদের প্রাধান্য রয়েছে, যারা সকল উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে এসেছে। অতএব এই মহান আয়াতে সে সম্পর্কে যেভাবে সংবাদ দেয়া হয়েছে বাস্তবে সেভাবেই ঘটনা ঘটেছে। আয়াতের সিদ্ধান্ত হলো, কিয়ামত পর্যন্ত আধিপত্য ও বিজয় খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকবে। মুসলমানদের ধারণায় যে প্রতিশ্রুত ও কাল্পনিক দাজ্জাল রয়েছে, সে খ্রিষ্টানও হবে না আর মুসলমানও হবে না। বরং তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী সে খোদা হবার দাবী নিয়ে আবির্ভূত হবে আর বলবে- আমিই খোদা! মক্কা ও মদিনা ছাড়া সারা পৃথিবীতে তার জয়জয়কার হবে! আর এটি কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী যা আমি এখনই উল্লেখ করেছি। তিনি মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে একটি দৃঢ় ও স্থায়ী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ *(সূরা আলে ইমরান:৫৬)*

এ কথা সবারই জানা, আমাদের জাতি যে দাজ্জালের অপেক্ষা করছে এদের ধারণা অনুযায়ী সে ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে মসীহ্ ও তাঁর ইঞ্জীলে বিশ্বাস রাখে না। কোন মুসলমান আলেম একথা বলেননি, সে ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনবে। বরং তাদের বক্তব্য অনুসারে সে বলবে- আমিই আল্লাহ্। সে আল্লাহ্ বা কোন নবীর প্রতি ঈমান আনবে না। অথচ কুরআন এ ধরণের (কল্পিত) কোন দাজ্জালের আগমনের কথা সমর্থন করে না বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমান বা খ্রিষ্টানদের বিজয়ের সংবাদ বহন করে। অতএব কাল্পনিক দাজ্জালের অস্তিত্বকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে আর এসব কাল্পনিক কথাবার্তায় লিপ্তদের ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট আর কী প্রমাণ থাকতে পারে? তুমি ভালভাবেই জানো, কুরআন অকাট্য ও সুস্পষ্ট। এর অতুলনীয় নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আর সত্যের সমর্থন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোন হাদীস এর সমকক্ষ নয়। অতএব তুমি যদি সত্যান্বেষী হও তাহলে কথাটি বুঝার চেষ্টা কর।

বুঝেনি। তারা প্রতারণাবশত কথা পরিবর্তন করেছে এবং মনগড়া অপবাদ আরোপ করেছে। এরা নোংরা ধারণা পোষণ করে। অতএব এসব

(চলমান টিকা)

বাকী রইলো কিছু সংখ্যক আলেমদের বক্তব্য, যারা বলেন–দাজ্জাল ইহুদী জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। এদের কথাটি পূববর্তী দাবীর চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক। তারা وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ *(সূরা বাকারা : ৬২)* পড়ে না। অতএব যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সব ধরনের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় জর্জরিত করবেন আর যাদের সম্পর্কে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ ও স্থায়ী কিতাবে সংবাদ দিয়ে বলেছেন–ইহুদীরা সর্বদা কোন না কোন বাদশার অধীনে লাঞ্ছিত ও কোপগ্রস্ত জীবন যাপন করবে আর কখনও তাদের কোন রাজত্ব থাকবে না। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে কিভাবে সেই দাজ্জাল প্রকাশিত হতে পারে যে সমস্ত জগতকে করায়ত্ত করবে? মনে রেখ! খোদার বাণী সত্য ও এটি অপরিবর্তনীয়। বাস্তবতা হলো, এই জাতি (অর্থাৎ আলেম সমাজ) হাদীসের অর্থ শিখেনি আর প্রকৃত অর্থে তা বুঝেনি। আল্লাহ্ তাঁর দাসদের মাঝে যার প্রতি চান অনুগ্রহ করেন আর তাঁকে এমন ব্যুৎপত্তি দান করেন যা জগতের অন্য কাউকে দেন না।

আমি শুনেছি, মসীহ্র অবতরণ কাহিনীর প্রেক্ষাপটে কেউ কেউ 'নুযূল' (অবতরণ) শব্দ নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু তাদের বোধশক্তি এ সূক্ষ্ম রহস্য আয়ত্ত করতে অক্ষম। তাদের প্রকৃতি দুর্বল আর চিন্তাভাবনা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। তারা নিজ অমূলক ও অগভীর ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করে, ঈসা ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে অবতরণ করবেন; অথচ তারা লক্ষ্য করে দেখে না, কুরআন বেশ কয়েক স্থানে 'নুযূল' (অবরতণ) শব্দ ব্যবহার করেছে, যেমন– وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ (সূরা হাদীদ : ২৬) وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ (সূরা যুমার : ৭) قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا (সূরা আ'রাফ : ২৭) এটি জানা কথা, লোহা আকাশ থেকে অবতরণ করে না বরং খনির মধ্যে মিশ্রিত থাকে। একইভাবে গাধার পেট থেকে গাধা আর ঘোড়ার পেট থেকে ঘোড়ার জন্ম হয়। এ সব জীবজন্তুকে কেউ কখনও আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখেনি। একইভাবে পোষাক প্রস্তুত হয় তুলা, পশম, চামড়া ও রেশম থেকে। এসব বস্তুর সবকটিই আকাশসমূহের প্রভুর নির্দেশে ধরাপৃষ্ঠেই বিরাজমান। পৃথিবীর সকল মানুষ সমবেতভাবেও যদি এসব সৃষ্টির জন্য সকল শক্তি ও পরিকল্পনা নিয়োজিত করে তারপরও তারা তা সৃষ্টি করতে পারবে না। অতএব এর অর্থ হলো, এসব জিনিষ যেন ঊর্ধ্বলোক থেকে এসেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ *(সূরা আল হিজর : ২২)*

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি জিনিষ ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ হয় নির্দিষ্ট পরিমাপে, জাগতিক ও ঐশী উপকরণের মাধ্যমে, আল্লাহ্ তা'লার হিকমত ও প্রজ্ঞানুযায়ী।

কুধারণা পোষণকারীদের জন্য বড়ই পরিতাপ! আল্লাহ্ ভাল জানেন, আমি তাঁর কথার বাইরে যাইনি। তাঁর সাথে বিরোধ রাখে এমন কোন কথা আমি

(চলমান টিকা)

অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ই মহা কল্যাণের অধিকারী।

'নুযূল' শব্দের আরেকটি অর্থ হলো, এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে গমন। যেভাবে মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মসীহুদ দাজ্জাল ওহুদের পেছনে নাযিল হবে আর ঈসা (আ.) নাযিল হবেন দামেস্কের পূর্বে শুভ্র মিনারের পার্শ্বে। মানুষের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হতে হয়, তারা ঈসা (আ.)-এর অবতরণ বা 'নুযূল' বলতে তাঁর আকাশ থেকে আগমন হবে বলে মনে করে আর নিজেদের পক্ষ থেকে 'সামা'(আকাশ) শব্দটি বাড়তি যোগ করে, কিন্তু তুমি কোন হাদীসে এই শব্দের নামগন্ধও খুঁজে পাবে না। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক, ঈসা (আ.)-এর অবতরণের কাহিনীতে তাঁর দু'হাত দু'ফিরিশ্তার ডানায় রেখে নাযিল হবার যে উল্লেখ রয়েছে তা তাঁর আকাশ থেকে অবতরণের প্রমাণ নয়। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে যে বের হয় তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যও এধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং হাদীসে এমন দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। এই লেখার কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশংকা যদি না থাকতো আমি এর পুরোটাই উল্লেখ করতাম। প্রকৃত কথা হলো, খোদা আমার সামনে যে সত্য প্রকাশ করেছেন তা সত্যান্বেষী সকল মু'মিন গ্রহণ করবে। যে হেদায়াত প্রাপ্তদের পথ অবলম্বন করে না সে ব্যতীত আর কেউ একে অস্বীকার করবে না। সেই সত্য হলো, দু'হাত দু'ফিরিশ্তার ডানায় রেখে দামেস্কের পূর্বে শুভ্র মিনারের নিকট অবতরণ, স্বর্গীয় উপকরণের ভিত্তিতে তাঁর দাবী বিশেষভাবে সিরিয়ায় বিস্তার লাভের প্রতি ইঙ্গিত করে, যার নেপথ্যে জাগতিক কোন উপকরণ, কোন সরকার ও তার সম্পদ, সেনাবাহিনী ও পার্থিব পরিকল্পনার আদৌ কোন ভূমিকা থাকবে না। বরং খোদার সমর্থন ও তাঁর সৈন্যরাজির সাহায্যে তাঁর পরিকল্পনা জয়যুক্ত হবে যা ফিরিশ্তার কাঁধে (ডানায়) ভর দিয়ে নাযিল হবার নামান্তর। দাজ্জালের বিষয়টি হলো, সে প্রতিনিয়ত পার্থিব ছলচাতুরী ও কূটচালসহ নিত্য নতুন ফন্দি নিয়ে আবির্ভূত হবে।

আমি শুনেছি, এদেশের এক শ্রেণীর আলেমরা বলে, **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফ্ফিকা'** বাক্যাংশটি, ধারা বিন্যাসের দিক দিয়ে **'রাফিউকা ইলাইয়া'** বাক্যাংশের পরে বসবে আর তা **"মুতাহহিরুকা মিনাল্লাযিনা কাফারু"** ও **"ওয়া জায়িলুল্লাযিনাত্ তাবাউকা ফাউকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামা"** এই উভয় বাক্যাংশের পূর্বে বসবে। কিন্তু হে আমার ভাই! আপনি ভালভাবেই জানেন এটি স্পষ্টতই একটি ভ্রান্ত ও সম্পূর্ণভাবে গর্হিত অপব্যাখ্যা। সেক্ষেত্রে **রাফা'**র পর মসীহ্‌র মৃত্যুবরণ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় এবং সে সকল ঘটনার পূর্বে মৃত্যুবরণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় যা পবিত্র কুরআন **রাফা'** শব্দ উল্লেখের পর বিবৃত করেছে অর্থাৎ ইহুদীদের পক্ষ থেকে

কস্মিনকালেও বলিনি। জীবনেও আমার কলম এমন বিষয়ের অবতারণা করেনি। বাকি রইল তাদের এ দাবী, নিশ্চয় মসীহ্ (আ.) ছিলেন পাখির স্রষ্টা

(চলমান টিকা)

আরোপিত অপবাদ-সমূহ থেকে মুক্তি লাভের এবং অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের বিজয় লাভের পূর্বে। অথচ তারা বিশ্বাস করে, মসীহ্ আজ পর্যন্ত মারা যাননি কিন্তু এ সমস্ত প্রতিশ্রুতির সবই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে ঘটেছে। তাদের কান্ডজ্ঞান দেখে আশ্চর্য হতে হয়। তারা তাদের বিশ্বাস বিরোধী কথা কেন বলে? তারা এ বিষয়ে একমত মসীহ্ শুধু **রাফা'**র পর ইন্তেকাল করবেন না বরং **রাফা'** ও **'খাতামান নবীঈন'** (সা.)-এর আবিভার্বের মাধ্যমে ইহুদীদের অপবাদ থেকে পরিত্রাণ লাভ আর কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের জয়যুক্ত হওয়ার পর ইন্তেকাল করবেন। এ কারণে তাদের জন্য এ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক, **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফ্ফিকা',** বাক্যটি **'ওয়া জায়িলুল্লাযিনাত্ তাবাউকা ফাউকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাহ্'**-এর পরে বসবে। অতএব তাদের পক্ষে এ কথা বলা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, আয়াতের ধারাবিন্যাস ছিল মূলত এভাবে **'ইয়া ঈসা ইন্নী রাফিউকা ইলাইয়্যা ওয়া মুতাহ্হিরুকা মিনাল্লাযিনা কাফারু ওয়া জায়িলুল্লাযিনাত্ তাবাউকা ফাউকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতে, সুম্মা বা'দাল কিয়ামাতে মুনায্যিলুকা মিনাস্ সামায়ে সুম্মা মুতাওয়াফফিকা'** অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে প্রথমে আমার দিকে **রাফা'** করবো, কাফিরদের অপবাদ হতে তোমায় পবিত্র করবো, কাফিরদের বিরুদ্ধে তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখবো এবং কিয়ামতের পর তোমাকে আকাশ থেকে প্রেরণ করবো, তারপর তোমাকে মৃত্যু দেব। তাদের একথা বলা ছাড়া এ আয়াতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং শব্দের ধারাবিন্যাসে হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ নাই। মসীহ্ কিয়ামত দিবস পার না হওয়া পর্যন্ত অবতরণও করবেন না আর মৃত্যুবরণও করবেন না। কিন্তু এটি প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। তাদের জন্য পরিতাপ! কেন তারা খোদার বাণীকে নিজ জায়গা থেকে স্থানান্তরিত করতে চায়? অথচ তারা সে শব্দকে অন্যত্র বসাতেও অক্ষম। কুরআনের অনুপম নিদর্শন হলো, এতে যে পরিবর্তন করতে চায় সে এর সুদৃঢ়, সুবিন্যস্ত ও বাগ্মিতাপূর্ণ আয়াতের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন আনতে পারবে না। এমনটি করার চেষ্টা করলে বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ আলেম তো দূরের কথা মহিলা এবং শিশু-কিশোরদের সামনেও তার মিথ্যাচার সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। অতএব পবিত্র সেই অস্তিত্ব যিনি সুস্পষ্ট ও অলৌকিক নিদর্শনসহ কুরআন নাযেল করেছেন! আমাদের জাতির অবস্থা দেখে আশ্চর্য হতে হয়, তারা বুখারী ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে পড়ে, মসীহ্ মাওউদ এই উম্মত থেকে আসবেন এবং তাদের মধ্য থেকেই তাদের ইমাম হবেন। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর কোন নবী আসবেন না কেননা তিনি **খাতামান নবীঈন**। কুরআন সম্পূর্ণ হবার পর কেউ একে রহিত করতে পারবে না। কিন্তু তারা যা কিছু শিখেছে, চিনেছে ও

আর তাঁর সৃজন হুবহু আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত ছিল। তাঁর জীবন দান পদ্ধতি হুবহু কোন প্রভেদ ছাড়াই আল্লাহ্‌র জীবন দান পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। আর তিনি

(চলমান টিকা)

বিশ্বাস করেছে এর সবই ভুলে বসেছে। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেক অজ্ঞকে পথ ভ্রষ্ট করেছে।

বিভিন্ন হাদীসের মাঝে বিদ্যমান স্ববিরোধের বিষয়টি হাদীস-বিশেষজ্ঞের অজানা নয়। আমরা আমাদের পুস্তক **'ইযালায়ে আওহাম'**-এ এর একটা দিক উল্লেখ করেছি। সত্যন্বেষীর উচিত তা পড়ে দেখা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মসীহ্ ও মাহদী একই যুগে আসবেন। আর অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঈসা (আ.) ব্যতীত কোন মাহদী নেই। হাদীসে বলা আছে, মসীহ্ ও মাহদী পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করবেন আর মাহদী মসীহ্‌র সাথে খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করবেন এবং তাঁদের উভয়ের যুগ একই হবে। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মাহদী হিজরী বা ইসলামী শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আসবেন আর মসীহ্ শেষ প্রান্তে আসবেন। বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মসীহ্ **'হাকাম-আদাল'** (মিমাংসাকারী ও ন্যায় বিচারক) হিসেবে আসবেন আর ক্রুশ ভঙ্গ করবেন অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদে বিশ্বাসীদের প্রাধান্যের যুগে আসবেন, এর প্রতাপকে পদদলিত করবেন আর তিনি ক্রুশের প্রভাব ও প্রতাপকে ধ্বংস করবেন ও খ্রিষ্টানদের মাঝে শূকর স্বভাব বিশিষ্টদের বধ করবেন। অন্য এক হাদীস অনুসারে তিনি ধরাপৃষ্ঠে দাজ্জালের প্রাধান্যের যুগে আসবেন এবং নিজ অস্ত্রের সাহায্যে তাকে হত্যা করবেন। অতএব তোমার জানা উচিত, এটি এমন একটি আশ্চর্যজনক কথা যা আমাদের গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণকারীদের বিস্মিত করে। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, খ্রিষ্টানদের ক্রুশ ভঙ্গ এবং শূকর বধ করার জন্য মসীহ্‌র আগমনের লক্ষণটি বর্জ্রনিনাদে ঘোষণা করছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তখনই আসবেন যখন ধরাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের জয়জয়কার ও আধিপত্য হবে আর বিভিন্ন রাজত্ব ও দেশের মদদপুষ্ট হয়ে পুরো প্রতাপ ও সর্বশক্তি প্রয়োগে ক্রুশীয় মতবাদের সর্বত্র বিস্তার ঘটবে। পুনরায় দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদীসের প্রতি তাকালে আমরা দেখি, মসীহ্ ধরাপৃষ্ঠে দাজ্জালের প্রাধান্যের যুগেই আসবেন। আমরা যদি ধরাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের প্রাধান্যের সময় মসীহ্‌র আগমন সম্পর্কিত হাদীসের সত্যায়ন করি আর এই বিশ্বাস করি, তিনি খ্রিষ্টানদের ক্রুশভঙ্গ করার জন্য এবং তাদের ধর্মীয় দৌরাত্বের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে আসবেন, তাহলে অন্য হাদীস যাতে মসীহ্ মক্কা মদীনা ছাড়া সারা বিশ্বে দাজ্জালের প্রাধান্যের যুগে তাকে বধ করার জন্য আসবেন বলে উল্লেখ রয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা ধরাপৃষ্ঠে একই যুগে দাজ্জাল ও খ্রিষ্টধর্মের প্রাধান্য, দু'টো বিরোধী ও বিপরীত বিষয়। আর এটি জানা কথা, বিপরীত দু'টো বিষয় একই সময় একস্থানে সমবেত হতে পারে না আর একসাথে দূরও হয় না। তাই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো, এ দু'টো কথার একটি সত্য এবং

শয়তানের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন আর নিরাপদ ও সুরক্ষিত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের নবী (সা.)-ও নাকি তাঁর সমকক্ষ নন-আমার

(চলমান টিকা)

অপরটি মিথ্যা। এরপর বর্তমান ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, খ্রিষ্টান রাজত্ব সমগ্র বিশ্বকে বৃত্তের মত পরিবেষ্টিত করে ফেলেছে। আমরা দেখছি সব বাদশারা তাঁদের ভয়ে কম্পমান। তাদের হৃদয়ে ভয় ও দ্বিধাদ্বন্দ ছেয়ে গেছে আর তারা বিশ্বাস করে বসেছে, এরা তাদের তুলনায় প্রবল। কিন্তু মানুষের মাথায় যে কাল্পনিক দাজ্জাল রয়েছে তার কোন চিহ্ন বা লক্ষণ আমরা দেখতে পাই না। অপরদিকে আমরা দেখি, খ্রিষ্টানদের ফিতনা অনেক বেড়ে গেছে আর পৃথিবী তাদের ষড়যন্ত্রে ভরে গেছে। তাই বুঝা গেলো, খ্রিষ্টানদের প্রাধান্যের যুগে মসীহ্‌র অবতরণের অর্থ হলো, খ্রিষ্টান পাদ্রিরাই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল নতুবা এই স্ববিরোধী হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। এ জাতীয় হাদীসের যে অর্থ বাস্তবে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের পক্ষে সে অর্থই গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা আমরা এখন যে সকল হাদীসের কথা উল্লেখ করেছি এর মধ্যে কয়েকটি এ দিকে ইশারা করে, মসীহ্ আসবেন খ্রিষ্টান ও ক্রুশীয় মতবাদের দৌরাত্ব এবং ধরাপৃষ্ঠে তাদের আধিপত্যের যুগে। আর অপর কয়েকটি হাদীস এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে, তিনি দাজ্জালের আবির্ভাব এবং সমগ্র ধরাপৃষ্ঠে তার আধিপত্যের সময় আসবেন। অতএব আমরা প্রথম প্রকারের হাদীসের লক্ষণ আমাদের যুগে পূর্ণ হতে দেখেছি। আমরা জানি, ক্রুশীয় মতবাদের দৌরাত্ব সম্পর্কে যে সংবাদ রয়েছে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর সেভাবেই পূর্ণ হয়েছে যেভাবে আমাদের রসূল (সা.) বলেছেন, এমনকি আমরা স্বচক্ষেও তা দেখেছি। আর যা (অর্থাৎ যে হাদীস) এর পরিপন্থী অর্থাৎ দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদীস বিরোধী তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। সুতরাং যা উভয় অর্থে প্রকাশ পেয়েছে তাই সত্য আর যা পায়নি তা মিথ্যা। এটা অনুধাবন করতে চিন্তাশীলরা ভুল করেছে।

এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর মাঝে যে বড় বড় বিরোধ রয়েছে সেগুলো হলো, কয়েকটি হাদীস অনুসারে আগমনকারী মসীহ্ প্রতিশ্রুত মাহদীর অধীনস্থ ও অনুগত হয়ে আসবেন। কেননা ইমামরা কুরাইশ বংশোদ্ভুত হবেন কিন্তু মসীহ্ কুরাইশী নন তাই তাঁকে আল্লাহ্ এ উম্মতের জন্য খলীফা নিযুক্ত করতে পারেন না। আর অপর কয়েকটি হাদীস অনুসারে, মসীহ্ ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইমাম ও খলীফা হিসেবে আগমন করবেন যার হাতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ থাকবে। চল্লিশ বছর ধরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি যে ওহী হতে থাকবে সেটা ছাড়া তিনি অন্য কারো অনুসরণ করবেন না। তিনি তাঁর ওহীর ভিত্তিতে কুরআনের কোন কোন নির্দেশকে রহিত করবেন এবং কিছু কিছু সংযোজনও করবেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ নবুওয়ত ও ওহী সমাপ্ত করবেন এবং তিনি তাঁকে খাতামান নবীঈন নিযুক্ত করবেন। একই সাথে তারা একথাও বলে, তাঁর প্রতি কৃত ওহী কুরআনী ওহীর পরিপন্থী হবে না। অধিকন্তু

মতে, এমন কথা মহা অন্যায় ও মিথ্যা। তারা বড় জঘন্য কথা বলে আর একথা বলতে গিয়ে তারা মিথ্যার বেসাতী করেছে। আর আমার বিরুদ্ধে আরোপিত

(চলমান টিকা)

মসীহ্ সেভাবে নামায পড়বেন যেভাবে মুসলমানরা নামায পড়ে এবং তাঁদের মতই রোযা রাখবেন। কিন্তু এ কথা বলতে গিয়ে তারা নিজেদের প্রথম কথা ভুলে যায় যাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, মসীহ্ কুরআনের কয়েকটি নির্দেশকে রহিত বা মনসুখ করবেন আর যুদ্ধকর মওকুফ করবেন; অথচ কুরআন আদৌ এই কর মওকুফ করেনি আর এভাবেই কুরআন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ *(সূরা মায়েদা : ৪)* আয়াত নাযেল হয়েছে। একইভাবে, তারা বলে থাকে মসীহ্ শূকর বধ করবেন। অথচ কুরআনে আমরা পৃথিবীর লোকদের শূকর বধ করার কোন নির্দেশ দেখতে পাই না বরং তারা যদি নতি স্বীকার করে জিযিয়া বা যুদ্ধকর দিতে সম্মত হয় তাহলে কুরআন জিম্মিদের সম্পদ নষ্ট করতে ও কেড়ে নিতে বারণ করেছে।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসব আলেম বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ মসীহ্র প্রতি ৪০ বছর ধরে ওহী করবেন অথচ ইতঃপূর্বে নবুওয়তের ওহী বন্ধ হয়ে গেছে বলে তারা বিশ্বাস করতো। অতএব এদের জন্য পরিতাপ! এই বিশ্বাস এদের জন্য যে কি ক্ষতিকর তা জেনেও এরা তা পরিত্যাগ করে না। আমি তাদের নিদ্রাচ্ছন্নদের মত দেখতে পাচ্ছি। আমি আশ্চর্য হই তারা নিজ বিশ্বাসে কী অদ্ভুত স্ববিরোধী বিষয়াদির সমাবেশ ঘটিয়েছে কিন্তু তাদের কেউ এসব স্ববিরোধের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না! তারা একটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে আবার তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এমন একটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা প্রথমটির বিরোধী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, মসীহ্ ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী (হাকাম ও আদাল) হয়ে আসবেন। মানুষ তাদের ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর কাছে নিয়ে আসবে আর আল্লাহ্ তাঁকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন তা সত্ত্বেও তারা বলে, ঈসা (আ.) মাহদীর অধীনস্থ হবেন। তাদের মতে, হাকাম ও আদাল হবেন মাহদী, ঈসা (আ.) নন। কেননা তিনি কুরাইশী নন। তারা বলে, এ বিষয়টি সত্য যে ঈসা (আ.) ধরাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের বিজয়, আধিপত্য ও সকল শৃঙ্গ জয়ের যুগে অবতরণ করবেন। তিনি তাদের ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং শূকর বধ করবেন। তা সত্বেও এ কথা থেকে ফিরে গিয়ে আবার বলে, মসীহ্ দাজ্জালের আবির্ভাবের যুগ ছাড়া অন্য সময়ে আসবেন না। তারা আরো বলে, দাজ্জাল খ্রিষ্টানদের ইঞ্জিল, তাদের নবী, ঐশী গ্রন্থাবলী ও ধর্মের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না বরং সে এমন এক ব্যক্তি যে ঈসা (আ.) বা কোন নবীরই অনুসরণ করবে না, অধিকন্তু সে খোদা হবার দাবী নিয়ে আবির্ভূত হবে আর মক্কা ও মদীনা ছাড়া সারা ভূমন্ডলে আধিপত্য বিস্তার করবে আর বলবে, আমিই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্। দেখ! কীভাবে তারা নেশাগ্রস্থের মত কথা বলে। তারা এক কথার উপর স্থির থাকতে পারে না আর

তাদের অপবাদ ও নৈরাজ্যকর কুধারণা যার কোন ভিত্তির নামগন্ধ পর্যন্ত নেই- এসবের প্রত্যুত্তরে আমি কেবল পবিত্র আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি

(চলমান টিকা)

তাদের কোন একটি বিশ্বাসে আদৌ স্থিতি নেই। তারা বুদ্ধিমানদের ন্যায় চিন্তাভাবনাও করে না। আমি মনে করি, খোদা তা'লা তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি তুলে নিয়েছেন ও সঠিক চিন্তাশক্তি কেড়ে নিয়েছেন এবং তাদের ভ্রষ্টতার অন্ধকারে দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন। এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো, তিনি তাদের মাঝে ঐশী রহস্যাবলীর নিগুঢ়তত্ত্বের প্রতি কোন আগ্রহ দেখতে পাননি। তিনি তাদের উন্নত বোধ-বুদ্ধিশূন্য দেখেছেন, ফলে মানবতার পোষাক কেড়ে নিয়ে তাদেরকে পশু, হিংস্র জন্তু ও সাপের পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছেন এবং নিকৃষ্ট জীবের শ্রেণীভুক্ত করেছেন।

যাঁদেরকে তত্ত্বজ্ঞানের যথেষ্ট সুস্বাদু-টাটকা খাদ্যাহার পরিবেশন করা হয়েছে এবং সত্য জ্ঞান থেকে পর্যাপ্ত অংশ দেয়া হয়েছে তারা পথ ভুলেননি, আর পিপাসা-নিবারণের উৎসস্থল সম্বন্ধে বিস্মৃত হননি আর আল্লাহ্‌র আয়াত তাঁরা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন। তাঁদের হাতে কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান নষ্ট হয়নি। এটি খোদার একান্ত অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। তিনি যাকে চান পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন আর যাকে চান এমন সমুদ্রেও পথ দেখান যার কোন কূল-কিনারা নেই। কাকে নিজ অনুগ্রহে ভূষিত করতে হবে খোদা তা ভাল জানেন। মনের গঠন ও গড়ন তাঁর অজানা নয়। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাই তিনিই বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ জানেন।

এখন আমাদেরকে হাদীসের বিষয়ে ফিরে যেতে হবে। আমরা বলবো, নিশ্চয় যারা কুরআন বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হাদীসে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীকে বাহ্যিক বা আক্ষরিক অর্থে নিয়েছে, তারা মস্ত বড় ভুল করেছে। হাদীস নিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত থাকা এবং আল্লাহ্‌র বাণীকে ভুলে যাওয়াই এর অন্যতম কারণ। তাই হাদীস তাদের দৃষ্টি আবৃত করে রেখেছে। তাই আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনাতেই তাদের সকল চিন্তা-ভাবনা নিয়োজিত। সারাটা জীবন তারা এর পিছনেই ক্ষয় করেছে। নিজেদের জীবন তারা এই সংকীর্ণপথে বৃথা নষ্ট করেছে। তারা ঐশীগ্রন্থ এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়াদির ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দেয়নি, ফলে কুরআন তাদের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে। এর রহস্য ও সুপ্ত মনি-মুক্তা কবরস্থ ধন ভান্ডারের মতই থেকে গেল। তারা একে চিনেনি আর একে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। তারা অপরাপর কিতাবের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট যেন তাদের কুরআনের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তারা যদি কুরআনের প্রতি মনোযোগ দিত তাহলে আল্লাহ্ তাদের জন্য সকল সত্যের রহস্য উম্মোচন করতেন আর তাদেরকে সন্দেহের বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি দান করতেন। কিন্তু তারা আলোকিত হতে পারেনি বরং অন্ধত্বকে বরণ করেছে আর জ্যোতির্মন্ডিত জাতির বিরোধিতা করেছে। অতএব তাদের সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো, তারা সেই প্রতিশ্রুত

জানিয়ে দোয়াই করতে পারি–হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি এমন কথা বলে থাকলে তুমি আমার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ কর, অন্যথায় মিথ্যা রটনাকারীদের

(চলমান টিকা)

মসীহ্ মাওউদ এর স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেনি যার সংবাদ তাদের দেয়া হয়েছিল। তারা বলে, ঈসা ইবনে মরিয়ম আকাশ থেকে অবতরণ করবেন অথচ কুরআনে তারা পড়ে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর তাঁর সেসব ভাইয়ের সাথে মিলিত হয়েছেন যাঁরা তাঁর পূর্বে অতীত হয়েছেন। তারা যা জানতো তা ভুলে বসেছে আর যা দু'শ বছর পর বলা হয়েছে এর অনুসরণ করছে। তারা উদাসীনদের ন্যায় আল্লাহ্‌র আয়াতের প্রতি এমন অবজ্ঞাসূচক আচরণ করে, যেন কুরআনে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সংবাদের কোন চিহ্নই দেখেনি। প্রকৃতপক্ষে তারা উদাসীন। যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দ্ব্যর্থহীন আয়াতে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, আর তিনি বলেছেন, يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ (সূরা আলে ইমরান : ৫৬) আর তাঁর সম্পর্কে কটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ *(সূরা আল মায়েদা : ১১৮)* এবং এও বলেছেন, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ *(সূরা আলে ইমরান : ১৪৫)* তখন তারা বলে, আমরা কুরআনে বর্ণীত ঘটনায় বিশ্বাস ঠিকই করি কিন্তু হাদীস হচ্ছে এতে বর্ণিত বিবরণের জন্য বিচারক বা মানদন্ডস্বরূপ। দেখ! মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা কীভাবে কুরআনকে পরিত্যাগ করে!

তাদের কথায় আশ্চর্য হতে হয়! তারা মনে করে, হাদীস ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতরণের সাক্ষ্য দেয় অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা.) একাধিকবার তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ **'তিবরানী'** ও **'মুসতাদরেক'**-এ হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর অন্তিম শয্যায় হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বলেছেন, জিব্রাইল প্রত্যেক বছর আমার সামনে একবার কুরআন উপস্থাপন করতো কিন্তু এ বছর দু'বার উপস্থাপন করেছে আর আমাকে সংবাদ দিয়েছে, প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্বের নবীর অর্ধেক আয়ুষ্কাল অবশ্যই পেয়েছেন আর আমাকে এও জানিয়েছেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। আমি মনে করি আমি ৬০ বছরের কাছাকাছি সময়ে যাবো। হে আমার ভাইগণ! জেনে রেখো, এই হাদীসটি সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণ তা বর্ণনা করেছেন আর কয়েকভাবে তা বর্ণিত হয়েছে এবং তা সুস্পষ্টভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে। **রাফা'**র অর্থ মৃত্যু নয়। জড় দেহ হতে আত্মার বেরিয়ে যাওয়া হলো মৃত্যু। মসীহ্ যদি সশরীরে উত্থিত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত। যদি ধরে নেয়া হয়, এখন পর্যন্ত মসীহ্ জীবিত তাহলে আমাদের নবী (সা.)-এর এই সময়ের অর্ধেক কাল পর্যন্ত জীবিত থাকা আবশ্যক। তাই এই ধারণাটি মিথ্যা। অতএব গণনাকারীদের জিজ্ঞেস কর।

যারা আমার বিরুদ্ধে না জেনে অপবাদ আরোপ করছে আর যারা আমাকে অন্যায়ভাবে অস্বীকার করছে আর যারা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করছে না এবং তাঁকে ভয় করছে না তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ কর। প্রকৃতপক্ষে, আমি এমন কোন কথা বলিনি যা কার্যতঃ আহলে সুন্নতের বিশ্বাস পরিপন্থী। এমন মিথ্যা কথা আমার মুখ থেকেও বের হয়নি এবং এ ধরনের মনগড়া কল্প-কাহিনী

(চলমান টিকা)

একইভাবে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) অন্য এক হাদীসে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, যখন আমার প্রভু আমার উম্মতের নৈরাজ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন তখন যেভাবে নেক বান্দা অর্থাৎ ঈসা (আ.) আমার পূর্বে বলেছেন তদ্রূপ উত্তরে আমিও বলবো فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ *(সূরা মায়েদা : ১১৮)*। দেখ কত স্পষ্টভাবে নিজের জন্য **'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানি'** বাক্য ব্যবহার করে মসীহ্‌র মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করেছেন ঠিক যেভাবে হযরত মসীহ্ নিজের জন্য প্রয়োগ করেছেন। তুমি জানো, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন আর তিনি মদিনায় সমাহিত আছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিজের এবং মসীহ্‌র জন্য একই ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়েছে। স্পষ্ট হয়ে গেল, **'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানী'** আয়াতে **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দের অর্থ হলো মৃত্যু। এখন অন্য আর কোন এমন অর্থ করার অবকাশ নেই আরবী ভাষায় যার কোন ভিত্তি নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। যদি এর অর্থ সশরীরে জীবিত আকাশে উত্থান হতো যেভাবে লোকেরা দাবী করে, তাহলে আমাদের নবী (সা.) সশরীরে জীবিত আকাশে উত্থিত হতেন, কেননা বুখারী শরীফের হাদীস অনুসারে **'ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানী'** আয়াতে **'তাওয়াফফী'** শব্দে নিজেকে তিনি ঈসা (আ.)-এর সাথে অংশীদার আখ্যায়িত করেছেন। আমরা যদি নিজেদের পক্ষ হতে মসীহ্‌র ক্ষেত্রে এই আয়াতের মনগড়া বিশেষ কোন অর্থ করি তাহলে আমাদের বলতে হবে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য **'তাওয়াফফীর'** অর্থ মৃত্যু আর ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, জড় দেহসহ আকাশে গমন, আর এই অর্থের ক্ষেত্রে কেউ তাঁর অংশীদার নয়। অতএব এটি একটি অন্যায়, মিথ্যা ও জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা এবং অনর্থক একজনকে প্রাধান্য দেয়া, আমাদের মহানবী (সা.)-এর অবমাননা আর এটি এমন এক দাবী যার সমর্থনে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ, সমুজ্জ্বল যুক্তি এবং পরিষ্কার কোন দলিল নেই।

তারা বলে, ইয়া'জুজ মা'জুজ মসীহ্‌র যুগে আবির্ভূত হবে আর কুরআন অনুসারে তারা সকল উচুঁ স্থান থেকে ধেয়ে আসবে আর গোটা বিশ্বের হর্তাকর্তা সেজে বসবে। এটি সত্য বিষয় যা সম্পর্কে তাদের সাথে আমাদের কোন বিবাদ নেই। তারা বলে, মসীহ্ তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন না বরং তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করবেন। তাদের সকলে একটি কীটের কামড়ে মারা যাবে যা তাদের ঘাড়েই জন্ম নিবে। এটিও সত্য যা আমাদের মানতেই হবে।

আমার কল্পনার জগতেও স্থান পায়নি। চিন্তা শক্তির অভাব, কুধারণা ও রুগ্ন মনোবৃত্তির কারণে এরা আমার কথা বুঝেনি। কুফরি ফতোয়া প্রদানে তাদের সবাই অবিবেচকের মত তড়িঘড়ি করেছে। অতএব ঈর্ষাপরায়ণ জাতিকে কীভাবে আমি পথ দেখাবো? হ্যাঁ, আমি বলেছি আর এখনও বলছি, কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ

(চলমান টিকা)

কিন্তু ইয়া'জুজ ও মা'জুজ প্রত্যেকে ঈসা (আ.)-এর যুগে মারা যাবে এ বক্তব্যে তারা ভুল করেছে। কেননা ইয়া'জুজ মা'জুজ হলো রাশিয়া ও বৃটেনের খ্রিষ্টান জাতি**। অথচ আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দিয়ে রেখেছেন, খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে থাকবে। তিনি বলেন, فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

(সূরা মায়েদা : ১৫) অতএব কিয়ামতের পূর্বে তাদের সকলে কীভাবে মারা যেতে পারে? মৃত্যু বলতে যদি আমরা দৈহিক মৃত্যু নিয়ে থাকি তাহলে হাদীস কুরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ও এর পরিপন্থী হবে। কেননা কুরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে, তারা ও তাদের বংশ কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে বরং কুরআন এ দিকে ইশারা করেছে, আকাশ তাদের উপর ভেঙ্গে পড়বে এবং তাদের অবশিষ্ট দুস্কৃতিপরায়নদের উপর কিয়ামত নেমে আসবে। এটি থেকে বুঝা যায়, **'ইয়াযাউল জিযইয়াতা'** বাক্যটি সঠিক নয় যা বুখারীর কোন কোন সংস্করণে পাওয়া যায়। প্রকৃত বিষয় হলো, মসীহ্ যুদ্ধ রহিত করবেন। বুখারীর অন্যান্য সংস্করণে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তা সঠিক নয়। এটি যে সঠিক নয় তা স্পষ্ট, কেননা আমরা যদি ধরেও নেই যে ইসলাম গ্রহণ না করলে মসীহ্ খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, তিনি বাহ্যিক

*** পাদ টিকা*

এটি বলা হয় না, এই তফসীর ইজমা পরিপন্থী। মানুষ এ ব্যাপারে একমত, মানুষের সাথে সৃষ্টিগত দিক থেকে তাদের কোন সাদৃশ্য থাকবে না। তাদের কান দীর্ঘ হবে। তারা একমত, ইয়া'জুজ মা'জুজ সারা পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান থাকবে। তারা বংশবিস্তৃতি ও সংখ্যার দিক থেকে সকল জাতির তুলনায় অধিক হবে। তাই এটি স্পষ্টতঃই মিথ্যা। কেননা, আমরা চারটি মহাদেশে তাদের কোন লক্ষণ, কোন দেশ বা কোন শহর ও কোন সৈন্য দেখি না। অথচ পৃথিবীর জনবসতি সম্পর্কে এখন সবকিছুই মানুষের জানা। তাই এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলো সব মিথ্যা। অতএব এ ধরনের রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অন্যান্য রেওয়ায়েতকে যাচাই কর আর গবেষক সূলভ আচরণ কর।

(লেখকের পক্ষ থেকে)

করেছেন। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথায় আমরা কীভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারি আর এর উপর অন্য কথাকে কীভাবে প্রাধান্য দিতে পারি? আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের পর আমি কেমন করে এটাকে অবলম্বন না করে থাকতে পারি? আমার ও বিরোধীদের মাঝে বিচারক ও মিমাংসাকারী হচ্ছে কুরআন। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর আয়াতকে বাদ দিয়ে তারা কোন্ কথায়

(চলমান টিকা)

কোন যুদ্ধ কর গ্রহণ করবেন না বরং ইসলামের প্রতি আহবান করবেন! যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে ভালো, নতুবা তাদের হত্যা করবেন! এই অর্থ যদি সঠিক হয় তাহলে ইসলাম গ্রহণ করা বা মারা যাওয়ার কারণে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণভাবে খ্রিষ্টানদের নির্মূল হয়ে যাবার কথা মানতেই হবে অথচ এ অর্থ সম্পূর্ণভাবে কুরআন বিরোধী। কেননা কুরআন অনুসারে তাদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, বুখারীর কোন কোন সংস্করণে উল্লেখিত 'তিনি যুদ্ধ কর মওকুফ করবেন' এ বাক্যাংশটি সঠিক নয়, বিকৃতি ঘটেছে এবং লিপিকারদের লেখায় এতে পরিবর্তন ঘটেছে।

একই সাথে এই গবেষণামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সেসব হাদীসের মিথ্যাও প্রকাশিত হলো যাতে এ ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অভিযানের উল্লেখ দেখা যায়। কুরআন আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযতের সুবাদে সুরক্ষিত। তাই যে হাদীস, কুরআন বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রতি বিরোধ রাখবে, এমন হাদীস বুখারীর হোক বা অন্য কোন মুহাদ্দিসের বইয়ের হোক, তা সংখ্যায় সহস্র হলেও আদৌ গৃহীত হতে পারে না। ইয়া'জুজ মা'জুজ খ্রিষ্টান জাতির মধ্য থেকেই উদ্ভুত হবে, ভিন্ন কোন জাতি নয়। কুরআনের আয়াত থেকে আমাদের এই উক্তি প্রমাণিত। কেননা, কুরআন ধরাপৃষ্ঠে তাদের বিজয়ের কথা বলে, কুরআন বলে, مِّنۡ كُلِّ حَدَبٍ يَّنۡسِلُوۡنَ *(সূরা আম্বিয়া : ৯৭)* অর্থাৎ তারা ধরা পৃষ্ঠের সকল শৃঙ্গ জয় করবে আর এর সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে লাঞ্ছিত করবে। এরা প্রত্যেক সরকার, রাজ্য, দেশ ও রাষ্ট্রকে সেভাবে গ্রাস করবে যেভাবে বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে থাকে। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, তারা এমনই করে। মুসলমান রাজ্যগুলো দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের রাজত্ব, শক্তি, প্রতাপ সবকিছুতে দুর্বলতা প্রবেশ করেছে। তারা নিজেদের চতুর্পাশ্বে খ্রিষ্টান রাজত্বগুলোকে হিংস্র প্রাণীর মত মনে করে আর ভয়ে ভয়ে তাদের রাত কাটে। কুরআনের জোরালো, সুনিশ্চিত ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত থেকে প্রমাণিত, ধরাপৃষ্ঠে রাজত্ব ও বিজয় মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা পালাক্রমে লাভ করতে থাকবে, আর কিয়ামত পর্যন্ত কখনও তা এদের বাইরে যাবে না। যেমন খোদা তা'লা বলছেন, وَجَاعِلُ الَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡكَ فَوۡقَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى يَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ۚ (সূরা আলে ইমরান : ৫৬)। এটি জানা কথা, মুসলমানরাই মসীহ্‌র সত্যিকার অনুসারী এবং মৌখিকভাবে যারা তাঁর অনুসারী হবার দাবী করে তারা হচ্ছে খ্রিষ্টান। এই আয়াতটি শুধু অনুসরণের

ঈমান আনবে? বিশ্ব-জগতের প্রভু যা বলেছেন তা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়? কিন্তু কুরআনের সাক্ষ্যকে গ্রহণ না করে তারা এমন সব কথাবার্তায় ভরসা করে যেগুলোর মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। হায় পরিতাপ! এরা আমায় কোন্ দিকে ডাকছে? আমার দৃষ্টিশক্তি লাভের পর এরা কি আমায় অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব্যের দিকে আহবান জানাচ্ছে? খোদার কসম! আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে

(চলমান টিকা)

দিকে ইশারা করে তা সত্যিকার অনুসরণ হোক বা দাবী সর্বস্ব হোক। অনুসারী একজন ফিরিশ্‌তার মত মু'মিন-মুসলমান হলেও প্রকৃত অর্থে অনুসরণ একটি অতি কঠিন কাজ, কেননা নবীদের সত্যিকার ও পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ সহজ বিষয় নয়। রাজা-বাদশারা ঈসা (আ.)-কে নিছক দাবী সর্বস্ব অনুসরণ করে, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের দাবীতে কোন বস্তুনিষ্ঠতা নেই। অবশ্য ভালোবাসার সাথে অনুসরণের ক্ষেত্রে মুসলমানরা এগিয়ে রয়েছে। মসীহ্‌র শিক্ষা যেমন তারা তাঁকে সেভাবেই বুঝেছে। তাঁর মৃত্যুর পর তারা একত্ববাদের বিশ্বাসে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধীকারী। বাকী রইল খ্রিষ্টানদের বিষয়টি, তারা চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের হাতে নিছক দাবী বৈ আর কিছু নেই। তাদের ভ্রষ্টতা ও বিকৃতির কথা একটু চিন্তা করে দেখ। তারা বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ.) খাবার খেতেন, পানি পান করতেন, প্রায়শঃই অসুস্থও হতেন, ব্যথা বেদনাও লেগে থাকতো। সচরাচর দুঃখ, ভয়, ব্যাকুলতা বা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ক্ষুধা পিপাসাও লেগে থাকতো। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানও রাখতেন না। তিনি বলতেন, আমি এক দাস মাত্র। খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা ছাড়া আমার ভেতর নিজ গুণে কোন পুণ্য নেই। তাকে বন্ধী করা হয়েছিল, আর ক্রুশেও বিদ্ধ করা হয়েছিল, আর তিনি মারাও গিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাদের ধারণা অনুযায়ী তিনি একজন খোদা এবং খোদার পুত্র! খোদা এদের ধ্বংস করুন! তারা বিশ্বাস করে, তিনি একজন মানুষ ও নবী, যার ভেতর ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা এবং অজ্ঞতাও ছিল। মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করেছে। এরা তাঁকে দুর্বলতা, ভুলভ্রান্তি ও স্মৃতিলুপ্তির উর্ধ্বে মনে করে না, আবার এরাই বলে, তিনিই আল্লাহ্। অতএব কাফির জাতির জন্য বড়ই পরিতাপ। কিন্তু তারা একথা বলে না, ঈসা (আ.)-এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই আর আমরা তাঁর অনুসরণ করি না। বরং তারা তাঁর নবুওয়ত ও কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে আর তারা বনী ইস্রাঈলী নবী ও তাদের কিতাবে বিশ্বাস রাখে আর তারা ফিরিশ্‌তা, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস পোষণ করে। এ কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ভ্রষ্ট অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেভাবে মুসলমানদেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সারকথা হলো, وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ *(সূরা আলে ইমরান : ৫৬)* আয়াতটি এ কথার সুস্পষ্ট দলিল ও পরিষ্কার প্রমাণ বহন করে- ধরাপৃষ্ঠে শক্তিমত্তা, বিজয়, প্রতাপ ও পূর্ণ আধিপত্য এই দুই জাতি অর্থাৎ খ্রিষ্টান

অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার কাছে আমার প্রভুর, তাঁর কিতাবের, ইলহামের ও দিব্যদর্শনের নানাবিধ সাক্ষ্য রয়েছে। অতএব এমন কোন সত্যান্বেষী আছে কি যে আমার নিকট থেকে হেদায়াত গ্রহণ করবে আর কার্পণ্য ও হিংসার সকল পথ পরিহার করে সত্যান্বেষীদের আগ্রহ নিয়ে সত্যকে গ্রহণ করবে? কোন সৎকর্মশীল মুত্তাকী আলেম যে কুরআনের উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিতে পারে বা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে

(চলমান টীকা:)

ও মুসলমানদের আওতার বাইরে যাবে না। কিয়ামত পর্যন্ত রাজত্ব পালাক্রমে তাদের মাঝেই থাকবে। অন্যরা তা থেকে অংশ পাবে না বরং তাদের শত্রুদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাই দেখতে হবে। প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হয়ে তারা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। বিষয়টি যেখানে এমনই সেখানে রাজত্ব ও শক্তিমত্তা কিয়ামত পর্যন্ত এ দু'জাতির মাঝেই হাতবদল হওয়া আবশ্যক আর তাদের জন্যই এটি নির্ধারিত। এই ভিত্তিতে ইয়া'জুজ ও মা'জুজ মুসলমান বা খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকেই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তারা বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ও মিথ্যাবাদী জাতি। তাই মুসলমানদের মধ্য থেকে তারা কীভাবে হতে পারে? তাই নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হলো, তারা খ্রিষ্টান জাতি বা গোষ্ঠিভুক্ত হবে আর খৃষ্টীয় মতবাদের অনুসারী হবে। মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মসীহ্ ইয়া'জুজ মা'জুজের সাথে যুদ্ধ করবেন না আর বুখারী শরীফ অনুযায়ী, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না। তাই প্রমাণিত হলো, ইয়া'জুজ মা'জুজই খ্রিষ্টান জাতিভুক্ত। আর এও প্রমাণিত হলো, মসীহ্ মাওউদ তাদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না বরং কঠিন সময়ে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইবেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এথেকে আরও প্রমাণিত হলো, মসীহ্ মাওউদ ধরাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের আধিপত্যের যুগে আসবেন। তিনি নমনীয়তার দ্বারপথে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সেভাবে প্রবেশ করবেন যেভাবে তারা বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্যের জন্য প্রবেশ করেছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নেবেন না কেননা তারা ধর্মের কারণে তরবারী হাতে নেয়নি। তিনি তাদের সাথে প্রজ্ঞা ও উত্তম নসীহতের ভিত্তিতে তর্ক-যুদ্ধে লিপ্ত হবেন আর উদাসীন সীমালঙ্ঘনকারীদের বাহ্যিকভাবে হত্যা করবেন না। আর মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইয়া'জুজ মা'জুজের তীর এবং তাদের ধনুককে ইন্ধনের মত জ্বালানো হবে আর মুসলমানরাই এগুলোকে পোড়াবে। মুসলমানগণ! এটি হলো হাদীসের একটি অন্যায় প্রক্ষেপণের উদাহরণ। কেননা তীর ধনুকের যুগের এখন অবসান ঘটেছে, আর আগ্নেয়াস্ত্র এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। চাইলে মানতে পারো নতুবা অস্বীকারও করতে পারো।

(লেখকের পক্ষ থেকে)

কুরআনকে হাদীসের অধীনস্থ জ্ঞান করতে পারে বা কুরআনের সুস্পষ্ট শিক্ষামালাকে পরিত্যাগ করে নিছক এক সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসের অনুসরণ করতে পারে এবং নিশ্চিত বিষয়ের তুলনায় সন্দেহকে প্রাধান্য দিতে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর অজ্ঞতার অনুসরণ করতে পারে-এ কথা আমি ভাবতেও পারি না।

মুসলমানদের ও জ্ঞানে পরিপক্ক আলেমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যেন সুবিদিত সুস্পষ্ট শিক্ষার অনুসরণ করে আর সন্দেহকে এড়িয়ে চলে। তাঁরা জানতেন, সুস্পষ্ট শিক্ষাই অনুসৃত হওয়ার বেশী যোগ্য। **'বাইয়্যেনাত'** বলতে এমন অর্থকে বুঝায় যা প্রকাশিত ও সুস্থ বিবেকের কাছে সুবিদিত এবং যা মহান কুরআনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাব্যস্ত। এ ছাড়া যা সহজ-সরল চিন্তা-চেতনার কাছে গ্রহণযোগ্য আর স্ববিরোধের দায়মুক্ত আর যা খোদার আদি সুন্নত ও নিয়মের অন্তর্গত এবং নানাবিধ অর্থের মধ্যে যা সবচেয়ে সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। এ সত্ত্বেও, এই শ্রেণীটি কল্যাণময় এই জীবন বিধানকে এমনভাবে ভুলে বসেছে যেন তারা কিছুই জানে না বরং অজ্ঞ। আমার অভিজ্ঞতা হলো, কুরআন যে এক জীবন্ত বাণী, সত্যিকারের পথনির্দেশক ও ঐশী শিক্ষার তত্ত্বাবধায়ক আর সর্বোত্তম মানদন্ড-এরা তা বিশ্বাসই করে না।

বরং এরা এটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে আর হাদীসের তুলনায় গৌণ জ্ঞান করে। তারা হাদীস সম্পর্কে প্রকৃত অনুসন্ধানের পূর্বেই হাদীসকে কুরআনের উপর এমনভাবে বিচারক সাব্যস্ত করে যেন তারা নিশ্চিত বিষয়ের সাথে সুনিশ্চিত বিষয়ের তুলনা করে দেখিয়েছে। বাস্তবতা হলো, এরা হঠকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যায়ভাবে বলে হাদীস সন্দেহযুক্ত ও ধারণাপ্রসূত হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য ও কুরআনের জন্য বিচারকস্বরূপ। কিন্তু এটি মহা অন্যায় ও এক মিথ্যা ধারণা। আকাশ এতে বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। কুরআন বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে এ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত আর এমন মিথ্যা রটনার প্রতি কোন ইঙ্গিতও খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং সাহাবীরা কুরআনকে সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দিতেন আর কোন আহাদ★ হাদীসের জন্য একে পরিত্যাগ করতেন না। তুমি কি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-কে লক্ষ্য করনি, তিনি কীভাবে হাদীসের মানদন্ডে কুরআনের ব্যাখ্যা না করে

★ **নোট :**
এ প্রসঙ্গে হযরত মায়ায বর্ণিত হাদীস লক্ষণীয় যাতে মায়ায সম্পর্কে রসূল (সা.) এর ওসীয়্যত বিদ্যমান। *(লেখকের পক্ষ থেকে)*

[মুতাওয়াতের (প্রতিটি স্তরে অনেকগুলো সূত্রের বর্ণনা) ব্যতিত অবশিষ্ট সর্বপ্রকার হাদীসকে এক নামে খবরে আহাদ বলা হয়। (অনুবাদকের পক্ষ থেকে)]

কুরআনের অনুকূলে হাদীসের ব্যাখ্যা করতেন? যখন কোন হাদীস ও কুরআনের মাঝে বিরোধ দেখেছেন সে হাদীসের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করেননি। তিনি ছিলেন গভীর ব্যুৎপত্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী এবং সঠিক মতামত প্রদানে অনন্যা আর আমাদের নবী (সা.)-এর প্রিয়তমা। সকল সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে তাঁরা তাঁর কাছে আসতেন। তোমার যদি সন্দেহ থেকে থাকে তবে গভীর মনোযোগ দিয়ে বুখারী শরীফ পড়, তুমি অধিকাংশ স্থানে এমন ঘটনার বর্ণনা পাবে। এদের কী হয়েছে, এরা কেবল উদাসীনতার নিদ্রায় আচ্ছন্নদের ন্যায় কুরআন পাঠ করে! একে যেভাবে বুঝা উচিত সেভাবে বুঝে না এবং কুরআন তাদের গলার নীচেও নামে না। তারা এর অনুসরণও করে না আর এর আলোও সন্ধান করে না, বরং একে এক মরদেহের ন্যায় বহন করে। তারা উপকৃত হওয়ার কিংবা জ্ঞান ও মা'রেফত লাভের উদ্দেশ্যে এর প্রতি দৃষ্টি দেয় না। এমন মনে হয়, যেন তারা এক মহা সন্দেহে লিপ্ত। এর মাঝে নিহিত জীবন, প্রভূত কল্যাণ ও মানুষকে আলোকিত করার যে গুণ রয়েছে-এরা তা দেখে না। তারা একে সত্যিকার অর্থে মূল্যায়ন করে না। তারা এর মহিমা এবং অন্তর্নিহিত যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আর দুর্বল হাদীসকে, তা কুরআন-বিরোধী হলেও লুফে নেয় এবং এরা বিরত হবার নয়!

আল্লাহ্‌র কসম! আমি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণ, এবং তাঁর বাহ্যিকভাবে অবতরণ না করা বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমার আগমন-এসব বিষয়ে বারিধারার মত উপর্যুপরী ইলহাম লাভ করে, প্রভাতের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং ইলহামকে কুরআন ও নবী (সা.)-এর সঠিক হাদীসের মানদন্ডে পরিমাপ করার পর এস্তেখারা, বিশ্বপ্রতিপালকের কাছে কাতরচিত্তে দোয়া ও কাকুতি-মিনতি করার পরই আমি কথা বলেছি। এ বিষয়ে আমি তাড়াহুড়ো করিনি বরং দশ বছর এটিকে বিলম্বিত করেছি। আমি সুস্পষ্ট নির্দেশ ও পরিষ্কার কথার অপেক্ষায় দীর্ঘকাল প্রতীক্ষারত ছিলাম। সেই যুগে আমি এক গ্রন্থ রচনা করছিলাম যার নাম রেখেছি **'বারাহীন'**। এরপর দশ বছর অতীত হয়ে গেছে। এ কিতাব লেখার পূর্বে আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে যেসব ইলহাম প্রাপ্ত হয়েছি এর কিয়দাংশ এতে লিপিবদ্ধ করেছি। সে সকল ইলহামের একটি ছিল-

يٰعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ
اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এতে **'ঈসা'** নাম দিয়েছেন। এসব ইলহামগুলোর

আরেকটিতে আমার প্রভু আমাকে সম্বোধন করে বলেন, "আমি তোমাকে ঈসার বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করেছি। তুমি ও ঈসা একই নির্যাস থেকে সৃষ্ট এবং আমার দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন।" আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমদেরকে এসব ইলহামের মধ্যে তিনি **'ইহুদী ও নাসারা'** নাম রেখেছেন। অতঃপর দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত আমার প্রতি এ ধরনের কোন ইলহাম আর হয়নি। আর আমি জানতামও না, এই দীর্ঘকাল অবসানে আমি প্রত্যাদিষ্ট হব এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ নাম দেওয়া হবে। বরং সর্বসাধারণের বদ্ধমূল ধারণানুসারে আমিও মনে করতাম, মসীহ্ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ভাবতাম, খোদা কেন নিজ অব্যাহত ও ধারাবাহিক ওহীতে আমাকে **'ঈসা'** নাম দিলেন? আর কেন তিনি বললেন, তুমি ও সে একই পবিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আর কেনইবা বিরোধীদেরকে **'ইহুদী ও খ্রিষ্টান'** আখ্যায়িত করেছেন? শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের নিকট **'বারাহীনে আহমদীয়া'** প্রচার এবং মুসলমান ও মুশরিকদের একটি বিরাট শ্রেণীর মাঝে এসব ইলহাম পৌঁছানোর দশ বছর পর আমার কাছে এ সমস্ত ইলহাম ও ইঙ্গিতের অর্থ স্পষ্ট হলো।

অতএব যারা এটিকে এক মনগড়া মিথ্যা বলে মনে করে, তাদের জিজ্ঞেস কর– এসব কি মিথ্যাবাদীর লক্ষণ? ইতঃপূর্বে তারা আমার বই 'বারাহীন' পড়েছে। এতে তারা সংক্ষিপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে সেসব বিষয় দেখতে পাবে যা আজ আমি বিস্তারিতভাবে বলছি। উল্লেখিত গ্রন্থটি তাদের দৃষ্টিতে জনপ্রিয় ছিল আর এতে উল্লেখিত ইলহামগুলোর তারা সত্যায়ন করতো এবং অস্বীকারকারীদের ন্যায় তা প্রত্যাখ্যান করতো না। কিন্তু যখন আমার প্রভুর নির্ধারিত সময় এসে উপস্থিত হলো আর উল্লেখিত বইতে আমাকে যে নাম দেয়া হয়েছে তা ঘোষণা করার জন্য আমি প্রত্যাদিষ্ট হলাম, তখন তারা আমাকে কাফির আখ্যা দিয়ে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল, তারা যেন আশ্চর্যজনক কোন কথা শুনেছে বা তাদের কাছে নতুন এক শরিয়ত এসেছে। তাদের হাবভাবে মনে হয় আমি **'বারাহীনে'** যা লিখেছিলাম সে সম্পর্কে তারা জানতই না। তারা যদি বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যান্বেষী, আধ্যাত্মিক জ্ঞান সন্ধানী হতো তাহলে সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতো যা ইতঃপূর্বে লিখে সে যুগেই ছেপে প্রচার করা হয়েছে যখন এমন কোন দাবীর লক্ষণই ছিল না এবং তারা আমার জীবনচরিত নিয়েও চিন্তা করতো। ইতঃপূর্বে আমি তাদের মাঝে দীর্ঘ এক জীবন অতিবাহিত করেছি। তারা অবশ্যই শতাব্দীর শিরোভাগ আর খোদা ও তাঁর রসূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে অনুযায়ী মুজাদ্দিদের আবশ্যকতা সম্পর্কে ভাবতো। তারা যুগের বিশৃঙ্খলা, বিদা'ত এবং সকল দিক

থেকে খ্রিষ্টানদের আগ্রাসন সম্পর্কে চিন্তা করতো। হায়, তাদের জন্য পরিতাপ! এরা চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই কুধারণা পোষণ করেছে। একজন মু'মিন সম্পর্কে সুধারণা পোষণ না করে বাজে কথা বলা তাদের মোটেই সাজে না। আমার বিষয়ে তড়িঘড়ি করে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা তাদের জন্য মোটেও উচিত নয়। আর তাদের অস্বীকারের মূল কারণ হলো, তাদের ত্বরাপ্রবণতা, কুধারণা পোষণ, তাদের কার্পণ্য, তাদের শত্রুতা এবং তাদের গভীর মনোনিবেশের অভাব। অতএব ঈর্ষাপরায়ণ, শত্রুভাবাপন্ন, কুধারণা পোষণকারী ও কঠোর ভাষীদের জন্য বড়ই আক্ষেপ! হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা নিজের পক্ষ থেকে বলিনি বরং আল্লাহ্ যা বলেছেন আমি এর অনুসরণ করেছি এবং তিনি যা বলেছেন এর প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি বলেছেন– وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ (সূরা আলে ইমরান : ৫৬) লক্ষ্য করুন কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ সুস্পষ্ট গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সাক্ষ্য দিয়েছেন। জানা কথা, **রাফা'** এবং ইহুদীদের দোষারোপ ও অপবাদ থেকে মসীহ্‌র নিস্কৃতি, সত্যানুসারীদের বিজয়, ইহুদীদের লাঞ্ছনা, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের হাতে তাদের পরাজিত ও কোপগ্রস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে গেছে এবং সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি যেভাবে এবং যে ধারাবাহিকতায় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই ঘটেছে। এই ঘটনা ঘটা ও পূর্ণ হবার পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। অতএব উল্লেখিত আয়াতের ধারাবাহিকতায় **'তাওয়াফফি'** অর্থাৎ মৃত্যুর সংবাদ যা এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনায় দেয়া হয়েছে তা এখনও পূর্ণ হয়নি আর ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁর উম্মতের সৃষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত বিশৃংখলাপূর্ণ এ যুগ পর্যন্ত মারা যাননি, বরং অবতরণের পর এক অজানা সময়ে মারা যাবেন–এসব কথা কীভাবে মানা সম্ভব? আর এ ধারণার অসারতা চিন্তাশীলদের কাছে অজানা নয়।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকায় বিশ্বাসীরা যখন দেখলো, উল্লেখিত আয়াত সুস্পষ্টভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছে আর তা গোপন করার কোন উপায় নেই তখন তারা এর এক উদ্ভট ও দুর্বল অর্থ করা আরম্ভ করলো বলল, **'ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফফিকা'** আয়াতে **'তাওয়াফফী'** শব্দটি সত্যিকার অর্থে এ সকল ঘটনা উল্লেখের পরে বসবে অর্থাৎ ঈসার **রাফা'**, সত্যায়নকারী নবীর আগমনের মাধ্যমে অপবাদ হতে তাঁর পবিত্রতা প্রমাণ, ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ এবং ইহুদীদের নিকৃষ্ট প্রমাণ এসবের পরে বসবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দকে ভাষার সাবলিলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্য অপারগ মানুষের ন্যায় **'রাফেউকা'** ও **'মুতাহ্হিরুকা'** এবং অপরাপর কিছু উহ্য

বাক্যাংশের পূর্বে রেখেছেন! আর উল্লেখিত শব্দটি **'ইন্নী মুতাওয়াফফীকা'** আয়াতের শেষ শব্দগুলোর অন্তর্ভুক্ত! আল্লাহ্ তা'লা শব্দকে সুবিন্যস্ত করার মানসে বাধ্য হয়ে আয়াতের প্রারম্ভে রেখেছেন! পূর্বাপর বিন্যাসের ক্ষেত্রে খোদা নিরুপায় ছিলেন! এ সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি শব্দ অযথা স্থানে রেখেছেন আর এভাবে কুরআনকে খন্ড-বিখন্ড করেছেন! তাদের দাবী অনুসারে, আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে এরকম ছিল: **'ইয়া ঈসা ইন্নী রাফিউকা ইলাইয়া ওয়া মুতাহ্হিরুকা মিনাল্লাযিনা কাফারু ওয়া জায়েলুল্লাযিনাত্ তাবাউকা ফাওকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল কেয়ামা সুম্মা মুনায্যিলুকা মিনাস সামায়ে সুম্মা মুতাওয়াফফিকা!'** অর্থাৎ- হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করবো এবং কাফেরদের অপবাদ থেকে তোমাকে পবিত্র করবো এবং তোমার অনুসারীদেরকে তোমার বিরুদ্ধবাদীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দিব। এরপর তোমাকে আকাশ থেকে নাযিল করবো তারপর **'মুতাওয়াফফীকা'** অর্থাৎ তোমাকে মৃত্যু দিব। দেখ! তারা কীভাবে আল্লাহ্র কথাকে পরিবর্তন করে আর কথাকে এর নির্ধারিত স্থান থেকে স্থানচ্যুত করে। অথচ তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই! তারা নিছক নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। অথচ কুরআন সম্পর্কে মুখ খুলতে গিয়ে তাদের সাবধান থাকা উচিত ছিল। তুমি জানো, খোদা এ ধরনের অপারগতার ঊর্ধ্বে। তাঁর সকল কথা মুক্তার মালার মত সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত। তাঁর সম্পর্কে এভাবে কথা বলা অনেক বড় একটি অজ্ঞতা এবং ঘৃণ্য ধরনের বোকামী। এমন কুমন্ত্রনায় শুধু সেই পতিত হয় যে খোদার কুদরত, শক্তি ও সামর্থ্যকে ভুলে গেছে, তাঁকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেছে এবং তাঁকে সত্যিকার অর্থে মূল্যায়ন করেনি ও তাঁর বাণীর মহিমা বুঝেনি বরং ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং আল্লাহ্র বাণীকে কবিদের কাব্য মনে করেছে।

এমন কথা বলা আর নিজের ইচ্ছামত খোদার বাণীকে পরিবর্তন করা, আল্লাহ্ ও রসূলের কোন সনদ ছাড়া একে স্থানচ্যূত করা একজন মুসলমানের জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে? প্রক্ষেপণকারীদের প্রতি কি আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হবার নয়? তারা যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতো আর সত্যবাদী হতো তাহলে তারা কেন এ পরিবর্তনের পক্ষে কুরআন, হাদীস বা সাহাবীদের কথা বা কোন মুজতাহেদ ইমামের উক্তি থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করে না? যে প্রক্ষেপণের ব্যাপারে তাদের কাছে কুরআন ও সুন্নত থেকে কোন প্রমাণ নেই তা আমরা কীভাবে গ্রহণ করতে পারি? আমরা বরং তাকে শয়তানের ছত্রছায়ায় ইহুদীদের প্রক্ষেপণের অনুরূপ বলে মনে করি। আর অতীতের পুণ্যবান মনিষীরা এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু বলেননি বরং তারা কুরআনের বর্ণনা অনুসারে নীতিগতভাবে বিশ্বাস রাখতেন,

হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ধরাপৃষ্ঠে যখন খ্রিষ্টানদের প্রাধান্য হবে তখন এ উম্মতের মাঝে একজন মুজাদ্দিদ আগমন করবেন যার নাম হবে ঈসা ইবনে মরিয়ম। তাঁরা এ বিষয়ের খুঁটিনাটি খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঘটনা ঘটার পূর্বে এর খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। পুণ্যবানদের রীতি অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারেও এটিই তাঁদের পদ্ধতি ছিল। কিন্তু তাঁদের পর এমন একটি অযোগ্য প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে যারা তাঁদের রীতিনীতি জলাঞ্জলী দিয়ে, তাঁদের আদর্শ পরিহার করে আল্লাহ্ ও রসূলের বাণীর মনগড়া অর্থ করেছে। এ সম্পর্কে তারা হঠকারিতামূলক আচরণ করেছে যেন তারা ঐশী রহস্যাবলীর নিশ্চিত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে আর যেন তারা এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত। একথা কি তাদের জানা নেই, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন, খ্রিষ্টানরা কেবল ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পরেই শিরকে এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে যেভাবে فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (সূরা মায়েদা : ১১৮) আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়? আর যদি মসীহ্ বর্তমান যুগ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ না করে থাকেন সেক্ষেত্রে এটাও সাব্যস্ত হবে, খ্রিষ্টানরা আজ পর্যন্ত সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং তারা বিশ্বাসী মু'মিন এবং একত্ববাদী, একেশ্বরবাদী দল!

আক্ষেপ তাদের জন্য, তারা এ আয়াতগুলো নিয়ে কেন ভাবে না? তাদের মাঝে কি বিবেকবান, বুদ্ধিমান ও বিশ্বস্ত কোন মানুষ নেই? তুমি জানো, আয়াত **'ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানী'** সুস্পষ্ট ও সুবিদিত এবং দিবালোকের মত স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে খোলাশা করে বলছে, খ্রিষ্টানদের ভ্রষ্টতা ও এক বান্দাকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করা মূলতঃ হযরত ঈসার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত। যে কান্ডজ্ঞানহীনতার কারণে সত্যের প্রতি শত্রুতা রাখে আর অজ্ঞতা ও মূঢ়তাবশত অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে আর জেনেশুনে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ একথা অস্বীকার করতে পারে না। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ্ নিজ কিতাবে স্পষ্টভাবে হযরত ঈসার মৃত্যু এবং তাঁর জীবদ্দশায় নয় বরং তাঁর মৃত্যুর পর খ্রিষ্টানদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে যা বলেছেন- এর প্রতি ঈমান আনো, তারা বলে, আমরা কি এমন অর্থের প্রতি ঈমান আনবো যা হাদীস বিরোধী? অথচ ইতঃপূর্বে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি বিরোধের কারণে **'খবরে ওয়াহেদ'** হাদীস পরিত্যাজ্য বলে তারা মানুষকে শেখাতো! কিন্তু মানুষকে তারা যা স্মরণ করিয়েছে স্বয়ং নিজেরা তা ভুলে বসেছে, জ্ঞান অর্জনের পর তারা আবার অজ্ঞতায় ফিরে গেছে। আমরা কোন হাদীসে মসীহ্‌র সশরীরে জীবিত উত্তোলনের উল্লেখ দেখতে পাই না। বরং

বুখারী, তিবরানী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ দেখতে পাই। অতএব যার সন্দেহ হয় তার এ সকল বই ঘেঁটে দেখা উচিত।

বাকী রইলো, ঈসা ইবনে মরিয়মের বিষয়ে 'নুযূল' শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গ। অতএব এ বিষয়ে কোন মু'মিনের উল্লেখিত শব্দটিকে তার আক্ষরিক অর্থে নেয়া উচিত নয়। কেননা তা খোদার বাণী, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (সূরা আহযাব : ৪১)-এর পরিপন্থী। তুমি কি জানো না, আমাদের দয়ালু ও কৃপালু প্রভু আমাদের মহানবী (সা.)-কে বিনা ব্যতিক্রমে **'খাতামান নবীঈন'** আখ্যা দিয়েছেন? তুমি কি জানো না, আমাদের নবী (সা.) সত্যান্বেষীদের জন্য নিজ উক্তি **'লা নাবীয়া বা'দী'**-তে সুস্পষ্টভাবে এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন? আমাদের নবী (সা.)-এর পর আমরা যদি কোন নবীর আগমনকে বৈধ আখ্যা দেই তাহলে আমাদেরকে নবুওয়তের ওহী বন্ধ হওয়ার পর এটিকে অব্যাহত রাখার বৈধতা খুঁজতে হবে। মুসলমানদের অজানা নয়, এটি সত্য পরিত্যাগের নামান্তর মাত্র। আমাদের রসূল (সা.)-এর পর কীভাবে কোন নবী আসতে পারে? তাঁর মৃত্যুর পর ওহী বন্ধ হয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে নবীদের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। আমরা কি একথায় বিশ্বাস করবো, আমাদের রসূল নন বরং ঈসা, যাঁর প্রতি ইঞ্জিল নাযিল হয়েছে তিনিই 'খাতামান নবীঈন'? আমরা কি বিশ্বাস করবো, ইবনে মরিয়ম আসবেন এবং কুরআনের কতক শিক্ষাকে রহিত করবেন আর কিছু সংযোজন করবেন, আর তিনি যুদ্ধকর গ্রহণ করবেন না আর যুদ্ধও রহিত করবেন না? অথচ আল্লাহ্ তা'লা তা নেয়ার আদেশ দিয়েছেন আর যুদ্ধকর গ্রহণের পর যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন? يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (সূরা তওবা : ২৯) হযরত মসীহ্ কুরআনের এই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতকে কীভাবে রহিত করতে পারেন? পরিপূর্ণতার পর তিনি কীভাবে সম্মানিত কিতাবের কতক আয়াতে হস্তক্ষেপ এবং অপর কতক নির্দেশকে বিকৃত করতে পারেন? আমি আশ্চর্য হই, তারা মসীহ্‌কে কুরআনের কতক আয়াত রহিতকারী সাব্যস্ত করতে চায় আর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (সূরা মায়েদা : ৪) আয়াতের দিকে লক্ষ্য করে না। আর তারা এটিও ভেবে দেখে না, ইসলামের পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে যদি সহস্র সহস্র বছর পর প্রকাশিতব্য কোন অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে ধর্মের পরিপূর্ণতার কথা এবং খোদার উক্তি **'আলইয়াউমা আকমালতু লাকুম'** এক প্রকারের মিথ্যা ও অবাস্তব বিষয় বলে গণ্য হবে। বরং এমন পরিস্থিতিতে খোদা তা'লার বলা উচিত ছিল আমি মুহাম্মদের প্রতি এ কুরআন পুরোটা নাযিল করিনি, এর কিছু আয়াত শেষ যুগে ঈসার প্রতি নাযিল করবো আর সেদিন কুরআন পরিপূর্ণতা

লাভ করবে, আজ অবধি তা সম্পূর্ণ হয়নি। তুমি জানো! একথাটি স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। সবচেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী ছাড়া অন্য কেউ এমন কথা ভাবতেও পারে না। অবশ্য কোন কোন হাদীসে ঈসা ইবনে মরিয়ম নাযিল হবে বলে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোন হাদীসে তাঁর আকাশ থেকে অবতরণের কথা তুমি দেখতে পাবে না বরং কুরআনে তাঁর মৃত্যুর কথা আছে। আর এ **'তাওয়াফ্ফী'** নুযূলের পর সংঘটিত হওয়া কোনভাবে বৈধ নয়, কেননা আয়াত **'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী'**তে যে নৈরাজ্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা রুদ্ররোষে ধরাপৃষ্ঠে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান আর তোমার প্রভু যেমনটি বলেছেন তেমনই ঘটেছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো, খ্রিষ্টানরা নিজেদের জন্য এক উপাস্য এবং এক উপাস্যের পুত্র বানিয়ে রেখেছে। এরপর **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফিকা'** আয়াত এটা সাব্যস্ত করছে, নিশ্চয়ই ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন আর আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক স্বরূপ। সুতরাং মৃত্যুর পর তাঁর আগমন কীভাবে সম্ভব? কেননা আল্লাহ্ বলেন, فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ (সূরা আয যুমার: ৪৩) এবং বলেন, وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (সূরা আম্বিয়া : ৯৬)। কোন হাদীসে এমন কথা দেখা যায় না, ঈসা তাঁর মৃত্যুর পর আবার আসবেন এবং তাঁর মরদেহ কবর হতে বের করা হবে। আর যে দেহ কবরে দাফন করা হয়েছে তা আকাশ থেকে কীভাবে অবতরণ করতে পারে? এইসব লক্ষণ এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে, **'নুযূল'** শব্দের ভিন্ন অর্থ রয়েছে। যদি তা না হয়, তাহলে একদিকে আল্লাহ্ প্রথমে ঈসার মৃত্যুর সংবাদ দেন এবং বলেন, তিনি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফা আর তিনি তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যাবলীকে পরিপূর্ণতা দেবেন অধিকন্তু স্বীয় সম্মানিত রসূল (সা.) এবং মুহাদ্দাস ও ইলহামপ্রাপ্ত বান্দাদের প্রেরণের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদেরকে প্রাধান্য দান করে রাখবেন যারা হযরত মসীহ্‌র সত্যায়ন করেছেন। এরপর তিনি আবার ফিরে যাবেন এবং নিজের প্রথম কথার প্রতি বিরোধ প্রদর্শন করতঃ বলবেন, তিনি (অর্থাৎ ঈসা) মারা যাননি বরং আকাশ থেকে নাযিল হবেন! তিনি যেন পূর্বে প্রদত্ত তাঁর নিজের বক্তব্য এবং নিজের নাযিলকৃত আয়াত ভুলে গেছেন! কিন্তু তুমি তাঁর কথায় কোন স্ববিরোধ দেখতে পাবে না। সুতরাং তাঁর প্রতি এমন কোন কথা আরোপ করো না যা চরম স্ববিরোধ ও সংঘাতপূর্ণ। তাই আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, এমন কথাকে বাহ্যিক অর্থে না নেয়া। কথার কথা, যদি হাদীসে থেকেও থাকে তাহলেও আমরা এর এমন অর্থ করবো যা কুরআন সম্মত। দেখ! কীভাবে

আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কিতাবে ঈসার মৃত্যুর কথা বলেছেন। এরপর কোন্ সে বিবৃতি বা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ বা বিস্তারিত বিবরণ যা এর চেয়ে বড় হতে পারে! তুমি আবার লক্ষ্য করে দেখ, সম্মানিত খোদা 'রাফিউকা ইলাস সামা' অর্থাৎ আমি তোমাকে আকাশে তুলবো- একথা বলেননি, বরং বলেছেন 'রাফেউকা ইলাইয়া' অর্থাৎ তোমাকে আমি আমার নিজের দিকে তুলে নিব। তাঁর কথা **'রাফিউকা ইলাইয়া'** এবং তাঁর উক্তি ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (সূরা ফজর : ২৯)- এর অনুরূপ, আর মৃত্যু ছাড়া এর অন্য কোন অর্থ হতে পারে না। অতএব নিদ্রা পরিত্যাগ করে চিন্তাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হও।

হে প্রিয়! আমরা এমন বিশ্বাস কীভাবে গ্রহণ করতে পারি যা কুরআনের আয়াত এবং এতে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিষয়ের সাথে বিরোধ রাখে আর যার অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই এবং যা কোনভাবেই সঠিক হতে পারে না! এরা এর পক্ষে কোন যুক্তি ও কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করে না। আমার বিশ্বাস, আপনি সুবিচার ও গভীর চিন্তাভাবনা করলে বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। আমি সবকিছু আমার কিতাবে প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করেছি। আমি আমার এই প্রবন্ধে বিষয়টিকে খুব দীর্ঘ করা পছন্দ করবো না। কেননা, এটি বিরক্তিকর। তাই যা লেখার সংক্ষেপে লিখেছি। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র কিতাব পড়বে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে এ বিষয়ে বিশ্বাসের সুউচ্চ অবস্থানে পৌঁছুবে এবং সে আমার সাথে একমত হবে। আমি যা বলেছি এর সবই তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব একটু চিন্তা কর! আল্লাহ্ তোমার বিবেক-বুদ্ধি প্রখর করুন এবং তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন আর তুমি এর যোগ্য। খোদা তোমার প্রতি করুণা করুন যাতে তুমি কুরআনকে প্রাধান্য দিতে পারো আর এর আয়াতকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে শেখো, কেননা আল-কুরআন অকাট্য। এর প্রতিটি আয়াত হলো সুনিশ্চিত ও নিরবচ্ছিন্ন, মানুষের হাত এটিকে স্পর্শ করতে পারেনি আর এর সাথে আদম সন্তানের কোন কথার মিশ্রণ ঘটেনি। এটি (অর্থাৎ কুরআন) ঐশীবাণী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এটি ঐশী নিদর্শনে ভরপুর এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। রইলো হাদীস প্রসঙ্গ, এক্ষেত্রে আপনি ভাল জানেন ব্যতিক্রমধর্মী কিছু সংখ্যক হাদীস ছাড়া এর বেশির ভাগই **'আহাদ'** পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ সম্পর্কে পবিত্র মনমানসিকতা, শুভ সংকল্প ও সুস্থ হৃদয় নিয়ে ভাবো। আমি দোয়া করি, খোদা যেন স্বীয় ইলহাম দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেন, তোমাকে স্নেহধন্য করেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি দান করেন, তোমার সাথী হোন এবং তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ফিরিশ্‌তা ও অন্যান্য বিশ্বাসের বিষয়ে আমাদের এবং উলামাদের যে বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা তাদের সাথে বিতন্ডায় লিপ্ত হই না এবং তাদের পদাঙ্কও অনুসরণ করি না। এ সকল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পন্থা হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীর কাছে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ। হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতরণের বিষয়টি নিয়েই আমাদের বিতর্ক। কিতাব ও সুন্নত থেকে এটি প্রমাণিত হয় বলে আমরা মানি না। একথা যদি প্রমাণিত হতো তাহলে আমরা বা অন্য কারো তা অস্বীকার করার বা তা গ্রহণ করার বিষয়ে চোখ বন্ধ করে রাখার কোন সাধ্য নেই। কেননা সত্য গ্রহণ করা থেকে কেবল এমন অনাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী জালেমই পলায়ন করে যে সত্যকে ভালোবাসে না বা অজ্ঞ-ভ্রষ্ট এবং যে এর মূল্য বুঝে না। আর যদি বিষয়টি প্রমাণিত না হয় তাহলে কোন পুণ্যবান ব্যক্তির তা মানা উচিত নয়। অতএব অনাচারীর পক্ষে সোজা পথে চলমান ব্যক্তিকে নিজের দিকে ডাকা কীভাবে সম্ভব? আর কীভাবেই বা সে তাকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করতে পারে? ধর্মের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহা তাৎপর্যবহ একটি বিষয়। কোন ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে তড়িঘড়ি করা সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের উচিত নিজের কার্পণ্যকে পরিত্যাগ করা আর খোদার কাছে বিগলিত চিত্তে কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করা এবং তাঁর সন্নিধান থেকে হেদায়ত যাচনা করা। খোদা তা'লা ছাড়া আর কে হেদায়েত দিতে পারে! তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াতদাতা। যে কুরআন শরীফের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে এবং ফুরকান নিয়ে গভীর দৃষ্টি ও মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা ভাবনা করে তার কাছে আলেম-উলামাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যা সুন্দর করে দেখিয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। নিশ্চয়ই তারা চরমভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে আর মিথ্যা ও অসত্য প্রচার করেছে। আর সত্য সদাসর্বদা বিজয়ী, এরা একে মাটির নিচে যতই চাপা দিক না কেন!

আমরা এখন এদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় আমাদের দাবীর বিবরণ দেই যেন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এই দাবী কি তাদের গ্রহণ করা উচিত না কি বর্জন করা উচিত, অতএব আমরা বলবো, আমাদের এই ধর্ম যার নাম ইসলাম, খোদা তা'লা একে নিস্ফল ও ব্যর্থ অবস্থায় পরিত্যাগ করতে চাননি। তিনি একে পন্ড করতে বা শত্রুদের হাতে ধ্বংস করাতে চাননি বরং সবচেয়ে বড় সত্যবাদী আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (সূরা নূর : ৫৬)

এবং তিনি অন্যত্র বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ (সূরা হিজর : ১০) তিনি আরও বলেছেন, وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (সূরা জুমুআ : ৪) অধিকন্তু তিনি বলেছেন, ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ (সূরা ওয়াকেয়া : ৪০-৪১) বিশৃঙ্খলা, পাপ ও অবাধ্যতার প্রাবল্যের যুগে ইসলামের সমর্থনে এসব হলো সত্য প্রতিশ্রুতি। ধরাপৃষ্ঠে যেসব নৈরাজ্য আজ পর্যন্ত ছড়িয়েছে এর ভেতর কোন্ বিশৃঙ্খলাটি এর চেয়ে বড়? খ্রিষ্টানগণ বড় সূক্ষ্মভাবে মানব জীবনে হস্তক্ষেপ করেছে। তারা মানুষের চোখ, হৃদয় ও কানের উপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমন যাদু করেছে যা বড়ই সূক্ষ্ম ধাঁচের। তারা বিশাল এক জনগোষ্ঠিকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং প্রকাশ্য যাদু ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এছাড়া হাদীস অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র লক্ষণ হলো তিনটি।

প্রথমত: তিনি আসবেন খ্রিষ্টানদের আধিপত্য ও তাদের ষড়যন্ত্রের বিস্তার এবং খ্রিষ্টধর্ম প্রসারের জন্য তাদের প্রচেষ্টার যুগে। তিনি আসবেন, তাদের মাঝে অবতরণ করবেন আর তাদের ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং শূকর বধ করবেন। তিনি বাহ্যিকভাবে কোন অভিযানও রচনা করবেন না এবং যুদ্ধেও লিপ্ত হবেন না। বরং তিনি এসব কাজই সম্পাদন করবেন অলৌকিক শক্তি, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং ঐশী অস্ত্র বলে এবং তিনি সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন। তিনি নিরুপায়, নিরীহ এক ব্যক্তির ন্যায় আত্ম প্রকাশ করবেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি বিয়ে করবেন। এটি একটি নিদর্শনের প্রতি ঈঙ্গিত যা খোদার শক্তি ও ইচ্ছায় তাঁর বিয়ের ফলশ্রুতিতে প্রকাশ পাবে। আমরা আমাদের বই 'তবলীগ' ও 'তোহফা গোলড়বিয়ায়' এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছি। আর আমরা এই দু'টো বইতে প্রমাণ করেছি, এ নিদর্শন আমাদের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যদি এটি বিশেষ ধরনের নিদর্শন না হতো তাহলে এ লক্ষণটি উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা বিয়ে কোন বিরল বা কঠিন কাজ নয় যা সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত সত্য মসীহ্ ছাড়া কোন মিথ্যাবাদী এ কাজের শক্তি রাখে না। বরং বিয়ে একটি সাধারণ বিষয় যা কাফির ও অবাধ্যসহ সকল ধনবান ও সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য করা সম্ভব, শুধু নবী ও ওলীর মাঝে বিষয়টি সীমিত নয়। তাই প্রমাণিত হলো, এটি একটি মহান নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করছে যা তাঁর বিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দানকারীদের জন্য আমরা তা আমাদের পুস্তকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

তৃতীয়ত: 'তার সন্তান হবে' উক্তিটিও 'তিনি বিয়ে করবেন'- উক্তির ন্যায় একটি প্রতীকি শব্দ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাঁর এমন এক পুণ্যবান সন্তান হবে যাঁর

গুণাবলীর সাথে তাঁর উৎকর্ষ গুণাবলীর সাদৃশ্য থাকবে, তা না হলে শুধু সন্তান হবার মাঝে কি বিশেষত্ব থাকতে পারে? মসীহ্ ব্যতীত অন্যদের সন্তান হওয়া কি অসম্ভব? মোটেই না! বরং সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী নির্বিশেষে সবার ঘরেই সন্তান হয়ে থাকে। অতএব এগুলো হলো সত্য মসীহ্‌র লক্ষণ যা সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদদাতা (সা.) বলে গেছেন আর এর সবক'টি আমার সত্তায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এগুলো হলো সে সব লক্ষণ যার মাধ্যমে আমার সত্যতা অনুধাবন করা যায়। অন্যান্য লক্ষণাবলীর মাঝে এমন কতক নিদর্শন রয়েছে যা খোদা তা'লা আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আমাকে অনেক ঘটনা ঘটার আগেই সেসব বিষয়ে তিনি সংবাদ দান করেছেন। এবং আমাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। আমার বয়স যখন চল্লিশে উপনীত হয় তখন আমার জন্য তাঁর ইলহামের দ্বারসমূহ অবারিত করে দেয়া হয়। তিনি আমাকে কখনও পরিত্যাগ করেননি, প্রত্যাখ্যান করেননি আর আমাকে ধ্বংসও করেননি। বরং তিনি বাক্যালাপ ও কথোপকথনের জন্য আমাকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন। তিনি আমাকে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বাত্মক যুক্তি উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আমার জাতির ধারণা অনুসারে ঈসা যদি সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে জীবিত থাকতেন তাহলে বর্তমান যুগে তাঁর আগমন ঘটা আবশ্যক, কেননা অনেক জাতি খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের বিষক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং নৈরাজ্য চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। পৃথিবীবাসীর ভ্রষ্টতা এবং তাঁর উম্মতের ভেতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর আকাশে বসে থাকাটা সত্যিই একটি দুর্বোধ্য বিষয়। আমরা জানি না, তাঁর এভাবে বসে বসে জীবন নষ্ট করার মাঝে কী স্বার্থকতা থাকতে পারে! আল্লাহ্ আকাশের কোন স্থানে তাঁকে বসিয়ে রেখে তাঁর জীবন নষ্ট হতে দিতে পারেন না অথচ তিনি দেখছেন, তাঁর উম্মত ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত আর ইতঃপূর্বে দাজ্জালরা যেমন নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল তাঁর উম্মত এর চেয়ে বেশি অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তারা যে মিথ্যা ও শির্‌ক ছড়িয়েছে আদম থেকে আজ পর্যন্ত এর নজীর খুঁজে পাওয়া ভার। তুমি কি দেখনি, যখন মূসা (আ.) তুর পর্বতে খোদার সাথে বাক্যালাপ করেছেন আর তাঁর উম্মত তাঁর অবর্তমানে এক দেহসর্বস্ব গো বৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে যার ভেতর থেকে অর্থহীন ধ্বনি নির্গত হতো? খোদা তা'লা এই পুরো ঘটনা অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে মূসাকে অবহিত করেন আর বলেন, তুমি সত্বর তোমার জাতির কাছে ফিরে যাও, কেননা বাছুরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন মূসা (আ.) ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় ফিরে যান আর নিজ ভাইয়ের শ্মশ্রু

ধরে টান দেন। এক কথায়, সে ঘটনা ঘটে যা তুমি কুরআনে পড়ে থাকো। বাছুর সৃষ্ট বিশৃংখলা কোন মতেই খ্রিষ্টানদের সৃষ্ট নৈরাজ্যের চেয়ে গুরুতর নয়।

আপনি জানেন, খ্রিষ্টানদের নৈরাজ্য নিজ ভয়াবহতা, মারাত্মক ভ্রষ্টতা আর পুরো ধরাপৃষ্ঠে এর প্রাধান্যের দিক থেকে হযরত ঈসার মৃত্যুর পর দীর্ঘ দু'হাজার বছর ধরে অব্যাহত আছে। কিন্তু ঈসা (আ.) এখন পর্যন্ত অবতরণ করেননি, যার সম্পর্কে দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞ সকলে বলে গেছেন আর আমরা তাঁর আসার কোন লক্ষণও দেখছি না। এগুলো এমন বিষয়, আমরা এসব আলেমের কাছে যার কোন উত্তর পাই না। আমার পক্ষ থেকে অনেক নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও তারা এর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে বললো এগুলো ধোঁকা এবং প্রতারণা। তারা এতটাই আশ্চর্য হয়েছে যাতে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। তারা অন্যায় ও বিদ্রোহ বশত: একে অস্বীকার করেছে অথচ তাদের অন্তরে এ বিষয়টি অনেক গুরুত্বহ ছিল এবং তাদের দৃষ্টিতে এর একটি বিশেষ মূল্যও ছিল। কিন্তু হৃদয়ে লালিত বিদ্বেষের কারণে তারা একে অস্বীকার করে বসেছে। অতএব আমরা হিংসুকদের হিংসা থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তারা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত সত্যকে পরিত্যাগ করে দুর্বল কথাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। এরা কি চিন্তা করে দেখে না? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায়, মসীহ্ নাযিল হওয়ার ঘটনা অসাধারণ ও বিস্ময়কর হওয়া সত্ত্বেও কেন এর উল্লেখ করলেন না? তা যদি সত্য হয় কেন তিনি তা ছেড়ে দিলেন? তিনি ইউসুফ এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ (সূরা ইউসুফ : ৪)। তিনি আসহাবে কাহাফের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন, كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا (সূরা কাহাফ : ১০) কিন্তু ঈসার মৃত্যু ছাড়া আকাশ থেকে নাযিল হবার কথা কিছুই বলেননি। যদি 'নুযূল' বা বাহ্যিক অবতরণ বাস্তবিক সত্য বিষয় হতো সেক্ষেত্রে কুরআন এ কাহিনী উল্লেখ না করে কখনও থাকতে পারতো না। বরং তা একটি দীর্ঘ সূরায় উল্লেখ করতো এবং একে সবচেয়ে উত্তম কাহিনী রূপে বর্ণনা করতো। কেননা এর অনন্যতা এরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য কাহিনীতে এর কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। তাই সেক্ষেত্রে এটাকে শেষ যুগের উম্মতের নিদর্শন হিসেবে বর্ণনা করতো। এ শব্দগুলো যে আক্ষরিক অর্থে নয় এটিই তার স্পষ্ট প্রমাণ। হাদীসে যে এর উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ হলো, মসীহ্‌র পদাঙ্ক অনুসরণে একজন মহান মুজাদ্দিদ আসবেন তিনি তাঁর মত হবেন এবং তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখবেন। স্বপ্নে যেভাবে কতককে অপর কতকের নাম দেয়া হয়ে থাকে সেভাবে তাঁকে মসীহ্‌র নাম দেয়া হয়েছে। ওহী ও রুইয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রচলিত রীতি। তুমি

হাদীস ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বলিত বই-পত্রে এর অগণিত দৃষ্টান্ত দেখবে। এর অর্থ হলো, এমন একজন সদৃশ ব্যক্তি আসবেন যিনি মসীহ্‌র অনুরূপ হবেন। পরম সাদৃশ্যের কারণে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং খ্রিষ্টানদের প্রাধান্যের যুগে আসবেন। তাঁর হাতে খোদার হুজ্জত (দলিল-প্রমাণ) পরিপূর্ণতা লাভ করবে এবং তিনি ইসলামের নামকে সমুন্নত রাখবেন আর যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মমতের বিপক্ষে জয়যুক্ত করবেন। একই সাথে আমরা পবিত্র কুরআনে দেখতে পাই, শেষ যুগে খ্রিষ্টানরা ধরাপৃষ্ঠে প্রাধান্য বিস্তার করবে আর তারা সকল উচুঁ স্থান থেকে ধেয়ে আসবে এবং বিশৃঙ্খলা ছড়াবে। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্র বলে বলিয়ান হয়ে ইসলামের উপর আক্রমণ করবে এবং নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইসলামের জ্যোতিকে নির্বাপিত করার অপচেষ্টায় তারা কোন ক্রুটি করবে না। এমতাবস্থায় দয়ালু প্রতিপালক-প্রভু এই অপারগ, দুর্বল, শক্তি ও সামর্থ্যহীন উম্মতের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি দান করবেন এবং সিঙ্গায় ফুৎকার করবেন আর তাদেরই একজনকে নিজ সন্নিধান থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধির ভিত্তিতে শিক্ষা প্রদান করবেন। তাঁকে তিনি অনেক নিদর্শন দান করবেন আর তাঁকে ঈসা ইবনে মরিয়মের স্থলে প্রেরণ করবেন। আর তিনি এসে সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখাবেন আর বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করবেন। তাঁকে ঈসার স্থানে দাঁড় করানো এবং তাঁর নাম দেয়ার পেছনে দু'টো কারণ আছে: **প্রথমত:** যে জাতির কাছে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর যাবতীয় যুক্তি প্রমাণ পূর্ণ করতে চান তাদের অবস্থানুসারেই মুজাদ্দিদ এসে থাকেন। শত্রু যেহেতু খ্রিষ্টান তাই ঐশী প্রজ্ঞা সেই মুজাদ্দিদকে মসীহ্ নাম দেয়া যুক্তিযুক্ত বলে ধার্য করেছে। **দ্বিতীয়ত:** মুজাদ্দিদ সব সময়ই একজন নবীর পদাঙ্ক অনুসরণে এসে থাকেন আর মুজাদ্দিদের যুগ সেই নবীর যুগের সাথে সামঞ্জস্য রাখে আর আমাদের যুগ মসীহ্‌র যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঈসা (আ.) এমন একটি সময়ে এসেছিলেন যখন ইহুদীদের কাছে কোন রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিল না, রোমান সাম্রাজ্য তাদের উপর রাজত্ব করছিল। এছাড়া তিনি এমন এক সময়ে এসে ছিলেন যখন ইহুদী আলেমদের হৃদয় ও চিন্তাধারা বক্র হয়ে গিয়েছিল, তাদের ভেতর ষড়যন্ত্র, অনাচার, কদাচার, জগৎ-প্রেম, হীনতা, নির্বুদ্ধিতা, কপটতা, বিবাদ-বিসম্বাদ এবং সকল প্রকার নীচ স্বভাব অনুপ্রবেশ করেছিল। এ যুগে আমাদের জাতির অবস্থাও এমনই। তাই বিপক্ষ ও স্বপক্ষ উভয়ের অবস্থার নিরিখে ঐশী প্রজ্ঞা এই মুজাদ্দিদের নাম ঈসা রাখা পছন্দ করেছে।

আর এরা বলে, মসীহ্ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, দাজ্জালকে বধ করবেন এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। এ সব মতামত তাদের ভুল ধারণা ও

খাতামান নবীঈন (সা.)-এর কথা সম্পর্কে সঠিক চিন্তাভাবনার অভাবজনিত কারণে উদ্ভুত। আর বাকী রইলো, আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবার বিষয়টি। এ বিষয়ে নিশ্চয় তুমি এর তত্ত্ব বুঝতে পেরেছো। আমি তোমাকে বলেছি, আকাশ থেকে অবতরণের বিষয়টি কুরআন ও নবী (সা.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা বিশ্বাস করে, কুরআনে আল্লাহ্ এমন আয়াত নাযিল করেছেন যাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর উল্লেখ আছে, তা সত্ত্বেও তাদের ধারণা হলো, তিনি জীবিত অবস্থায় দ্বিতীয় আকাশে তাঁর আপন খালাতো ভাই শহীদ নবী ইয়াহিয়ার সাথে বসে আছেন। আমাদের নবী (সা.) এবং তাঁদের সবার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তারা চিন্তা করে না আর দেখেও না, হযরত ইয়াহিয়া নিহত হয়েছেন আর মৃতদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে জীবিতকে মৃতের সাথে একীভূত করলেন? মৃতদের সাথে জীবিতদের কিসের সম্পর্ক? আশ্চর্য! এরা নিজ বিশ্বাসে বহু স্ববিরোধের সমাহার ঘটিয়েছে। তারা এ সম্পর্কে সাবধান হয় না আর নিম্নমানের পরস্পর বিরোধী কথা বর্জন করে না বরং নেশাগ্রস্ত বা উন্মাদের ন্যায় কথাবার্তা বলে।

মুফাস্‌সেরগণ যে ঈসার জীবিত থাকার বিষয়ে একমত ছিলেন তাও আমরা তাদের কথায় খুঁজে পাই না। বরং এ বিষয়ে তাদের ভেতর অনেক মতভেদ রয়েছে। তাদের একাংশ মনে করেন, তিনি মৃত্যু লাভের পর পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন কিন্তু এটি তাদের কথার কথা মাত্র। তারা কুরআন বা হাদীস থেকে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। তাদের অনেকেই বলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বে সশরীরে আকাশে আরোহণ করেছেন। এমন ব্যক্তি কোন যুক্তি, প্রমাণ, দলীল ও প্রকাশ্য ভিত্তি ছাড়াই কুরআনের কথার সাথে বিরোধ সাব্যস্ত করেছে। সারকথা হলো, তারা অনিশ্চয়তার দোলায় দোদুল্যমান ব্যক্তির ন্যায় তাঁর সম্পর্কে ধারণার বশবর্তী হয়ে কথা বলছে। তারা তাঁর আরোহণ সম্পর্কে কোন প্রকার মতৈক্যে পৌঁছেনি। তারা তাঁর সশরীরে আকাশে আরোহণ সম্পর্কে কোন আয়াত, হাদীস বা কোন সাহাবীর উক্তি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়টি প্রমাণ না করেই তারা নুযূলের দিকে ছুটে যায়। তারা বুঝে না যে, অবতরণ করা আরোহণেরই সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয় এবং এটির সাব্যস্ত হওয়া মূল বিষয়াদি সাব্যস্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি আরোহণ প্রমাণিত হয় তবে তা অবতরণের প্রমাণ বৈ-কি। অতএব যে মুহূর্তে প্রমাণিত হয় কুরআন ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশে যাওয়াকে সত্যায়ন করে না বরং এর বিরোধিতা করে বরং তাঁর মৃত্যুর কথা অনেক

আয়াতে উল্লেখ করে। কখনও সে ঘোষণা দিয়ে বলে يٰعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ (সূরা আলে ইমরান : ৫৬) আবার কখনও তাঁর মৃত্যুর দিকে এই বলে ইঙ্গিত করে, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (সূরা মায়েদা : ১১৮) আবার কখনও বলে, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (সূরা আলে ইমরান : ১৪৫) অর্থাৎ রসূলদের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষোক্ত আয়াতের এ অর্থ না করলে আয়াতে উপস্থাপিত মূল যুক্তিটিই বাতিল সাব্যস্ত হবে। অতএব আমরা সেই কুরআন ও এর সাক্ষ্যকে কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারি যে সম্মানিত কিতাবের সম্মুখ বা পশ্চাত কোন দিক থেকেই মিথ্যা অনুপ্রবেশ করতে পারে না? এই সাক্ষ্যের চেয়ে অন্য কোন সাক্ষ্য বড় হতে পারে? খোদা তোমার মঙ্গল করুন; তুমি কি এর তুলনায় আরো কোন স্পষ্ট প্রমাণ চাও? রসূলুল্লাহ্‌র কোন হাদীস, কোন ওলীর দিব্যদর্শন বা কোন কুতুবের ইলহামও যদি থাকে তাহলেও কুরআন ছাড়া যা-ই আছে সবকিছুকে কুরআনের মানদন্ডে যাচাই করাই যুক্তিযুক্ত। কেননা কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার সুরক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং খোদা তা'লা করেছেন। এবং তিনি বলেছেন, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (সূরা আল হিজর : ১০)। কালের পরিবর্তন এবং বহু শতাব্দী অতিবাহিত হলেও এর কোন অক্ষর বিয়োজিত হবে না বা একটি বিন্দুও এতে সংযোজিত হতে পারে না। কোন সৃষ্ট জীব এতে প্রক্ষেপণ করতে পারবে না আর মানুষের কথা এর সাথে মিশ্রিত হতে পারে না।

একইসাথে এতেও কোন সন্দেহ নেই, কুরআন হলো **'ওহী মতলু'** তথা জাজ্বল্যমান ওহী। প্রতিটি বিন্দু ও অক্ষরসহ কুরআনের আয়াতগুলো হলো নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিশ্চিত। আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্‌তার পাহারায় নিশ্ছিদ্র ও নিখুঁত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিনে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। সম্পূর্ণ কুরআন সংকলিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি আয়াত যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি সেভাবে নিজের তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করান এবং এর ধারাবিন্যাস ও সংকলনের কাজ স্বয়ং নিজে তত্ত্বাবধান করেন। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে নিজ সুমহান প্রভুর সাথে মিলিত না হয়েছেন ততক্ষণ নামায ও অন্যান্য সময়ে সদা কুরআন পাঠ করেছেন।

এরপর তাঁর খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর নিকট থেকে যেভাবে শুনেছেন সেভাবে সূরাগুলোর বিন্যাসের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর পর তৃতীয় খলীফাকে আল্লাহ্ তা'লা সুযোগ

দেন। তিনি কুরাইশের ভাষানুসারে এক অভিন্ন কেরাতের (পঠন) ধারা প্রবর্তন করেন এবং সমগ্র অঞ্চলে তা ছড়িয়ে দেন। এছাড়া সাহাবীদের প্রত্যেকে কুরআন মুখস্তকারী হাফিযদের ন্যায় তেলাওয়াত করতেন। এ ছাড়া কুরআনের এক বিরাট অংশ মু'মিনরা বক্ষে ধারণ করেছিলেন। তাঁরা নামায ও নামাযের বাইরে এর তেলাওয়াত করতেন বরং তাঁদের একাংশ পুরো কুরআন মুখস্ত করে রেখেছিলেন। তাঁরা দিবারাত্র বিভিন্ন প্রহরে এর তেলাওয়াত করতেন, তাঁদের তেলাওয়াত করার স্থায়ী অভ্যাস ছিল।

হে পুণ্যবান বান্দা! ভেবে দেখুন। হাদীসের পক্ষে এ মহান ও সমুজ্জ্বল পদমর্যাদা কস্মিনকালেও কি লাভ করা সম্ভব? হাদীসের গোটা সংকলনটাই বলতে গেলে আহাদ*। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং সাহাবীরা এর সংকলন এবং লিপিবদ্ধ করার প্রতি দৃষ্টি দেননি। খোদা তা'লা এর দেখাশুনা করেননি, জামানত দেননি আর এর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার সেভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করেননি যেভাবে কুরআন সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। অপর দিকে হাদীস লেখা হয়েছে দীর্ঘ যুগাবসানে অর্থাৎ আমাদের নবী (সা.)-এর তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পর। একইসাথে এর কোন কোনটিতে অধিক স্ববিরোধিতা দেখা যায় এবং এমন পরস্পর বিরোধী বক্তব্যও পাওয়া যায় যার রহস্য ভেদ করা কঠিন। এটিই সে কারণ যা উম্মতকে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছে। তাদের একদল হানাফী, আরেকদল শা'ফেয়ী, একদল মালেকী আর আরেক দল হাম্বলী। হাদীসগুলোর মাঝে যদি মতৈক্য ও মিল থাকতো তাহলে মানুষ এ নিয়ে কোন মতভেদ করতো না বা বহুধা বিভক্ত হতো না। কিন্তু তারা হাদীসের একাংশকে আরেক অংশের বিরোধী দেখতে পেয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই হাদীসের বিষয়কে গ্রহণ করেছে নিজেদের জ্ঞান গবেষণা অনুযায়ী

*** টিকা :**

খোদা আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। স্মরণ রাখবেন, ইমাম বুখারীর হাদীস সঠিক কি ভেজাল তা নির্ণয়ে সাবধানতা, বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করা, হাদীসের সমালোচনা আর হাদীস বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই নিয়ে অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সহীহ্ হাদীসের স্ববিরোধ দূর করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এরপর তিনি যা করতে পারেননি কেউ আর তা করতে পারেনি। আপনি কি মে'রাজের হাদীস নিয়ে ভাবেননি? এতে কত তীব্র মতভেদ রয়েছে! অনেকেই মনে করেন, এটি একটি সত্য স্বপ্ন ছিল। অতএব চিন্তা কর– ঘুমিয়ে থেকো না।

(লেখকের পক্ষ থেকে)

এবং মূল অর্থ নির্ণয়ের বিষয়টি খোদার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এক দল নামাযের পদে পদে দু'হাত তোলা, আমীন সশব্দে বলা এবং ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে অবলম্বন করেছে, অপরদিকে আরেক দল এসব বিষয়ে জ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছে। এদের প্রত্যেকেই হাদীসের আলোকে যুক্তি দেয়। এভাবে সহস্র সহস্র হাদীসে মত ও পথের বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়। তাই যে সকল হাদীস নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার মানদন্ডে অধঃপতিত তা স্ববিরোধ, অসামঞ্জস্য ও বৈপরিত্য থেকে মুক্ত নয়।

তুমি কীভাবে এগুলোকে কুরআনের বিচারক হিসেবে গণ্য করতে পারো? এসব কি বিচারকের লক্ষণ? সুতরাং তোমরা চিন্তাশীল হয়ে থাকলে চিন্তা করে দেখ। আমরা হাদীসকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখি না বরং আমরা মুহাদ্দিস ইমামদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাঁদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করি। নি:সন্দেহে হাদীস বড়ই গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। হাদীস ইসলামের ইতিহাস, বেশীরভাগ ধর্মীয় বিষয়াদী ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়ের ধারক ও বাহক। আমরা একে মনে প্রাণে মাহাত্ম্য ও সম্মান দিয়ে থাকি কিন্তু একে ইমাম ও তত্ত্বাবধায়ক রূপে ঐশী গ্রন্থের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। যখন কোন ঘটনা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের মাঝে বিরোধ দেখা দেবে তখন আল্লাহ্ ও রসূলের নামে শপথ করে বলছি, মানুষের সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা কুরআনের পক্ষে থাকবো। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, এসব বিবৃতি, বর্ণনা ও সংবাদ নিরূপণকল্পে কুরআনকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করার মাঝে সব ধরনের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত। অতএব সঠিক, নিরাপদ ও ভ্রান্তিমুক্ত নিয়ম হলো, সমস্ত বিবরণ কুরআনের মানদন্ডে যাচাই করা। কুরআনে যদি বিষয়টির হুবহু উল্লেখ থাকে বা অনুরূপ কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকে তাহলে তা গৃহীত হবে। এর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। কুরআনে অনুরূপ কিছু যদি পাওয়া না যায় অথবা এই উম্মত বা অন্য উম্মতের পরম্পরায়ও যদি দেখা না যায় অধিকন্তু এর বিপরীত বিষয় দেখা যায় তাহলে তা'বীর করা ছাড়া এমন আক্ষরিক অর্থ গৃহীত হওয়া উচিত নয়। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে যে নিরাপদ নিয়ম-নীতি আমাদের হস্তগত হয়েছে এর আলোকে দেখুন, মসীহ্র সশরীরে আকাশে যাওয়া এবং ফিরিশ্তার দুই ডানায় হাত রেখে আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ বা অনুরূপ কোন ঘটনার কোন ভিত্তি কুরআনে আক্ষরিক অর্থে বা প্রচ্ছন্নভাবে আছে কি? প্রকৃত পক্ষে, কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'লাকে ইহজগতে এ ধরনের কার্যকলাপ

থেকে মুক্ত ঘোষণা করে। কুরআন বলে, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪)। তিনি স্বীয় সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত উক্তিতে স্পষ্টভাবে নুযূলের কাহিনীর বিরোধিতা করেছেন যার ভিত্তিতে তিনি মসীহ্‌কে শুভ সংবাদ দিয়েছেন। কথা **'ইন্নী মুতাওয়াফফীকা'** থেকে আরম্ভ হয়ে **'ইয়াউমাল কিয়ামাহ্'** পর্যন্ত পৌঁছেছে কিন্তু এতে মসীহ্‌র আকাশে যাওয়া বা **'নুযূলের'** কথা উল্লেখ করেননি। একথা যদি সঠিক হতো, তাহলে এ শুভ সংবাদের সাথে তাও উল্লেখ করতেন। অতএব এটি এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ, কুরআন এ কাহিনীর সত্যায়ন করেনি বরং কিয়ামত পর্যন্ত মসীহ্‌কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও শুভ সংবাদের উল্লেখ এবং এ কাহিনীকে উল্লেখ না করে একে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছে। এর মাঝে সত্যান্বেষীদের জন্য অনেক সন্তোষজনক যুক্তি আছে।

জেনে রেখো, কুরআন কারো সশরীরে আকাশে যাওয়া এবং সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত বসে থাকার ধারণাকে সমর্থন করে না। তুমি জানো, কুরাইশরা নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক দাবী উত্থাপন করেছে। সেগুলোর একটিতে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছে, যতক্ষণ তুমি আকাশে আরোহণ না করবে আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না। তাদের এমন আবদারের প্রত্যুত্তরে قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪) আয়াত নাযিল হয়েছে। তুমি জানো, আমাদের রসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও খাতামান নবীঈন এবং খোদার দৃষ্টিতে নবীদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয়। অতএব যে বিষয় তাঁর জন্য বৈধ নয় তা অন্যের জন্য কি করে বৈধ হতে পারে? হে আমার ভাই! চিন্তা করে দেখ। খোদা তোমাকে সুস্পষ্ট ইলহাম দ্বারা সাহায্য করুন, আমীন।

বাকী রইলো, আমাদের রসূল (সা.)-এর মে'রাজের প্রসঙ্গটি। এটা ছিল জাগ্রত অবস্থায় একটি পরিপূর্ণ, অতীব সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক এবং অলৌকিক অভিজ্ঞতা। এতে কোন সন্দেহ বা সংশয় নেই, রসূলুল্লাহ্ (সা.) জাগ্রত অবস্থায় এতে দেহসহ উর্ধ্বলোকে গিয়েছেন কিন্তু একইসাথে তাঁর স্ত্রীগণ ও অনেক সাহাবীর (রা.) সাক্ষ্যানুসারে তাঁর দেহ বিছানা থেকে উধাও হয়ে যায়নি। অতএব তুমি বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারছো। মে'রাজের ঘটনা ভিন্নধর্মী একটি বিষয়, এর সাথে হযরত ঈসার আকাশে আরোহণের ঘটনার কোন সামঞ্জস্য নেই। এ বিষয়ে যদি তোমার সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে বুখারী শরীফ পড়ে দেখতে পারো। এরপর তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি না।

এবার ইদ্রিস (আ.) প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার উক্তি- وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا (সূরা মরীয়ম : ৫৮) -এর বিষয়টি দেখা যাক। গবেষক আলেমরা এ বিষয়ে

একমত- এক্ষেত্রে **রাফা**'র' অর্থ হলো সম্মানজনক মৃত্যু প্রদান এবং আধ্যাত্মিক অবস্থানের উন্নতি। আর এ কথার যুক্তি হলো, প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যু অবধারিত। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলে রেখেছেন- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (সূরা রহমান : ২৭)। অথচ কুরআন শরীফে আমরা হযরত ইদ্রিস (আ.)-এর অবতরণ, মৃত্যু বরণ ও পৃথিবীতে সমাহিত হওয়ার কোন উল্লেখ দেখি না। অতএব আবশ্যকভাবে প্রতীয়মান হয় **রাফা'** দ্বারা এ স্থলে মৃত্যুকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সারকথা হলো, যে বিশ্বাস কুরআনের সাথে বিরোধ রাখে এবং এর বিবরণের সাথে সাংঘর্ষিক তা বাতিলযোগ্য ও মিথ্যা কল্প-কাহিনী এবং তা মিথ্যা আরোপকারীদের মনগড়া কথা।

আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, খোদা আপনাকে সাহায্য করুন। মসীহ্ (আ.)-এর আকাশ থেকে সশরীরে বাহ্যিকভাবে অবতরণের বিশ্বাসটি কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত না হওয়া এবং কুরআন বিরোধী হবার পাশাপাশি তওহীদ বা একত্ববাদের বিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকর আর এতে সেই জাতির বিশ্বাস লালিত ও শক্তিশালী হয় যারা এ ধরনের কল্পকাহিনী দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করেছে। এই কথা যদি সত্যি হয়, ঈসা (আ.) তাঁর অন্যান্য ভ্রাতা নবীদের মত মৃত্যুবরণ করেননি বরং আকাশে জীবিত আছেন, একইসাথে তিনি আল্লাহ্র মত পাখিও সৃষ্টি করতেন আর বিশ্ব-প্রতিপালকের মত মৃতদের জীবন দান করতেন- তাহলে এ যুগে যখন খ্রিষ্টানদের বিশৃঙ্খলা সকল দিক থেকে ঢেউয়ের মত ফুঁসে উঠেছে আর যে যুগে মানুষকে পথভ্রষ্ট ও খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য তারা তাদের সম্পদ ও ষড়যন্ত্রকে কাজে রূপায়িত করছে তখন মসীহ্র ঈশ্বরত্বের প্রতি যাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে তাদের জন্য এর চেয়ে বড় পরীক্ষা আর কি হতে পারে?

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! জেনে রাখুন, হাদীস দ্বারা মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকা প্রমাণিত। আমাদের রসূল (সা.) বলেছেন, আমাকে আমার কবরে তিন দিন বা অন্য হাদীস অনুসারে চল্লিশ দিন মৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হবে না বরং আমাকে জীবিত করা হবে আর আমি আকাশের দিকে উত্থিত হবো। অথচ তুমি জানো, তাঁর জড়দেহটি মদীনায় সমাহিত আছে। সুতরাং এর অর্থ আধ্যাত্মিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক উত্তোলন ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর মৃত্যুর পর মনোনীতদের সাথে খোদার এ বিধানই কার্যকর। যেমন তিনি বলেছেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ (সূরা আল ফজর : ২৮-২৯) এ ক্ষেত্রে **'ইরজেয়ী ইলা রাব্বিকে'** শব্দগুচ্ছের অর্থ তাই যা **'রাফেউকা ইলাইয়া'**

শব্দাবলীর দ্বারা প্রতিভাত হয়। সন্তুষ্টচিত্তে এবং সন্তুষ্টিভাজন হয়ে বান্দার খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন আর **'রাফা ইলাল্লাহ'** একই কথা। আল্লাহ্‌র স্থায়ী রীতি হলো তিনি তাঁর নেক বান্দাদের মৃত্যুর পর তাঁর দিকে **রাফা'** করে থাকেন আর তাঁদের পদমর্যাদানুসারে তাঁদেরকে উর্ধ্বলোকে স্থান দিয়ে থাকেন। সে কারণেই আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে মে'রাজের রাতে সকল অতীত নবীর বিভিন্ন আকাশে সাক্ষাত হয়। তদনুযায়ী তিনি আদম (আ.)-কে নিকটবর্তী আকাশে দেখতে পেয়েছেন। আর হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর খালাতো ভাই ইয়াহিয়া (আ.)-কে দ্বিতীয় আকাশে দেখতে পেয়েছেন আর মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত পেয়েছেন পঞ্চম আকাশে। এসব সহীহ্ হাদীস তুমি বুখারী ও সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে খুঁজে পাবে। এতদসত্ত্বেও যারা সত্যকে ভালোবাসে না তারা জেনেশুনে অন্ধ সাজে আর সমস্ত নবী-রসূলের **রাফা'**র বিষয়টি ভুলে যায়। তারা ঈসা (আ.)-এর জীবন ও তাঁর **রাফা'**র বিষয়ে জোর দেয়। মে'রাজের হাদীস পাঠ করতে গিয়ে তা ভুলে যায় আর নিজেদের জীবন উদাসীনতার ঘোরে বৃথা নষ্ট করে।

তবে কি মহানবী (সা.) মৃত আর ঈসা জীবিত? এ যে এক বড়ই অসম বন্টন! সুবিচার কর, কেননা তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। যে ক্ষেত্রে নবীদের সবার আকাশে জীবিত থাকা সাব্যস্ত সেক্ষেত্রে ঈসার জীবিত থাকায় এমন কি বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হয়? তিনি পানাহার করেন আর অন্যরা করেন না- বিষয়টি কি এমন? কুরআনের ভিত্তিতে হযরত মূসা কালিমুল্লাহ্‌র জীবিত থাকার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়। কুরআনে আল্লাহ্ যা বলেছেন তুমি কি তা পড়নি? তিনি বলেছেন, فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ (সূরা আস সেজদা : ২৪) তুমি জানো এ আয়াত মূসা (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আর এটি তাঁর জীবিত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, তিনি আমাদের রসূল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন। মৃতরা তো জীবিতদের সাথে মিলিত হতে পারে না। হযরত ঈসা সম্পর্কে তুমি এমন কোন আয়াত দেখতে পাবে না। বরং তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ কয়েক জায়গায় করা হয়েছে। অতএব চিন্তা কর, আল্লাহ্ তা'লা চিন্তাশীলদের ভালোবাসেন।

তুমি হয়তো বলতে পারো, কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঈসা (আ.)-এর **রাফা'** ও তাঁর ক্রুশে মৃত্যুবরণ না করার কথা বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করলেন? এ দু'টো বিষয় উল্লেখের পেছনে রহস্য কি? এভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন কেন দেখা দিয়েছিল? সেক্ষেত্রে জেনে রেখো, ইহুদী আলেম ও ফকীহদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত ছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে চরম কুধারণা পোষণ

করতো। তারা বলতো তিনি প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। তৌরাতে লেখা আছে, নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার ক্রুশবিদ্ধ ও অভিশপ্ত হয় আর সত্য নবীদের মত আল্লাহ্‌র দিকে তার **রাফা'** হয় না। তাই তৌরাতের বিধি অনুসারে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ক্রুশবিদ্ধ করে মারার সিদ্ধান্ত নেয় আর মানুষের সামনে তারা একথা স্পষ্ট করতে চায়, সে অভিশপ্ত মিথ্যাবাদী তাই আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর **রাফা'** হয়নি। খোদা তাদের ধ্বংস ও অভিশপ্ত করুন। তারা নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন নবী সম্পর্কে কত ঘৃণ্য এক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাঁকে ক্রুশে মারার চেষ্টা করেছিল। তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার লক্ষ্যে সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র করলো যেন তৌরাত অনুসারে তাঁর মিথ্যাবাদী হওয়া এবং **রাফা'**র বিপক্ষে একটি যুক্তি তাদের হস্তগত হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-কে তাই এই কথার মাধ্যমে শুভসংবাদ দিয়েছেন, **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফিকা'** অর্থাৎ আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেব আর **'রাফেউকা ইলাইয়া'** অর্থাৎ সত্য নবীদের মত তোমাকে আমার নৈকট্য প্রদান করবো। খোদার অনুগ্রহ ও দয়ায় তুমি অভিশপ্ত ও মিথ্যাবাদী নও। এ সমস্ত প্রতিশ্রুতি সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে ঈসা (আ.)-এর জন্য ছিল আশ্বাসবাণীস্বরূপ আর ইহুদীদের জন্য ছিল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার প্রমাণ। আর আল্লাহ্ তা'লা যে বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না- এটি ছিল সেই সুসংবাদ। আর আপনি এখন বুঝতে পেরেছেন, **রাফা'** শুধু হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য নয় বরং সকল নবীরই **রাফা'** হয়েছে, তাঁদের আসন হলো সর্বশক্তিমান বাদশাহ্‌র সন্নিধানে। আমাদের নবী (সা.) সকল নবীকে কোন না কোন আকাশে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছেন বরং কোন কোন নবীকে ঈসা (আ.)-এর চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন দেখতে পেয়েছেন। **'ওয়ামা কাতালুহু ওমা সালাবুহু'** আয়াতে আর একটি ইঙ্গিত আছে। তাহলো, খ্রিষ্টানরা দাবী করে, হযরত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে মানব জাতিকে পাপ মুক্ত করার জন্য। তারা মনে করে ক্রুশের ঘটনার পর তিনি তাদের সকল পাপ নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন, তিনি তাদের পক্ষ থেকে প্রায়শ্চিত্তের কারণ ছিলেন এবং তাদেরকে সকল অবাধ্যতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্তিদাতা ছিলেন। অতএব ক্রুশীয় মৃত্যুকে না করার মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় মতবাদ খন্ডন করা ও প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। একইসাথে, এর মাঝে ইহুদীদের দাবীর এবং তাদের ষড়যন্ত্রের খন্ডন নিহিত যা তারা তৌরাতের অনুকরণে অবলম্বন করেছে। এসব জাতির অপবাদ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে নির্দোষ ঘোষণাও এর উদ্দেশ্য। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা

কুরআনে ঈসা (আ.)-কে ক্রুশবিদ্ধ করে মারার কাহিনী উল্লেখ করে একে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন, তা না হলে, এই উল্লেখের কোন লাভ নেই। কত নবী যে খোদার পথে নিহত হয়েছেন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ মাত্র নেই। তাই আমার পক্ষ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি গ্রহণ কর এবং একে সত্য জ্ঞান করো।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেন সর্বত্র মসীহ্র আগমনের জন্য **'নুযূল'** শব্দ ব্যবহার করলেন আর 'আবির্ভূত করা' বা 'প্রেরণ করা' ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে **'নুযূল'** বা অবতরণ শব্দ কেন অবলম্বন করেছেন প্রশ্নটি তোমার মনে হয়তো সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। জেনে রেখো! এতে গভীর রহস্য নিহিত আছে। কুরআন যার প্রতি বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করেছে তা হলো, খোদার নবীরা (আ.) এ জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মৃত্যুর পর আল্লাহ্র দিকে উত্থিত হন। যে পৃথিবী তারা ছেড়ে যান এর জন্য তাদের মাঝে কোন ধরণের ব্যতিব্যস্ততা ও চিন্তা থাকে না বরং তাঁরা প্রভুর কাছে সানন্দে গিয়ে মিলিত হন। মহা সুখ-শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দঘন পরিবেশে তাঁরা মহাশক্তিধর খোদার কাছে চলে যান আর খোদাপ্রাপ্তদের সাথে মিলিত হন। কখনও কখনও এমনও হয়, যখন তাঁদের কারো উম্মত পৃথিবীতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আর তারা তাদের প্রাথমিক অজ্ঞতার দিকে বরং এর চেয়েও নোংরা ও নিকৃষ্ট অবস্থার দিকে ফিরে যায় তখন খোদার কাছে সেই উম্মতের নবী সে সংবাদ শুনে কেঁপে ওঠেন আর দারুণভাবে দুঃখ-বেদনা ও ব্যাকুলতার সম্মুখীন হন আর তাঁর উম্মতের সংশোধনের জন্য পৃথিবীতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু খোদার অমোঘ সিদ্ধান্ত **'আন্নাহুম লা ইয়ারজিউন'** (সূরা আম্বিয়া:৯৬) অনুসারে পুনরায় আসার কোন উপায় থাকে না। তখন খোদা পৃথিবীতে তাঁর অনুরূপ একজন মসীল বা সদৃশ সৃষ্টি করেন। তাঁর অর্থাৎ প্রথমজনের যাবতীয় সংকল্প এঁর মাঝে রেখে দেন আর তাদেরকে এক ও অভিন্ন অস্তিত্বে পরিণত করেন যেন তাঁরা একই নির্যাস থেকে সৃষ্ট। এবং তিনি তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে এঁর মাঝে সৃষ্টি করেন। তখন সেই মসীল বা সদৃশ মহাপুরুষ সে সকল মহিমা, চরিত্র ও গুণাবলীসহকারে আবির্ভূত হন যার অধিকারী ছিলেন সেই (পূর্ববর্তী) মূল নবী। **'নুযূল'** শব্দ অবলম্বনের পিছনে এটিই কারণ। যেন এটি প্রমাণিত হয়, প্রতিশ্রুত মসীহ্ প্রকৃত মসীহ্র পদাঙ্ক অনুসরণে আসবেন, ইনি যেন তিনিই। অতএব বুখারীতে যে **'নুযূল'** শব্দ ব্যবহার হয়েছে এর অর্থ হলো, আগমনকারী মসীহ্ সত্যিকার মসীহ্র স্থলে আবির্ভূত হবেন। এছাড়া যেখানে নৈরাজ্যবাদী বিভ্রান্তকারী দাজ্জাল পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার জাগতিক ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও হীন কৌশলসহকারে আবির্ভূত হবে সেখানে মসীহ্র জন্য **'নুযূল'** শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, তিনি আসবেন এ

জগত বহির্ভূত এক ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নিয়ে। এতে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, দাজ্জাল জাগতিক চক্রান্ত ও হীন ষড়যন্ত্রের উপর ভর করে অশান্তি ছড়াবে আর মসীহ্ মাওউদ কোন জাগতিক অস্ত্র তথা তরবারী-তীর বা বর্শা নিয়ে আসবেন না বরং তিনি আসবেন স্বর্গীয় অস্ত্রসহকারে ফিরিশ্তার ডানায় ভর করে। তাঁর সাথে জাগতিক কোন উপকরণ থাকবে না। তিনি স্বর্গীয় নিদর্শন ও এর বরকতের দ্বারা সমর্থিত হবেন যেন তিনি এক ফিরিশ্তা যিনি পার্থিব শয়তান* ও তার অগ্নিশিখাকে নির্বাপন এবং তার দুস্কৃতির অপনোদন কল্পে আকাশ থেকে নাযিল হয়েছেন। স্মরণ রেখো, মুসলমানদের উপর যখন বিভিন্ন প্রকার সমস্যার বাঁধ ভেঙ্গে পড়বে, তাদের পার্থিব ও জাগতিক উপকরণ হ্রাস পাবে আর খ্রিষ্টানদের প্রাধান্য, তাদের সম্পদ ও প্রাবল্য দেখে এদের হৃদয় কেঁপে উঠবে এবং তাদের ধর্মীয় নেতা যারা সবচেয়ে বড় যুগ-দাজ্জাল এবং শয়তানের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, যাদের মত শয়তান কেউ কখনও দেখেনি আর যাদের ষড়যন্ত্রের ন্যায় ষড়যন্ত্র কেউ কখনও লক্ষ্য করেনি, এহেন সময় '**নুযূল**' শব্দ এটি একটি স্বর্গীয় শুভসংবাদ যেন পরিস্থিতি দৃষ্টে তারা নিরাশ না হয়।

তাই শেষ যুগের দুর্বল মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শুভসংবাদ দিয়েছেন এবং বলেছেন, যখন তোমরা খ্রিষ্টধর্মের নেতাদের ধরাপৃষ্ঠে ছেয়ে যেতে দেখবে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, ছল-চাতুরী, জ্ঞান, মানুষের হৃদয় নিজেদের প্রতি আকর্ষণ, কৃত্রিম নমনীয়তা ও কোমল ভাষণ, কপট শিষ্টাচার, নানাবিধ ধূর্ততার প্রয়োগ আর শিক্ষা, সম্পদ, নারী, পদবী, চিকিৎসা, লোভ-লিপ্সা ও বড় বড় আশা-আকাঙ্খা জাগিয়ে মনস্তুষ্টির বিধান এবং ছল-চাতুরী, জাগতিক ক্ষমতা ও রাজত্ব্যের লোভ, সরকারের নৈকট্য ও শাসকদের দৃষ্টিতে সম্মানের প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে তারা পৃথিবীবাসীদের ধ্বংস করছে। এর পাশাপাশি যখন তোমরা লক্ষ্য করবে, তারা নিজেদের কথার যাদু, আর তাদের বিস্ময়কর সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ এবং জাগতিক কলাকৌশলের চরম উন্নতি ঘটিয়ে তারা সমস্ত পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে- তখন তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখিতও হয়ো না। আমরা ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের দুর্বলতা ও

*** টিকা**

কোন কোন হাদীস অনুযায়ী, দাজ্জাল মানব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে না বরং সে এক শয়তান হবে, যে নিজ অনুসারীদের হৃদয়ে শেষ যুগে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করবে। তার অনুসারীরা তার এবং তার ইচ্ছা আকাংখার বিকাশ হবে।

(লেখকের পক্ষ থেকে)

শৈথিল্য লক্ষ্য করছি, এ যুগে আমরা তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস, সম্পদ ও উপায়-উপকরণের অপ্রতুলতাও প্রত্যক্ষ করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দুর্বল এক জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছো। অতএব আমরা এ যুগে আমাদের নিজ সন্নিধান থেকে তথা উর্ধ্বলোক থেকে আমাদের এক মহান মনোনীত বান্দাকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করছি এবং তোমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে আমাদের হাতে ও ফুৎকারে গড়া এক সাহায্য আসছে, যার সাথে জাগতিক কোন উপায়-উপকরণের মিশ্রণ নেই আর এভাবে আমরা ধর্মের সত্যতা অনাচারীদের সামনে তুলে ধরবো।

কোন কোন হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মসীহ্ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত দাজ্জাল উভয়েই প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে অর্থাৎ ভারত থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। মসীহ্ মাওউদ বা তাঁর কোন খলীফা দামেস্কে যাবেন এটিই **‘ইন্না ঈসা ইয়ানযিলু ইনদা মানারাতি দামেস্ক,’** হাদীসের অর্থ। কেননা, নাযীল বলা হয় আগন্তুক মুসাফিরকে, যে অন্যদেশ থেকে আসে। এক হাদীসে ব্যবহৃত মাশরেক (প্রাচ্য) শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে, তিনি প্রাচ্যের কোন দেশ অর্থাৎ ভারত থেকে সফর করে দামেস্ক নগরীর দিকে যাবেন। আমার হৃদয়ে ইলকা (ঐশী চৈতন্যের সঞ্চার) করা হয়েছে, **‘ঈসা ইনদা মানারাতে দামেস্ক’** এই শব্দমালা ইঙ্গিত করছে, তার আবির্ভাবের যুগের প্রতি, কেননা হরফগুলোর সংখ্যমানের দিক থেকে (হুরুফে আবজাদের) যোগফল সেই হিজরী সন দাঁড়ায় যে বছর খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি মিনারা শব্দ বেছে নিয়েছেন এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য দামেস্ক ভূখন্ড বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ও কদাচারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হবার পর প্রতিশ্রুত মসীহ্র দোয়ায় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আর তুমি জানো দামেস্ক খ্রিষ্টানদের নানাবিধ ফিৎনার উৎসস্থল ছিল।

আমাদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টানদের ইঞ্জিল প্রত্যক্ষ করার পর এর বিবরণ হলো, **পৌল-ই** হলো সেই প্রথম ব্যক্তি যে খ্রিষ্টধর্মকে বিকৃত ও তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের মূলকে বিনষ্ট করেছে। প্রকৃতপক্ষে, সে অনেক বড় ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। সে দামেস্কে গমন করে আর সেসব খ্রিষ্টান নেতা যারা তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উদাসীন ছিল, যারা ছিল বাহ্যত: স্বল্পজ্ঞানী, যাদের মতামত ছিল অগভীর আর বোধ বুদ্ধি ছিল দুর্বল। যারা বর্ণনাকারী ও বর্ণনাকৃত বিষয় মিথ্যা ও নৈরাজ্যকর হলেও নানা ধরনের মনগড়া কথা ও আশ্চর্যজনক গল্প দ্রুত গ্রহণ করতে অভ্যস্থ ছিল। তাদের কাছে উপস্থাপনের জন্য সে নিজের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ মনগড়া কাহিনী বানায়। পৌল দামেস্কে **আনানিয়া** নামক এক ব্যক্তির দেখা পায়। সে প্রথম শ্রেণীর এক নির্বোধ ছিল আর এ ধরনের

মনগড়া মিথ্যার প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হতো। সে বললো, হে আমার সম্মানিত নেতা! আমি একটি অদ্ভুত কাশ্‌ফ দেখেছি, আমি এক অশ্বারোহী দলের সাথে ভ্রমণ করছিলাম, যারা বিশেষ একদিকে যাচ্ছিল। আর আমি তখন মসীহ্‌র আনীত ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলাম। আমার সকাল সন্ধ্যা কেবল এ চিন্তায় দিন কাটতো। তখন আমার সামনে মসীহ্ আবির্ভূত হলেন এবং আমাকে আলোর মধ্য হতে ডাক দিলেন। আমি তাঁর ডাক শুনে তাঁকে চিনলাম। তিনি বললেন, হে পৌল! তুমি কেন আমাকে কষ্ট দাও? তুমি কি নিক্ষিপ্ত লৌহ বর্শার পথ হাত দিয়ে রোধ করার ক্ষমতা রাখো? তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করেন এবং ভয় দেখান। আমি ভয়ে কাঁপছিলাম, বললাম, হে প্রভু! আমি আমার কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত। বলুন আমি এখন কি করতে পারি? তিনি আমাকে নির্দেশের স্বরে বললেন, দামেস্ক যাও, সেখানে **'আনানিয়া'** নামে এক ব্যক্তির সন্ধান কর আর তার সামনে এই কাহিনী বর্ণনা কর। তিনি কি করতে হবে তা তোমাকে বলে দেবেন। সব প্রশংসা ইশ্বরের! আমি আপনাকে পেয়ে গেছি আর সে সকল গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত দেখছি যে সম্পর্কে আমার প্রভু মসীহ্ আমাকে অবহিত করেছেন। এই ষড়যন্ত্রের ভূমিকা উপস্থাপনের পর সে বলে, হে আমার প্রভু! আমি ইহুদী ধর্মের বন্ধনমুক্ত। অতএব আমাকে পবিত্র খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে নিন। আমি মসীহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার কাছে বিশ্বাসী সুসংবাদদাতা হিসেবে এসেছি। অতএব সে আনানিয়ার হাতে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। আনানিয়া তার প্রত্যেক কথায় সায় দেয়, তার প্রতিটি চাহিদা পূরণ করে এবং তাকে সম্মানিত করে এবং কাহিনীকে সে দামেস্ক শহরে ছড়িয়ে দেয়। অতএব যে ভূমিতে সর্বপ্রথম মসীহ্‌র ঈশ্বরত্বের গোড়াপত্তন হয়েছে তা হলো, দামেস্ক নগরী। আর এতে পৌল নিজ হাতে এ অপবিত্র চারাগাছগুলো রোপন করে এর অধিবাসীদের ধ্বংস করে। অতএব খ্রিষ্টানরা হচ্ছে, পৌল বপিত বীজের বৃক্ষ যা সে দামেস্কে বপন করেছে। অতএব প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) দামেস্ক নগরীর উল্লেখ করে সতর্ক করার উদ্দেশ্য হলো, দামেস্ক শহর ছিল নৈরাজ্যের সূচনা ভূমি এবং যাবতীয় খৃষ্টীয় বিশৃংখলার প্রথম উৎস ভূমি। যার ফলশ্রুতিতে এক দুর্বল বান্দাকে উপাস্য বানানো হয়েছে। যেভাবে পৌল খ্রিষ্টানদের চোখে একটি সম্মানের আসন লাভের মোহে বহুশ্বরবাদ, কুফরি, নোংরামী ও স্বীয় প্রতারণাসহ দৃশ্যপটে এসেছে সেভাবে শেষযুগে একজন একত্ববাদী বান্দা তৌহীদ প্রচারের জন্য এবার সেখানে আবির্ভূত হবেন। সারকথা হলো, দামেস্ক খ্রিষ্টান ফিৎনার মূল ও উৎসস্থল এবং কুচক্রীদের বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্রের সূচনাস্থল ছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর

বান্দাদের শুভসংবাদ দিয়ে বলেছেন, মসীহ্‌র ঈশ্বরত্বের ফিৎনা সারা পৃথিবী থেকে মিটে যাবে এমন কি দামেস্ক থেকেও, এর উৎস ও জন্মস্থানে তৌহীদ ঠিক সেভাবে পূর্ণোদ্যমে প্রকাশিত হবে যেভাবে এখান থেকে নৈরাজ্য আরম্ভ হয়েছিল। এটি খোদার কাজ। কিন্তু যারা সবচেয়ে দয়ালু খোদার দয়ার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাস করে না–তাদের দৃষ্টিতে এটি এক অদ্ভুত বিষয়।

দাজ্জালকে বধ করা মসীহ্‌র সত্যতার একটি লক্ষণ। হে সম্মানিত ভাই সকল! খোদা আপনাদের সহায় হোন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, দাজ্জাল শব্দ কোন ব্যক্তির পিতামাতার দেয়া নাম নয়। বরং অভিধানে তা একটি ভয়াবহ দলের নাম যারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে চষে বেড়াবে আর সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করবে এবং একে খাঁটি সত্য হিসেবে তুলে ধরবে। তারা ধরাপৃষ্ঠকে ধোঁকা ও প্রতারণা দিয়ে ভরে একেবারে নোংরা করে ফেলবে। ষড়যন্ত্র ও কূটচালে তারা সকল কুচক্রী ও প্রতারককে হার মানাবে। তাদের ছড়ানো বিপদ-আপদ ও সমস্যা সারা পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে। দাজ্জাল বলতে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝানো হতো তাহলে মহানবী (সা.) যাকে দাজ্জাল উপাধি দিয়েছেন তার নাম অর্থাৎ তার পিতামাতা তাকে যে নাম দিয়েছেন তা এবং তার পিতামাতার নামও উল্লেখ করতেন কিন্তু তিনি তা করেননি আর তার পিতামাতার নামের কথাও স্পষ্টভাবে বলেননি। তাই আমাদের জন্য আবশ্যক, আমরা যেন নিজেদের পক্ষ থেকে একে এক বিশেষ ব্যক্তির রূপ দান না করি। বরং আরবী ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং আমাদের উচিত সেই অর্থকে প্রাধান্য দেয়া যে দিকে কুরাইশের ভাষা আমাদেরকে পথের দিশা দেয়। অতএব যেখানে এটি প্রমাণিত হলো, দাজ্জাল হলো একটি ষড়যন্ত্রকারী দল, তাই শব্দের অর্থের দিক থেকে আমাদের জন্য একথা স্বীকার করা আবশ্যক, তারা এমন একটি দল যারা ষড়যন্ত্র, কূচক্র ও প্রতারণায় সমসাময়িক যুগের লোকদের মাত করে দেবে আর নিজেদের নোংরা ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে কলুষিত করে তুলবে। এরপর কুরআনের দিকে ফিরে গিয়ে আমরা যদি গভীরভাবে প্রণিধান করি আর দেখি, তা দাজ্জাল নামে বিশেষ কোন ব্যক্তির বিবরণ তুলে ধরে কি-না? কিন্তু আমরা এতে তার কোন ছাপ এবং তার প্রতি কোন ইঙ্গিতও দেখতে পাই না। অথচ তা এমন সব মহান ঘটনা বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছে ধর্মাঙ্গনে যেগুলোর গুরুত্ব অপরীসিম। কুরআন বলে, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ (সূরা আল আনআম : ৩৯)। অনেক স্থানে বলেছে, কুরআনে প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু জাতির (অর্থাৎ

মুসলমানদের) ধারণানুসারে আমরা কুরআনে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে কোথাও দাজ্জালের উল্লেখ বিস্তারিতভাবে দূরে থাক, প্রচ্ছন্নভাবেও দেখি না। তবে হ্যাঁ, ধর্মের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী একটি দলের উল্লেখ আমরা অবশ্যই দেখতে পাই। কুরআন উল্লেখ করেছে– শেষ যুগে একটি প্রতারক ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী জাতির অভ্যুদয় ঘটবে। তারা সকল উঁচুস্থান থেকে দ্রুত ধেয়ে আসবে আর সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করবে। হাদীসে এই হলো সেই দল যাকে দাজ্জাল বলা হয়েছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন, এই কথাটি সত্য আর এর সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। তুমি কি দেখ না, আদম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সকল কাফির সম্মিলিতভাবে যত কুফরী ও শির্‌ক ছড়িয়েছে এরা একাই এর তুলনায় বেশী ছড়িয়েছে? তারা যে স্থানই অতিক্রম করেছে এবং যেখানে যেখানে রাজত্ব করেছে তাতে মিথ্যা, অশান্তি, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করেছে এবং বস্তুবাদিতার মোহ, সম্পদ, জমি, অট্টালিকা ও রাজত্ব সম্পর্কে নানাবিধ বিবাদ-বিতন্ডার বীজ বপন করেছে। তারা মানুষের এক দলকে আরেক দলের বিরুদ্ধে তাদের সূক্ষ্ম ফন্দি ও সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নানা ধরনের বিবাদ-বিতন্ডায় উসকে দিয়েছে। তারা অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহ ও কুফরী ছড়িয়েছে আর পৃথিবীবাসীকে দাজ্জালী ভাবধারা ও সূক্ষ্ম চক্রান্ত শিখিয়েছে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এদেশে, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা, সততা, আস্থা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, শ্রদ্ধাবোধ, শালীনতা ও পরকালের চিন্তা বলতে আর কিছু বাকী নেই।

এদের পারস্পরিক ভালোবাসা জাগতিক স্বার্থে, এদের পারস্পারিক ঘৃণা-বিদ্বেষ জাগতিক স্বার্থে, এদের পারস্পরিক মিলন জাগতিক স্বার্থে, এদের পরস্পরের সম্পর্কচ্ছেদ জাগতিক স্বার্থে। ইহজগত ও এর চাকচিক্যের কথা শুনেই এরা আনন্দিত হয়, এদের মাঝে অনেক চোর, প্রতারক এবং আত্মসাৎকারীও আছে। তারা দুনিয়ার সামান্য সম্পদ ও সম্মানের মোহে তাদের অংশীদারদের এমন কি তাদের বাপ-চাচাদের মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে কিন্তু নিজ মৃত্যু সম্পর্কে আমি তাদেরকে উদাসীন থাকতে দেখি। মোট কথা, খ্রিষ্টানরা অশান্তি ও ভ্রষ্টতার বিস্তার এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ী এক জাতি। আর তারা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ, কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম আর অঢেল সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী, সকল ফিৎনার উৎস। দূর-নিকটের কেউই তাদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। তারা এ পৃথিবীর মানুষকে চড়ুই পাখির মত মনে করে আর ডানা ছিঁড়ে ফেলে তাদের মাংস ভক্ষণ করে। তারা মানুষকে অসহনীয় জাগতিক দুর্দশা ও বিপদাবলীয় মাঝে ছেড়ে দিয়েছে আর তাদেরকে নিজেদের মত ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী বানিয়ে ছেড়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার ও আয়-রোজগার তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। ভ্রষ্টতার প্রবল বাতাস তাদের ঈমানকে হরণ করেছে। ভয়াবহ তুফান সদৃশ ফিৎনার কারণে এদের নতুন প্রজন্ম, এদের নারীরা এবং এদের পরবর্তী প্রজন্ম সকলেই পথ হারিয়ে বসেছে আর জাতির নেতৃস্থানীয়রা, আলেমদের সন্তানরা ও ধনীদের একটি বিশাল গোষ্ঠী খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। কেউ তাদের সম্পদের লোভে, কেউবা নারীদের লোভে আর কেউ মদ, অনাচার-কদাচার আর খ্রিষ্টধর্মের লাগামহীন স্বাধীনতার মোহে আকৃষ্ট হয়ে, আর কেউ কেউ জাগতিক ক্ষমতা, রাজত্ব, পদ, ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে গিয়ে মুরতাদ হয়েছে। তবে খোদার কৃপা ও অনুগ্রহদৃষ্টি যাদেরকে রক্ষা করেছে, তারা এমন লোকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা অতি বিরল। অতএব এ হলো ইসলামের জন্য ভয়াবহ সমস্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ যা দেখে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হৃদয় কেঁপে ওঠে। একমাত্র ঐশী কৃপাদৃষ্টি ও অনুগ্রহই এ থেকে মুক্তি দান করতে পারে। কেননা মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে আর তাদের উপর নানারূপ বিপদ ভয়াবহ বৃষ্টিধারার মত নেমে এসেছে এবং পাপ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং চাকচিক্যের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আর এদের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে মিশে ধ্বংস হয়েছে। অতএব খ্রিষ্টানরাই যে যুগের দাজ্জাল এবং শয়তানের সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রতিচ্ছবি সে সম্পর্কে সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তাদের নৈরাজ্য, প্রতারণা, আর জল, বায়ু, পর্বত, সমুদ্র ও নদীর উপর নিয়ন্ত্রণ দেখ, আর তাদের ভূগর্ভস্থ ধনভান্ডার উদঘাটন, প্রতারণা ও ভ্রষ্টতার প্রতি লক্ষ্য কর-তুমি কি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে এদের কোন তুলনা খুঁজে পাও?

মসীহ্ মাওউদ খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করবেন আর তাদেরকে হত্যা না করা বা তাদের ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না বলে কিছু সংখ্যক মুসলমান আলেমের যে উক্তি রয়েছে এটি আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অপবাদ। কেননা, গভীর দৃষ্টিতে সহীহ্ হাদীসের দিকে তাকালে এতে এর কোন নাম গন্ধও আমরা দেখতে পাই না আর আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, আলেমরা এ হাদীস বুঝতে ভুল করেছে এবং শব্দের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করেছে। তারা কি জানে না, কুরআন এ কথার সমর্থন করে না? আর বুখারী যা আল্লাহ্র কিতাবের পর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ তা স্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে একে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এ সম্পর্কে একটি হাদীস আছে যাতে বলা হয়েছে, ঈসা যুদ্ধ রহিত করবেন। এটি এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে, তিনি তীর–তরবারীর যুদ্ধ করবেন না। অতএব সুবিচার করুন, খোদা আপনার প্রতি

দয়া করুন। আমাদের এ যুগে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সাথে তাদের ধর্ম প্রচারের কারণে যুদ্ধ করে না আর বাহুবলে নিজ ধর্ম পালন করা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখে না। অতএব নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কীভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?

বরং বৃটিশ রাজত্ব মুসলমানদের প্রতি অতি সদয় আর আমরা যে মহারাণীর প্রজা, ইসলাম তাঁর দৃষ্টিতে অপরাপর ধর্মের উপর প্রাধান্য রাখে, বরং আমরা এর তুলনায় অধিক উৎসাহব্যঞ্জক খবর শুনেছি কিন্তু তা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে বলে মনে করি না। মোট কথা হলো, তিনি অত্যন্ত সম্মানিত। খোদা তাঁর হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন, সে কারণে তিনি তাঁকে মুসলমানদের জন্য সহানুভূতিশীল করেছেন, এমন কি ইসলাম তাঁর দেশে প্রসার লাভ করুক- এটি তিনি চান। তাঁর আশ্রিত একজন মুসলমানের কাছে তিনি আমাদের ভাষায় লেখা কয়েকটি বইও পড়েছেন। পশ্চিমা দেশে আমাদের ধর্মের প্রসারে তিনি আনন্দিত। বরং তাঁর স্বজাতির কিছু লোক তাঁর রাজ্যের নিকটবর্তী একটি দেশে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি তাদেরকে দয়া দেখিয়েছেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের বইপত্র তাঁর কাছের লোকদের মাঝে বিতরণ করেছেন। তিনি তাদের কয়েকজনকে তাঁর সম্মানিত রাজন্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে চান এবং তিনি তাদের উপাসনার জন্য মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা তাঁর ছায়ায় শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছি। আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, পুণ্যকর্মের আদেশ দেই এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকি। আমরা যেভাবে চাই সেভাবে খ্রিষ্টানদের জবাব দিতে পারি, বাঁধা দেয়া বা নিষেধ করার কেউ নেই, নেই কোন প্রতিবন্ধকতা। এসব কিছু তাঁর উন্নত মনমানসিকতার সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও পরম সুবিচারের কল্যাণে হচ্ছে। খোদার কসম! আমরা যদি কোন মুসলমান দেশেও হিজরত করতাম এর চেয়ে বেশী নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য পেতাম না। তিনি আমাদের প্রতি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি এমন নিয়ামতরাজি প্রদানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের শক্তি সাধ্যের বাইরে। তাঁর সবচেয়ে মহান অনুগ্রহ হলো, তিনি ও তাঁর রাজন্যবর্গ আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে বিন্দুমাত্র নাক গলান না। তাদের কেউ আমাদের ফরয, আমাদের সুন্নত, আমাদের নফল এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাদের স্বজাতীর ধর্মীয় বিশ্বাস খন্ডনে বাধা প্রদান করেন না। জাগতিক নিয়ামত এবং সুযোগ সুবিধা

সরবরাহের ক্ষেত্রে তাঁরা কার্পণ্য করেন না আর নিশ্চয়ই তাঁরা ন্যায়পরায়ণ হিসেবে পরিগণ্য।

তাই আমার মতে, ভারতের মুসলমান প্রজাদের বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়া এবং এই মমতাশীল সরকারের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করা বা এ বিষয়ে কাউকে সাহায্য করা বা কোন বিরোধীকে দুস্কৃতিমূলক বিষয়ে কথায় বা কাজে বা ইঙ্গিতে অথবা সম্পদ ব্যয় বা নোংরা পরিকল্পনার মাধ্যমে এবং অপকর্মে সাহায্য করা কোনভাবেই বৈধ নয় বরং এমন বিষয় নিশ্চিত হারাম। যে এমনটি করতে চায় সে খোদা ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং ভয়াবহ ভ্রষ্টতায় নিপতিত। সত্য কথা হলো, আমাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অনুগ্রহকারীকে কষ্ট দেয়া চরম অনিষ্টতা ও নোংরামীর পরিচয় বহন করে এবং তা ইনসাফ ও ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী। খোদা তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। হ্যাঁ, খ্রিষ্টান আলেমরা এক অধম বান্দাকে উপাস্য বানিয়ে, এদের মিথ্যা প্রতিমার দিকে আহ্বানের মাধ্যমে এবং খৃষ্টীয় মতবাদকে জগতের আনাচে কানাচে প্রসার দেয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়িয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, এমন বিষয় বা ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে এ সরকারের কোন যোগসূত্র নেই। আমি এ বিশ্বাস রাখি না, তাদের কোন বিবেকবান হযরত ঈসা (আ.)-কে সত্যিকারের খোদা বলে বিশ্বাস করেন, বরং তারা এমন বিশ্বাসকে হাস্যকর বলে মনে করেন আর দিন দিন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। বরং আমরা দেখি, মহারানীর দেশে ইসলামের সুবাতাস বইছে। প্রত্যেক বছর মানুষ দলে দলে এতে প্রবেশ করছে বলে আমরা দেখছি এবং পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে খ্রিষ্টধর্মকে পরিহার করছে। তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত যে সব শাসকবর্গ রাজ্যের শৃঙ্খলা ও দেখাশুনার জন্য ভারতে পাঠানো হয়েছে তারা মানুষের প্রতি স্বৈরাচারীর ন্যায় যুলুম করেন না আর তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত নেন না বরং সকল প্রজাকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। তারা মানুষের উপর অন্যায় করেন না এবং তাদের ছায়ায় সকলেই পরম নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করছেন।

যে সব পাদ্রী ইঞ্জিল এবং এর মিথ্যা ও বানানো শিক্ষার প্রতি আহবান করে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে বাহুবল প্রয়োগ করে না আর আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করে না, নিজ ধর্মের জন্য আমাদের জাতিকে তারা হত্যা করে না আর আমাদের সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করে না আর আমাদের সম্পদও ছিনিয়ে নেয় না। বরং তারা অপকর্ম, নোংরা লেখা, বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা আমাদের নবী (সা.)-এর অবমাননা এবং কুরআন ও এর শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের কষ্ট

দেয়। বৃটিশ সাম্রাজ্য এ বিষয়গুলোর কোনটিতে তাদেরকে কোনভাবে সাহায্য করে না আর মুসলমানদের তুলনায় তাদেরকে প্রাধান্যও দেয় না। বরং আমরা দেখি, এই ন্যায়পরায়ণ সরকার সকল জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে আর আইনের চতুঃসীমার ভেতর তাদের সবকিছু করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে আর মানুষ তাদের আইন অনুসারে নিজেদের পছন্দমত কাজ করতে পারে। এক ধর্ম আরেক ধর্মের বিরুদ্ধে আরোপিত আপত্তি খন্ডন করছে আর এ দেশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ধর্মীয় আলোচনা ও বিতর্ক সভা অব্যাহত আছে। সরকার এদের বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না বরং তাদেরকে বিতর্কের অবাধ সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছে। এক পর্যায়ে আমি এই রহস্যজনক বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকি অর্থাৎ ভাবতে থাকি, কেন খোদা তা'লা মসীহ্ মাওউদকে তীর ও তরবারীতে সজ্জিত করে প্রেরণ করলেন না বরং তাঁকে নমনীয়তা-কোমলতা, বিনয়, নম্রভাষণ ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা, সৌজন্যবোধ ও উত্তমভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন আর এর বেশী কিছু করতে নিষেধ করেছেন। আমি এ বিষয় নিয়ে ভাবতাম, এক পর্যায়ে খোদা তা'লা আমার সামনে রহস্য উম্মোচন করেন। আমি অবগত হলাম, কোন সংস্কারক, তিনি রসূল হোন বা মুজাদ্দিদই হোন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যুগ এবং মানুষের ব্যাধি অনুসারে সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেন।

কখনও কখনও শির্ক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস লালনের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী, অত্যাচারী এবং অবাধ্য হয়ে উঠে আর দুর্বলদের প্রতি যুলম করে। তারা সত্যানুসারীদের এমন বিরোধিতা করে যা হত্যা, লুটতরাজ ও তাদের বন্দী করার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। তারা তাদের রক্তপাত ঘটায়, সম্পদ ছিনতাই করে তাদের সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করে আর পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়ায়। খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে এক পরীক্ষাস্বরূপ তাদেরকে দৈহিক শক্তি, আর্থিক প্রাচুর্য ও পার্থিব নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তারা খোদার নিয়ামতকে অস্বীকার করে, কোন নসীহতকারীর হিতোপদেশ এবং আহ্বানকারীর আহ্বানের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না, আর প্রজ্ঞাবানদের মুখ নিঃসৃত প্রজ্ঞার কোন নিগূঢ় কথা তারা শোনে না বরং তাদের কাছে সব কথার উত্তর হলো, তরবারী বা বর্শা। তারা পশু বা মাতালদের মত জীবন যাপন করে। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু এর মাধ্যমে উপলব্ধি করে না। কান আছে অথচ শোনে না, চোখ থাকতেও দেখে না। খোদা তা'লা তাদেরকে যে আধিপত্য, রাজত্ব, সম্পদ ও প্রাচুর্য দিয়েছেন তা নিয়ে তারা গর্ব করে। যারা খোদার ধর্মে প্রবেশ করে এরা তাদের কষ্ট দেয় বরং হত্যার প্রয়াশ পায়। অহংকারবশত খোদার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।

নিদর্শন তথা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও তারা জেনেশুনে অন্ধ সাজে। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রেরিত পূর্ণ সত্য তাদের কাছে পরিস্ফুটিত হওয়ার পরও তারা এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। বরং তারা অনাচার, সাম্প্রদায়িকতা, অজ্ঞতাপ্রসূত আত্মাভিমান, হৃদয়ের কাঠিন্য এবং সত্য-প্রচারকদের কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে আরও দুঃসাহস দেখায়।

তখন এমন সব জাতির প্রতি খোদা তা'লা চরমভাবে ক্রোধান্বিত হন এবং তিনি তাদের ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার এবং তাদের সম্মানিতদের লাঞ্ছিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাদের প্রতি পৃথিবী বা আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ করেন আর তাদের পরস্পরকে পরস্পরের হাতে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে তাদের দলে উপদলে বিভক্ত করে দেন। তাদেরকে তরবারী ও তীর দ্বারা সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য খোদা তা'লা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দেন আর তিনি তাদের মধ্য থেকে সমর্পণকারীদেরকে নিস্তার দেন এবং অত্যাচারীদের অহংকার ধুলায় মিশিয়ে দেন। তখন প্রত্যাদিষ্ট রসূল তাদের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হন আর পৃথিবীতে ভয়াবহ রক্তবন্যা বয়ে যায়। এক পর্যায়ে অহংকারী দুর্বল হয়ে যায় আর যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং খোদা তা'লা তাদের ভয়ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় বদলে দেন। এর ফলশ্রুতিতে তারা তাঁর উপাসনা শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে সক্ষম হন এবং তাঁর ধর্মে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাবোধ করেন। তুমি যদি এমন বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত দেখতে চাও তাহলে হযরত মূসা (আ.) ও খাতামান নবীঈন (সা.)-এর যুগে তা দেখতে পাবে।

আবার কখনও কখনও মানুষ তাদের ধর্ম ও ঈমান নষ্ট করে বসে ঠিকই কিন্তু তারা ধর্মের খাতিরে খোদার নবী ও রসূলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না আর তীর ও তরবারীর বলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না বরং বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা ও বক্র মন্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর তারা ইসলামের সত্যতার নিদর্শনাবলীকে বর্শা ও তীরের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণে উদ্যত হয় না বরং দূরভীসন্ধি ও প্রতারণামূলক কথার মাধ্যমে তা করে। সত্যান্বেষী সত্য গ্রহণ করতে চাইলে তাকে কষ্ট দেয় না। দু'টির একটি কারণে তারা এমনটি করে থাকে। একটি হলো, যে জাতির প্রতি রসূল বা মুহাদ্দাস প্রেরিত হন, সেই জাতি দুর্বল হয়ে থাকে, কাউকে কষ্ট দেয়ার শক্তি তারা রাখে না। অতএব অত্যাচার করার শক্তি না থাকার কারণে, স্বৈরাচারীর মত নির্দয়ভাবে ধৃত করার উপকরণের অভাবে এবং হত্যা ও রক্তপাতের অবকাশ না থাকার কারণে তারা রসূলদের প্রতি অত্যাচার করে না। খোদা জানেন যে তাদের অভ্যন্তরীণ

নোংরামী এবং দিবারাত্র ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তারা কাউকে কষ্ট দেয়া বা সংস্কারকের উপর অত্যাচার করার সাহস রাখে না এবং তিনি জানেন, তারা দুর্বল ও পরাজিত শক্তি। প্রায়শঃই এর কারণ হয়ে থাকে তাদের অর্ন্তদ্বন্দ্ব, যা তাদের শক্তিকে বিলুপ্ত করে। আর অনেক সময় অন্য জাতির আধিপত্য এর কারণ হয়ে থাকে। কোন কোন সময় এ দু'টো সমবেতভাবে জাতির ব্যর্থতা ও দুর্বলতার মাত্রা বৃদ্ধি করে থাকে। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, এসব জাতি রাজ-শাসক শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সভ্য হয়ে থাকে। তারা খোদার রসূলদের তবলীগের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে না, অত্যাচার করে না আর কষ্ট দেয় না বরং তাদের রাজত্ব শান্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। তারা পৃথিবীতে অন্যায় রক্ত ঝরিয়ে বেড়ায় না আর খোদার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে না এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের মত মিথ্যা প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করে না। বরং তারা ফন্দি আঁটে ও ষড়যন্ত্র করে। তারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে মানুষকে নিজ ধর্মের প্রতি আহ্বান করে। তারা আত্মাকে রোগাক্রান্ত করে তুলে কিন্তু দেহের ক্ষতি করে না বরং মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় রাখে।

এমন জাতির দৃষ্টান্ত যদি দেখতে চাও তাহলে হযরত ঈসার (আ.) যুগে তা খুঁজে পাবে। কেননা হযরত ঈসা (আ.) এমন এক জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন যারা তাঁর আগমনের পূর্বে সম্পূর্ণভাবে শতধা বিভক্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাদের রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নেতৃত্ব হারিয়ে গিয়েছিল। রোমান রাজত্ব তাদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতো না। তাই হযরত ঈসা (আ.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন কারণ দেখেননি। কারণ রসূলগণ মানুষকে নমনীয়তা, সহনশীলতা ও ভালোবাসার সাথে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। যারা তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় তাদের ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে এঁরা অর্থাৎ নবীরা অস্ত্রধারণ করেন না। তাঁরা যুক্তির মাধ্যমে রুগ্ন বিবেকের চিকিৎসা করেন আর তরবারীর প্রত্যুত্তর তরবারীর মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। তাঁরা প্রতিটি রোগ-ব্যাধির অবস্থানুযায়ী সমুচিত চিকিৎসা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র আর বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন। তারা কখনও সীমালঙ্ঘন করা পছন্দ করেন না।

ঠিক একইভাবে আমি শেষ যুগের মুজাদ্দিদ ও মুহাদ্দাস হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আমি দেখেছি, ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের সাথে ধর্মের নামে যুদ্ধ করে না। তারা নিজ ধর্ম প্রচারের জন্য তরবারী হাতে নেয় না, তীর তাক করে না বরং তারা ছল-চাতুরী, যুক্তি ও বিভ্রান্তিকর নোংরা পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে আপন ধর্ম

প্রচার করে। তারাও ষড়যন্ত্র করে আর খোদাও পরিকল্পনা করেন, আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী। আল্লাহ্‌র পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করা সম্ভব নয়। আর আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে এমন একটি জাতিকে হত্যা করতে পারেন যে জাতি বাহ্যিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে নামে না বরং তারা দার্শনিকের মত যুক্তি উপস্থাপন করতে বলে, অধিকন্তু জাতি হিসেবে তারা অনবহিত? তারা বহু দূর থেকে এসেছে যারা কুরআনের তত্ত্ব, আলো ও এর সূক্ষ্ম শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা ইসলামী দেশ থেকে দূরবর্তী দেশে লালিত-পালিত হয়েছে। আর যখন মুসলমানদের সাথে তারা মিলিত হলো আর আমাদের দেশে আসলো তখন মুসলমানদের তারা পাপাচারের বহুমুখী অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখতে পেল। এবং নানারূপ বিদা'তে লিপ্ত মুসলমানদের দেখে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। এরা খোদার বাণী সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তারা আমাদের কষ্ট দেয়নি, আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি আর দেশে রক্তপাত ঘটায়নি। আর আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম আচরণকে মন্দ আচরণ দিয়ে প্রতিহত করা এবং যে জাতি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে তাকে কষ্ট দেয়া এবং সর্বাঙ্গীন যুক্তি উপস্থাপন এবং যৌক্তিক প্রমাণ ও স্বর্গীয় নিদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাক করে দেয়ার পূর্বে এবং সত্য মিথ্যা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে যাবার পর তারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে- এ কথা প্রমাণিত হওয়ায় পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের তরবারী ধারণ কোন সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ তা মেনে নিতে পারে না। আমরা দয়া-মায়া, নমনীয়তা এবং সৌজন্যবোধ যদি পরিত্যাগ করি, আর তাদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী, খুনি এবং অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হই সেক্ষেত্রে এর তুলনায় বড় কোন পাপ আর নেই। আর এক্ষেত্রে আমরা সর্বনিকৃষ্ট অত্যাচারী সাব্যস্ত হবো।

এ কারণে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হযরত মসীহ্‌র আদলে প্রেরণ করেছেন। কেননা, তিনি আমার এ যুগকে তাঁর যুগের অনুরূপ দেখতে পেয়েছেন। আর একটি জাতিকে তাঁর জাতির অনুরূপ দেখতে পেয়েছেন। এবং পারস্পরিক এই সাদৃশ্যকে তিনি এক জুতোর সাথে আরেক জুতোর মত সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন। ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে এবং সেই জাতিকে সতর্ক করার জন্য যাদের পিতৃপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, আর অপরাধীদের অবস্থান সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। আপনি লক্ষ্য করছেন, অধিকাংশ মুসলমান তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। তারা নিজেদের রোযা ও নামাযকে হেলায় নষ্ট করে ফেলেছে। তাদের হৃদয় কঠোর আর স্বভাব বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের ভিতর ইসলামের নাম ছাড়া আর মসজিদে প্রবেশ করার

বাহ্যিক রীতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আন্তরিকতা কাকে বলে তা তারা জানে না। আর ইসলামী শিক্ষার স্বাদ এবং এর প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে তারা অনবহিত। তাদের অনেকেই ব্যভিচার করে, মদ পান করে এবং মিথ্যা কথা বলে আর জাগতিক সম্পদকে গভীরভাবে ভালোবাসে। এরা অপকর্ম করে ও আল্লাহ্‌র রসূল প্রদত্ত হেদায়াতের বিরুদ্ধে বিদা'তকে প্রাধান্য দেয়। সেক্ষেত্রে এমন কাফের যারা কিছুই জানে না, যারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না, যারা গভীর ঘুমে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় কথাবার্তা বলে, যারা ইসলামী পন্থা ও দলিল প্রমাণ সম্পর্কে অনবহিত- তাদের সীমাবদ্ধতা ও অপারগতা চিন্তা করে দেখা উচিত! এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল সাধারণ মানুষের হৃদয়ে যে বদ্ধমুল বিশ্বাস রয়েছে অর্থাৎ মসীহ্ এবং মাহদী উভয়ই শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করবে না তাকে হত্যা করবেন- এটি কেবল ভিত্তিহীনই নয় বরং স্পষ্ট ভ্রান্তি।

রহীম অর্থাৎ পরম দয়ালু ও কৃপালু খোদা এমন অনবহিত অবস্থায় মানুষকে ধৃত করবেন, তাদেরকে তরবারী বা ঐশী শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করবেন, অথচ ইসলামের স্বরূপ এবং ইসলামের সত্যতার প্রমাণ কী আর ধর্ম কাকে বলে তারা এখনও জানেই না-কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কি এমন মতামত দিতে পারে? এছাড়া করুণা ও দয়ার দাবী হলো, সেসব বিপদাপদ থেকে মানুষকে মুক্ত করা যা জাতিকে পরিবেষ্টন করে রাখে আর যার আধিক্য ছেয়ে যায়। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, কলম-সৃষ্ট বিশৃংখলার প্রত্যুত্তর তীর ও তরবারীর মাধ্যমে দেয়া কীভাবে বৈধ হতে পারে? বরং আমরা যে এদের যুক্তি খন্ডন করতে অপারগ, আর এদের বিভ্রান্তিকর যুক্তি-প্রমাণের যথাযথ উত্তর দিতে অক্ষম আর আমাদের কাছে ধারালো তরবারীর আঘাত হানা ও কাফিরকে হত্যা করা ছাড়া বিভ্রান্তিকর যুক্তি-প্রমাণ খন্ডনের কোন উপায় নেই- এই আচরণ যেন এরই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি হবে। অতএব একজন সন্দেহপ্রবণ, অনবহিত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির হৃদয় কি করে তরবারী, চাবুক, তীর ও বর্শার আঘাতে পরিতৃপ্ত হতে পারে? বরং এসব কাজ সন্দিহান লোকদের সন্দেহকে আরো বৃদ্ধি করবে।

জানা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ মানুষের ক্রোধের মত নয়। আল্লাহ্ কেবল এমন জাতিকে শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করেন যাদের সামনে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের কোন ত্রুটি করা হয়নি, যাদের সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে এবং সকল সংশয় দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যারা নিদর্শন দেখেছে। কিন্তু তাদের হৃদয় বিশ্বাস স্থাপন করা সত্ত্বেও যারা অস্বীকার করেছে। আর যারা জেনে-শুনে ভ্রষ্টতায় অনঢ় থাকে। আমাদের ভাইদের আচরণ দেখে আশ্চর্য হতে

হয়! তারা জানে, আল্লাহ্র শাস্তি কোন জাতির প্রতি সকল প্রকার যুক্তি-প্রমাণ স্পষ্ট না করে নামে না। তারপরও তারা এ ধরনের অপলাপ করে! দ্বিতীয় আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা মাহদীর অপেক্ষা করে অথচ তারা সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ এবং মুসতাদরেক হাকেমে, **“লা মাহদী ইল্লা ঈসা”** অর্থাৎ ঈসা ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নেই এ কথাটি পড়ে। তারা জানে, হাদীসের দুর্বলতার কারণে বুখারী ও মুসলিম এর উল্লেখ পর্যন্ত করেননি যার কথা তুমি শুনেছো। তারা জানে, মাহদীর আগমন সম্পর্কিত হাদীসগুলো দুর্বল ও দুর্বলতার দায়ে ক্ষত-বিক্ষত বরং কোন কোনটি মওযু অর্থাৎ মনগড়া। এগুলো দ্বারা কিছুই সাব্যস্ত হয় না। এরপরও তারা তাঁর আগমনের বিষয়ে হঠকারিতা দেখাচ্ছে যেন ভাবটি এমন তারা কিছুই জানে না।

মসীহ্র নাযিল হবার সংবাদ নিয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আসল কথা হলো, যে সব ভবিষ্যদ্বাণী ইহজগতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবার কথা, সেগুলোতে সব সময় পরীক্ষা নিহিত থাকে। এভাবে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এক দলকে পরীক্ষা এবং অপর দলকে মনোনীত করতে চান। যে কারণে এমন সব আগাম সংবাদে তিনি উপমা ও রূপকভাষা ব্যবহার করেন এবং এর মূল বিষয়বস্তুকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মই থাকতে দেন আর যারা রসূলদের মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং ত্বরাপ্রবণদের ন্যায় কুধারণা পোষণ করে তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ একে অপ্রকাশিত ও রহস্যাবৃত রেখে দেন। তুমি কি দেখ না, ইহুদীরা সেই সত্য রসূলকে প্রত্যাখ্যান করে কত দুর্ভাগ্যজনক কাজ করেছে, যিনি তাদের কিতাবে বর্ণিত শুভসংবাদ অনুসারে সূর্যের ন্যায় উদিত হয়েছেন? অথচ আল্লাহ্ চাইলে তওরাতে সে সবকিছু লিখে দিতে পারতেন যা তাদের সোজা পথে পরিচালিত করতো। তাদের খাতামুল আম্বিয়ার নাম, পিতার নাম, দেশের নাম, তাঁর আগমনের যুগ, তাঁর সাহাবীদের নাম এবং হিজরতের স্থানের কথা উল্লেখ করতে পারতেন আর স্পষ্টভাবে বলেও দিতে পারতেন, তিনি বনী ঈসমাইলের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু খোদা তা'লা তা করেননি। বরং তওরাতে লিখেছেন, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে এবং তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আসবেন। অতএব ইহুদীরা যে মতামতে উপনীত হয় তা হলো, শেষ যুগের নবী বনী ইস্রাঈল থেকে আসবেন। এই প্রচ্ছন্ন শব্দের কারণে তারা অনেক বড় পরীক্ষায় নিপতিত হলো। অতএব তারা ধ্বংস হয়ে গেছে যারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা করেনি আর ধরে নিয়েছে, তাদের স্বজাতি ও স্বদেশ থেকে নবী আসবেন। যার ফলে তারা খাতামান নবীঈন (সা.)-কে অস্বীকার করে বসেছে।

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, এই রীতিটিকে অন্যায়বশত করা হয়নি বরং খোদার

পুণ্যবান বান্দাদের প্রতি এটি তাঁর মহান অনুগ্রহরাজির অন্তর্গত। কেননা ভাবাদর্শগত সূক্ষ্ম সংবাদ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের সূক্ষ্ম পরীক্ষা নেয়া হয়। এরপর তারা বিবেক ও অর্ন্তদৃষ্টির সূক্ষ্মতার আলোয় সরল পথ চিনতে পারেন। যার ফলে তাদের প্রভুর কাছে তাদের পুরস্কার প্রাপ্তি সাব্যস্ত হয় আর খোদা তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করেন। তাদেরকে অন্যদের মাঝে স্বতন্ত্র পদমর্যাদা দান করেন আর তাদেরকে খোদাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন। যদি খবর সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট আলামতভিত্তিক হতো তাহলে ঈমানের গন্ডী থেকে তা বেরিয়ে যেতো। তাহলে যেভাবে বাধ্যগত মু'মিন ঈমান আনতো সেভাবে বিবাদী শত্রুও স্বীকার করতো আর ধরাপৃষ্ঠে একজনও অস্বীকারকারী থাকতো না। তুমি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছো বিভিন্ন রং ও বর্ণের মানুষ অগণিত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, রাত যে অন্ধকার আর দিন যে আলোকিত আর দুই-এর অর্ধেক যে এক এবং প্রত্যেক মানুষের যে একটি করে জিহ্বা, দু'টো করে কান, একটি নাক ও দু'টো করে চোখ আছে- এসব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ঈমানী বিষয়াদী বাহ্যিকভাবে জ্বাজ্জল্যমান ও প্রকাশিত করেননি, যদি তা করতেন তাহলে যাবতীয় পুণ্য নষ্ট আর কর্ম ব্যর্থ হয়ে যেতো। অতএব চিন্তা কর, খোদা তা'লা চিন্তাশীলদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। সত্য সন্ধানে যে জ্ঞানী ব্যক্তি পুণ্যের ভিত্তিতে চেষ্টা অব্যাহত রাখে খোদা তা'লা তার হৃদয়কে আলোকিত করেন এবং তাকে তাঁর সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং নিজ সন্নিধান থেকে তার অন্তরে সূক্ষ্মদৃষ্টি দান করেন। আর খোদা তা'লা পুণ্যবানদের প্রতিদানকে বৃথা যেতে দেন না। যারা আমাকে কাফির আখ্যা দিয়েছে, অভিশাপ দিয়েছে তারা সত্যিকার অর্থে খোদার কিতাব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেনি, বরং কুধারণা পোষণ করেছে। এমন কি তারা এ কথাটি ভেবেও দেখেনি, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে নিজের জন্য পাপ ও ভ্রষ্টতাকে অবলম্বন করে না আর খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে না, সে কীভাবে সেই পথ অবলম্বন করতে পারে যা সম্পর্কে সে জানে- এতে ধ্বংস নিহিত। ইহকালে ও পরকালে এটিকে ক্ষতিকর বিষয় জানা সত্ত্বেও কিসে তাকে এমন দুর্ভোগের মুখে উসকে দিল! আমার শত্রুদের অজানা নয়, আমি এমন এক ব্যক্তি যার সারাটা জীবন সত্য ধর্মের সমর্থনে কেটেছে। এখন আমি যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে পা দিয়েছি, আমার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে আর আমার এক পা কবরে। অতএব একজন বিবেকবান কীভাবে ধারণা করতে পারে, আমি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে কুফরী ও ধর্মদ্রোহিতাকে অবলম্বন করতে পারি? সুবহানাল্লাহ্! এ যে এক স্পষ্ট অনাচার! আমি এদের অপবাদ থেকে মুক্ত। আমি আমার বিশ্বাসে গভীর দৃষ্টিপাত

করেও এমন কোন বিষয়ের নামগন্ধও খুঁজে পাইনি। আমার এবং তাদের হৃদয়ের খবর আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি তাঁর প্রতি ভরসা রাখি। তাদের বুদ্ধিমানরা শুধু ইহজাগতিক আকর্ষণ ও সম্মানের মোহে আমার বিরোধিতায় তৎপর। খোদা তা'লা নিজ করুণায় যাকে রক্ষা করবেন সে ছাড়া বাকি সব আলেমের হৃদয়ে যে হিংসা রয়েছে তা দূর হতে পারে না। অধিকাংশ আলেমের অভ্যাস হলো, যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন কথা বলে- যা তাদের বোধ বুদ্ধির উর্ধ্বে, তারা তা নিয়ে চিন্তা করে না আর দাবীদারের কাছেও এর তত্ত্ব স্পষ্ট করার অনুরোধ করে না বরং শোনা মাত্রই ক্ষিপ্ত হয়। তাকে শুরুতেই কাফির আখ্যা দিয়ে বসে, অভিশাপ দেয়, তার সম্পর্কে অনেক অপলাপ করে এবং ক্রোধবশত তাকে হত্যা করার প্রয়াস চালায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ ۚ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ (সূরা ইয়াসিন : ৩১) যে সত্যকথা আল্লাহ্ তা'লা অবগত আছেন তা হলো, এ যুগের মুসলমানরা চড়ুই ছানার মত এমন অসহায় ছিল যারা আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় উপনীত হতে পারেনি। তারা নিজেদের বাসস্থান, আশ্রয়স্থল ও নীড় থেকে অসহায় অবস্থায় নিচে পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমার ডানার আশ্রয়ে সমবেত করে তাদেরকে ঈমান ও রহমান খোদার স্নেহের স্বাদ দেয়ার এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি বিবেকবান ও মুক্তির প্রত্যাশী তার উচিত আমার কাছে ছুটে আসা। আর যে খোদাকে ভয় করে এবং দুনিয়া ও জাগতিক সম্মানকে জলাঞ্জলি দেয়ার জন্য প্রস্তুত; পরকালের প্রত্যাশী, সকল অভিসম্পাত, শত্রুর আস্ফালন, প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছেদ ও গালমন্দকারীর গালি শুনতে প্রস্তুত শুধু সে-ই আমাকে গ্রহণ করতে পারে।

সাবধান বাণী

হে আমার ভাই! স্মরণ রাখবেন, খোদা নিজ সন্নিধান থেকে আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। যারা বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ.) সশরীরে আকাশে গিয়েছেন, আকাশ থেকে নাযিল হবেন এবং খোদার উক্তি- وَاِنۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهٖ قَبۡلَ مَوۡتِهٖ (সূরা নিসা : ১৬০) এর মাধ্যমে তাঁর জীবিত থাকার যুক্তি উপস্থাপন করতে চায়; খোদা তা'লা জানেন, তারা এ যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে নিপতিত। তারা কেবল একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে আছে এবং না জেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আবার কটু কথা ও ক্ষুরধার বক্তব্যের মাধ্যমে তারা সত্যানুসারীদের কষ্ট দেয়। তারা খোদাকে ভয় না করে মু'মিনকে কাফির আখ্যা দেয়। তাদের দৃষ্টান্ত সেই মানবগোষ্ঠির ন্যায় যারা

মু'মিনদের কষ্ট দেয়ার জন্য কুফরী ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ও মু'মিনদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি মসজিদ বানিয়েছিল।

আপনি জানেন, আমরা যদি ধরেও নেই, সকল ইহুদী হযরত ঈসার প্রতি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে- যেমনটি তারা এ আয়াতের আলোকে ধরে নিয়েছে, সেক্ষেত্রে এতে একেবারে অসম্ভব জিনিষ আবশ্যক প্রতীয়মান হবে। আর বনী ইস্রাঈল জাতির প্রত্যেকের জন্য হযরত ঈসার দ্বিতীয় অবতরণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আবশ্যক হবে। কেননা সকল ইহুদীর ঈমান আনার বিষয়টি শুধু হযরত ঈসার জীবদ্দশাতে পরিপূর্ণ হতে পারে না বরং এর পরিপূর্ণতার জন্য প্রথম যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বনী ইস্রাঈলের সকল কাফিরের জীবিত থাকা আবশ্যক। একই সাথে মসীহ্‌কেও কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আবশ্যকভাবে জীবিত থাকতে হবে । এটি সবার জানা বিষয়, অনেক ইহুদী মারা গেছে এবং কবরস্থ হয়েছে অথচ তারা ঈসার প্রতি ঈমান আনেনি। অতএব, সকল ইহুদী হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে একথা কীভাবে সঠিক হতে পারে। অতএব নিঃসন্দেহে এ অর্থটি স্পষ্টতই ভুল, প্রকাশ্য বিভ্রান্তিকর আর কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব তুমি চিন্তাশীল হয়ে থাকলে বিষয়টি ভেবে দেখ। পুনরায় যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি আর তাদের কথা, বিশ্বাস ও তাদের সর্বসম্মত মত নিয়ে ভাবি, মসীহ্‌র নাযিল হওয়ার যুগে সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তাদের কেউ এমন থাকবে না যে ইসলামকে অস্বীকার করবে আর ইসলাম ছাড়া বাকী সকল উম্মত ধ্বংস হবে! এমন বিশ্বাসকে আমরা কুরআনী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখতে পাই না বরং আমরা একে জগৎ প্রভুর ঘোষণা পরিপন্থী পাই। কুরআন স্পষ্টভাবে এ কথা শেখায় আর স্বরব কণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়ে বলে, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অস্তিত্ব কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন- فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (সূরা মায়েদা : ১৫) আর বলা বাহুল্য, শত্রুতা ও বিদ্বেষের উপস্থিতি শত্রুতাপোষণকারী ও বিদ্বেষপোষণকারীদের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে আর তাদের অস্তিত্ব ছাড়া এটি হতেই পারে না। তাই আমরা তাদের একথা ভালভাবে বলেছি আর একাধিকবার বুঝিয়েছি যেন তারা হিতোপদেশ গ্রহণ করে আর ভয় করে। অতএব সে সময় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে- একথা আমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি? আমরা কী সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতকে অস্বীকার করবো? অথচ আল্লাহ্ বলেন, وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (সূরা মায়েদা : ৬৫) এবং তিনি আরো বলেছেন,

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (সূরা আলে ইমরান : ৫৬)

এটি জানা কথা, কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদীদের পরাজিত শক্তি হিসেবে থাকতে হলে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব ও তাদের কুফরীর অস্তিত্ব আবশ্যক। আর বলা বাহুল্য, যে শিক্ষা কুরআন প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর বিরোধী সেটি স্পষ্ট মিথ্যা। আর সেটা সবচে' সত্যবাদী রসূলের হাদীসও হতে পারে না। বরং সকল সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো- যুক্তি ও প্রমাণের নিরিখে তাদের ধ্বংস হওয়া। এতে কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয় সে-ই ধ্বংস প্রাপ্ত। যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে সে নিশ্চিতভাবে তাকে ধ্বংস করে দেয়। অতএব বিচক্ষণদের মত করে ভাবো। জেনে রেখো, বিভিন্ন উম্মতের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাদীসটি সঠিক কিন্তু আলেমরা তা বুঝতে ভুল করেছে। বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের ধ্বংস হওয়া বলতে তারা যা বুঝেছে তা সঠিক নয় বরং সঠিক অর্থ তা-ই যার প্রতি কুরআন هُوَ الَّذِىٓ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰى وَدِيۡنِ الۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهٗ عَلَى الدِّيۡنِ كُلِّهٖ (সূরা আস সাফ : ১০) আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এই আয়াতে তিনি সকল মতবাদ ও ধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় লাভের ইঙ্গিত করেছেন। তুমি জানো, কোন ধর্মমত যখন স্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে পরাজিত ও পরাস্ত হয় তখন সেটা সেই ধর্মের অনুসারীদের জন্য এক ধরনের ধ্বংস। অতএব এ পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, আলেমরা আয়াত **'কাবলা মওতিহি'**-র যে অর্থ করেছে তা ভ্রান্ত। আর এখন তুমি নিশ্চয়ই খোদার বাণীর প্রকৃত মর্মার্থ বুঝে গেছো। এ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বুখারীতে যা বর্ণিত হয়েছে সেটাকে মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কোন বিষয় বলে মনে করো না। আমাদের কাছে খোদার কিতাব রয়েছে, তাই এর বাইরে হেদায়াত সন্ধান করতে যেও না। তাহলে তুমি কিন্তু ব্যর্থ হবে আর কখনও হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তফসীরে **মাযহরীর** প্রণেতা বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী একজন সাহাবী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই ব্যাখ্যায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। হাদীসে তাঁর শিক্ষার সমর্থনে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি এ আয়াতের যে অর্থ বুঝেছেন আমরা এরূপ অর্থ দেখতে পাই না। এটি যে স্পষ্ট সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক এতে কোন সন্দেহ নেই।

নবুওয়তের উজ্জ্বল প্রদীপ বা পবিত্র সুন্নত তাঁর কথার মূল উৎস বলে প্রমাণিত হয়নি বরং তা একটি অগভীর মতামত। তাঁর কোন কোন বিশ্লেষণাত্মক মতামতে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। যেভাবে সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখিত অপর একটি হাদীসে তাঁর এ ধরনের ক্রটি ধরা পড়ে । হাদীসটি হলো– তিনি বলেছেন, আমাকে আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বলেছেন– তিনি বলেন, আমাদেরকে

আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে মুআম্মর যোহরীর বরাতে বলেন আর যোহরী সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের পক্ষ থেকে আর তিনি আবু হুরায়রার পক্ষ হতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র ছাড়া যখনই কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করে সকলকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে আর সে কারণে সে কেঁদে উঠে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, তোমরা চাইলে **“ওয়া ইন্নী উইযুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতিহা মিনাশশাইত্বানির রাযিম”** পড়ে দেখতে পারো। এটি হলো আবু হুরায়রা (রা.)-এর ধারণা। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদার বাণীর অতল সমুদ্রের এক অঞ্জলি পরিমাণও পান করেছে সে স্পষ্টভাবে জানে- এই ধারণা ভ্রান্ত এবং সে জানে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এ মতামত ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করেছেন। তিনি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ প্রদত্ত সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেননি। তিনি কী জানেন না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নবী (সা.)-কে সবচেয়ে নিষ্পাপ সৃষ্টি করেছেন? আল্লামা যমাখশরী (রহ.) হাদীসের এ ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন আর এর সত্যতা সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। নিষ্পাপ হওয়ার বৈশিষ্ট্যে শুধু ইবনে মরিয়ম এবং তাঁর মাকে শয়তানের স্পর্শ থেকে মুক্ত হওয়ার বিশেষত্ব প্রদান আমাদের জন্য কীভাবে বৈধ হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (সূরা আল হিজর : ৪৩) এবং তিনি বলেছেন وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (সূরা মরীয়ম : ১৬) 'সালাম' শব্দের অর্থ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ ছাড়া আর কী হতে পারে? এবং তিনি বলেছেন,

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (সূরা আল হিজর : ৪১) তোমার বাছাইকৃত বান্দাদের ব্যতিরেকে আমি অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। ইবনে মরিয়ম ও তাঁর মা– বাক্যের যদি আমরা সাধারণ অর্থ না করি এবং আমরা যদি না বলি, ইবনে মরিয়ম এবং তাঁর মা বলতে এক্ষেত্রে প্রত্যেক এমন মুত্তাকী ও পবিত্রচেতা ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি তাঁদের গুণে গুণান্বিত, তাহলে এ হাদীস কখনও সঠিক বলে সাব্যস্ত হবে না। আল্লামা যমাখশরী (রহ.) এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এ ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করা যায় না, কেননা নবীরা রূপক ও উপমার ভাষায় কথা বলেন। এর দৃষ্টান্ত আমাদের নবী খাতামান নবীঈন (সা.)-এর উক্তিতে অনেক দেখা যায়। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো তাঁর উক্তি, “ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে নাযিল হবেন অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাঁর বৈশিষ্ট্য নিয়ে নাযিল হবেন এবং ঈসার পদমর্যাদাসহ আসবেন।” অধিকাংশ মানুষ এ দু'টো হাদীসের অর্থ বুঝে না। তারা বিশ্বাস করে, ঈসা যিনি বনী ইস্রাঈলী নবী ছিলেন তিনি আকাশ থেকে নাযিল হবেন; আর এটি একটি স্পষ্ট ভ্রান্তি।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর দ্বিতীয় ভুলের দৃষ্টান্তটি আয়াত ‘কাবলা মওতিহি’র সাথে সম্পর্ক রাখে- যা ওবাই বিন কাব এর ক্বেরাআতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ **‘ফি মওতেহিম’**। কেননা তিনি পড়তেন **‘ইম মিন আহলিল কিতাবে ইল্লা লা ইউমেনান্না বিহি কাবলা মওতিহিম’**। এ ক্বেরাআত থেকে প্রমাণিত হলো, ‘মওতিহি’ শব্দের সর্বনাম ঈসার সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় বরং আহলে কিতাবের দিকে ইঙ্গিত করে। অতএব সত্যান্বেষী জাতির জন্য ওবাই বিন কাবের ক্বেরাআতের পর আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি?

তবুও মুফাসসিরগণ ‘বিহি’ তে ‘হি’ সর্বনাম কোন দিকে ইশারা করে তা নিয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করেছেন। অনেকেই বলেন, **‘লা ইউমিনান্না বিহি’**-তে সর্বনাম আমাদের নবী (সা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে আর এটি বেশী গ্রহণযোগ্য অর্থ। অনেকেই বলেন, এই সর্বনাম কুরআনের দিকে ইঙ্গিত করে। আবার অনেকে বলেন, এটি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক রাখে। এ কথাও বলা হয়েছে, এটি হযরত ঈসার দিকে ইঙ্গিত করে। মূলতঃ শেষোক্ত উক্তিটি বড়ই দুর্বল উক্তি, ফলে কোন গবেষক এদিকে দৃষ্টি দেননি। অতএব আমাদের সকল বিরোধী শত্রুদের জন্য পরিতাপ! যারা কুরআন ও এর সুস্পষ্ট কথাকে পরিত্যাগ করেছে। তাদের হৃদয় এ বিষয়ে অন্ধকারে রয়েছে। তারা মুখে বলে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসরণ করি অথচ তারা অনুসরণকারী নয়। বরং তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এমন কথাকেও প্রত্যাখ্যান করে যা তাঁর বরাতে প্রমাণিত। তারা পবিত্র কথার পরিবর্তে নোংরা কথাকে গ্রহণ করে আর জেনে শুনে সত্য গোপন করে।

তাদের দৃষ্টান্ত সেই হিংস্র পশুর ন্যায় যে মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত এবং যে ফলফলাদি, অন্যান্য সুস্বাদু ও পরিষ্কার-পুষ্টিকর খাবার পছন্দ করে না। সে জঙ্গলে এর পিছনে ছুটে বেড়ায়, কবর খোঁড়ে এবং গাধা, কুকুর ও শূকরের মৃত দেহ সন্ধান করে। আর তা যদি পায় তাহলে সে মহা আনন্দিত হয় এবং পুরোমাত্রায় অহংকারী হয়ে উঠে, কেউ তাকে বিতাড়িত করতে চাইলেও সে মরিয়া হয়ে তাকে ছাড়তে চায় না। তারা কি জানে না, কুরআনে যে ‘তাওয়াফ্‌ফি’ শব্দ আছে তা আল্লাহ্ তা’লা সেসব মৃতদের জন্য ব্যবহার করেছেন যারা কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে অথবা পরে মারা গেছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রতিপালকের সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয় ? আজ পর্যন্ত আরবরা ‘তাওয়াফ্‌ফীর’ যে অর্থ করে অভ্যস্ত তা-কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়? কোন অজ্ঞ ও নিরক্ষর আরবকেও যদি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে **‘তুউফ্‌ফিয়া’** শব্দ বলা হয় তাহলে সে বুঝে যাবে ঐ ব্যক্তি মারা গেছে। অতএব চিন্তা কর, তুমি কি তাদের মাঝে এই

প্রবাদ প্রচলিত দেখতে পাও না? তারপরও দেখ, এরা কীভাবে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করেছে?

তাদের একাংশ বলে, **'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানী'** সত্য আর এতে কোন সন্দেহ নেই, এটি সুনিশ্চিতভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি মারা গেছেন, আমরা এতে বিশ্বাসী। আর তফসীরের বই এমন কথায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাকে মৃত ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং তাকে তিন দিন বা সাত ঘন্টা পর পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে, এরপর সশরীরে আকাশে তোলা হয়েছে, শেষ যুগে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে নাযিল হবেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করবেন আর মদীনার মাটিতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কবরে দাফন হবেন। সুতরাং তাদের বক্তব্যের সারকথা হলো, পুরো সৃষ্টি একবার মরবে কিন্তু মসীহ্ মরবেন দু'বার। অপরদিকে আমরা যদি আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে এ কথাকে কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী দেখতে পাই। তুমি কি লক্ষ্য করো না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্দেহমুক্ত গ্রন্থে একজন মু'মিনের একটি উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন? খোদা তা'লা তাকে জান্নাতে যে চিরস্থায়ী আবাস এবং সম্মানজনক ঘরে মৃত্যুর উর্ধ্বে রেখে স্থায়ী বসতি দান করেছেন সে কারণে সে সন্তুষ্ট।

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ○ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ○ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(সূরা আস সাফফাত : ৫৯-৬১)

হে আমার প্রিয়! চিন্তা কর, কত স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রথম মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মৃত্যু নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন আর পরজগতে আমাদের চিরস্থায়ী জীবনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন! অতএব তুমি অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আপনি জানেন **'আফামা নাহনু বেমাইয়েতিন'** বাক্যের 'হামযা' ইস্তেফহাম তকরীরির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা আশ্চর্য বোধক অর্থ দিয়ে থাকে। আর এখানে 'ফা' ব্যবহৃত হয়েছে তা আতফ্ আলাল মাহযুফ বা উহ্য বাক্যের সাথে সংযোজনের জন্য। অর্থাৎ আমরা কী চিরস্থায়ী! অর্থাৎ আমরা কী আমাদের আমল ও কাজের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে চিরস্থায়ী নেয়ামত ও জীবন লাভ করবো। আর আমরা কী মরবো না? আর মনে রেখ, এই আশ্চর্যবোধক প্রশ্নটি জান্নাতবাসীদের পক্ষ থেকে তোলা হবে, যখন তারা আল্লাহ্ তা'লার ঘোষণা শুনতে পাবে, كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (সূরা মুরসালাত : ৪৪)-তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন তৃপ্তি সহকারে পান কর ও খাও। 'হানিয়ান' এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত

হয়েছে, যখন জান্নাতবাসীরা খোদার বাণী শুনবেন তখন তারা বলবেন اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ○ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى (সূরা আস সাফফাত : ৫৯-৬০) আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, তাদের এ উক্তি আনন্দ ও উৎফুল্লতার বহিঃপ্রকাশ।

মোটকথা, এই আয়াত থেকে এটি প্রমাণিত হয়, এতে জান্নাতীদের স্থায়িত্ব ও চিরস্থায়ী জীবনের শুভসংবাদ দেয়া হচ্ছে আর এই শুভসংবাদও দেয়া হচ্ছে, প্রথম মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোন মৃত্যু হবে না। এটি এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ, খোদা তা'লা জান্নাতীদের জন্য দু'টো মৃত্যু রাখেননি বরং তাদের সেই মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনের শুভসংবাদ দিয়েছেন যা তিনি প্রত্যেক মানুষের জন্য অবধারিত করেছেন। এ আয়াতের শেষ প্রান্তে বলেন, اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (সূরা সাফফাত : ৬১) এতে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন, জীবনের স্থায়িত্ব, মৃত্যুর স্পর্শমুক্ত নিয়ামত ও আনন্দ-উল্লাসে জীবন যাপন এসবই মহান কৃপাবারির অন্তর্গত। যেখানে এটি নির্ধারিত হয়ে গেল সেখানে এটি কীভাবে ধারণা করা যেতে পারে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মত নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন নবী এ মহান কৃপাবারি থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেন? আর কীভাবে ধারণা করা যেতে পারে, খোদা তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন আর তাঁকে দুনিয়া ও এর কষ্ট-যাতনা, বিপদাপদ, সমস্যাবলী, কাঠিন্য ও তিক্ততার ভেতর ঠেলে দেবেন, এরপর তাঁকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু দেবেন? তিনি পবিত্র আর এটি তাঁর বিরুদ্ধে অনেক বড় একটি অপবাদ। সে যদি মু'মিন হয় তবে ভুল সম্পর্কে অবহিত হবার পর তার পক্ষে এমন কথা পুনরায় বলা সাজে না।

নবীরা যে রিসালতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরিত হন তা সম্পন্ন করা ছাড়া এ পৃথিবী থেকে পরকালে স্থানান্তরিত হন না। নবীর সত্তার সাথে যুগের প্রতিটি মুহূর্তের একটি সামঞ্জস্য থাকে আর সকল নবী প্রেরিত হন সে সামঞ্জস্যের নিরিখে। খোদার উক্তি وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (সূরা আহযাব : ৪১) সে দিকেই ইঙ্গিত করে। সকল আগত যুগ এবং এর অধিবাসীর চিকিৎসার সাথে আমাদের রসূল (সা.) এবং খোদার কিতাব কুরআনের যদি একটি আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য না থাকতো তাহলে এ মহা সম্মানিত নবী কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির সংশোধন ও তাদের স্থায়ী চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হতেন না। অতএব মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আমাদের আর কোন নবীর প্রয়োজন নেই। তাঁর আশিস সকল যুগকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে আর তাঁর কল্যাণধারা ওলী, কুতুব ও মুহাদ্দাসদের হৃদয়ে নাযিল হয় বরং তা পুরো সৃষ্টি জগতের প্রতি বর্ষিত হয়। তারা না জানলেও এসব কিছু তাঁর কল্যাণময় সত্তা থেকে উৎসারিত

হচ্ছে। সকল মানব মন্ডলীর উপর তাঁর মহান অনুগ্রহ রয়েছে।

এই উম্মী নবীর পক্ষ থেকে যাঁদের প্রতি অধিকহারে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে, তাঁদেরই একদল আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, এর সূক্ষ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভাবেন। আর এক শ্রেণী এমন যাঁদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সুমহান খোদার পক্ষ থেকে জ্ঞান অর্জন করা। এঁরাই হলেন প্রজ্ঞাবান মুহাদ্দাস এবং ঐশী প্রজ্ঞার ধারক ও বাহক। তাঁদের সকলেই এই কল্যাণময় উৎস থেকে পান করেন আর তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত এর কল্যাণেই লালিত পালিত হবেন। খোদা তা'লার নিজ উক্তি وَّاٰخَرِيۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا يَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ (সূরা জুমুআ : ৪) এদিকেই ইঙ্গিত করেছে অর্থাৎ নবী করীম (সা.) নিজ সাহাবীদের যেভাবে পবিত্র করেছেন সেভাবে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর উম্মতের অন্য একটি জামা'তকেও পবিত্র করবেন। সুতরাং এ সকল আয়াত সম্পর্কে চিন্তা কর আর সকল ত্বরাপ্রবণের অনিষ্ট থেকে খোদার আশ্রয় প্রার্থনা কর, তোমার দৃষ্টিতে সে যত সম্মানিতই হোক বা সে তোমার যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। তুমি পৃথিবীতে এমন কোন পুণ্যবান খুঁজে পাবে না যে হুযূর (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সুধা পান না করে পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রকাশিত হতে পারে। অতএব এই মহান নবীকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই, তিনি নবী বা রসূল যে-ই হোন না কেন। তোমার উচিত, যা বলা হলো তা গ্রহণ করা আর মানুষের বানানো কথাকে এড়িয়ে চলা। তোমার জেনে রাখা উচিত, তিনি খাতামুল আম্বীয়া। তাঁর মত প্রদীপ্ত সূর্যের পর শুধু অনুগমনকারী নক্ষত্রই উদিত হতে পারে যারা তাঁর আলো থেকে উপকৃত হবে। তিনিই জ্যোতির উৎস। অচিরেই অবিশ্বাসী জাতির আঙ্গিনা তাঁর জ্যোতিতে আলোকিত হতে যাচ্ছে।

আমরা পুনরায় আমাদের প্রথম কথার দিকে ফিরে গিয়ে বলতে চাই, আমরা এখন যে আয়াতের কথা বলেছি সেটির অর্থাৎ খোদার উক্তি **'ইল্লা মাওতাতানাল উলা'**র দিকে। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মানুষ যখন তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ করে তখন প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) এ শিক্ষার ভিত্তিতে যুক্তি প্রদান করেন। হযরত উমর বলেছিলেন, মহানবী (সা.) প্রকৃতপক্ষে ইন্তেকাল করেননি বরং তিনি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসবেন আর মুনাফিকদের নাক, হাত ও কান কাটবেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) এ কথাকে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে এমন কথা বলতে নিষেধ করেন। এরপর তিনি তাড়াতাড়ি হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহ পানে ছুটে যান এবং

হযরত মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন, যিনি বিছানায় মৃত অবস্থায় শায়িত ছিলেন। তিনি তাঁর মুখমন্ডল থেকে চাদর সরিয়ে চুমু খান এবং কাঁদেন, আর বলেন, আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র। আল্লাহ্ আপনার জন্য দু'টি মৃত্যু অবধারিত করেননি, আপনার জন্য কেবল প্রথম মৃত্যুটিই নির্ধারিত ছিল। আর এ উক্তির মাধ্যমে তিনি হযরত উমরের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর তাঁর এ কথার ভিত্তি ছিল খোদার উক্তি **'ইল্লা মাওতাতানাল উলা'** সম্বলিত আয়াত। কুরআনের গভীর সূক্ষ্মতত্ত্ব, প্রদত্ত ইঙ্গিতসমূহ, গোপন ভেদ ও তত্ত্বসমূহ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে হযরত আবু বকরের একটি অদ্ভুত স্বভাবজ সম্পৃক্ততা ও সংশ্লিষ্টতা ছিল। কুরআন থেকে সূক্ষ্মতত্ত্ব উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম দক্ষতা ছিল, যে কারণে তাঁর হৃদয় সত্যের পাণে পরিচালিত হয়েছিল এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবীতে ফিরে আসা দ্বিতীয় মৃত্যুর অপরিহার্যতা সাব্যস্ত করে অথচ এটি জান্নাতীদের সম্পর্কে খোদা তা'লার উক্তি - إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (সূরা সাফফাত : ৫৯-৬০) অনুসারে অসম্ভব। কেননা জান্নাতবাসীদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন, তাদের পুনরায় নানা ধরনের অচেতনতা, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া এক ধরনের আযাব বিশেষ। অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল প্রকার আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং পরকালের গৃহে স্থানান্তরিত হবার দিন থেকে তিনি তাদেরকে সকল প্রকার আনন্দ ও উৎফুল্লতার ভেতর নিজ সন্নিধানে আশ্রয় প্রদান করেছেন। অতএব বিভিন্ন প্রকার কষ্টের আবাসে দ্বিতীয়বার ফিরে আসা তাদের জন্য কি করে সম্ভব হতে পারে? জান্নাতীদের উক্তি وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (সূরা আশ শুআরা : ১৩৯)-এর অর্থ এটিই।

মোটকথা হলো, হযরত আবু বকর (রা.) এ আয়াতের মাধ্যমে হযরত উমর (রা.)-এর কথাকে খন্ডন করেছেন। এতটুকু করেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং তিনি মসজিদে যান আর তাঁর সাথে সাহাবীদের একটি বিরাট দলও ছিল। তিনি এসে মিম্বরে আরোহণ করেন আর রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবীদের মাঝে যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁদের সকলকে নিজের চতুর্পাশ্বে একত্র করেন। এরপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন এবং বলেন, হে মানব মন্ডলী! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। যে মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করতো তার জেনে রাখা উচিত, তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে সেক্ষেত্রে (সে জেনে নিক) আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, জীবনদাতা, তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না। এরপর তিনি وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ (সূরা আলে ইমরান : ১৪৫)

সব নবী যে মারা গেছেন এ কথার ভিত্তিতে এ আয়াতের আলোকে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথা শুনে তাঁদের কেউ তাঁর কথাকে খন্ডন করেননি। তাঁদের কেউ তাঁকে একথা বলেন নি, হে সুপুরুষ! তুমি মিথ্যা বলছো বা তুমি তোমার যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলছো, কিংবা ভুল করছো আর তুমি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারোনি।

তাঁদের হযরত ঈসা (আ.) আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন বিশ্বাস যদি থাকতো, তাহলে তাঁরা আবু বকর (রা.)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলতেন, এই আয়াত দ্বারা সকল নবীর মৃত্যুবরণ তুমি কী ভাবে বুঝলে? তুমি কি জানো না, ঈসা (আ.)-কে জীবিত আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে আর শেষ যুগে তিনি পুনরায় আসবেন? যেহেতু ঈসা (আ.) পৃথিবীতে আবার আসবেন আর তুমিও তা বিশ্বাস কর, তাই উমরের দাবী অনুসারে, আমাদের রসূল (সা.) আমাদের মাঝে ফিরে আসলে সমস্যা কোথায় আর অসুবিধাই বা কি? উমর হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর মুখ থেকে সদা সত্যই নিঃসৃত হয় আর সঠিক মতামত প্রদানে যাঁর এক বিরল অবস্থান রয়েছে এবং যাঁর চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআনের শিক্ষার সামঞ্জস্য দেখা যায়। একই সাথে তিনি ইলহামও লাভ করেছেন এবং খোদার সাথে বাক্যালাপেরও সৌভাগ্য পেয়েছেন। নিশ্চয় আমাদের নবী (সা.)-এর ইন্তেকাল মুসলমানদের জন্য এমন এক ভয়াবহ বিপদ ছিল যেরূপ বিপদে তারা আর কখনও নিপতিত হয়নি। তাই আমাদের নবী (সা.)-এর পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার ধ্যান-ধারণা তেমন বিস্ময়কর কিছু ছিল না বরং তাঁর প্রত্যাবর্তন বেশি যুক্তিযুক্ত, যথাযথ এবং মসীহ্‌র প্রত্যাবর্তনের চেয়ে বেশি কল্যাণকর ছিল। মুসলমানদের জন্য মসীহ্‌র যতটা প্রয়োজন, তার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর মত কল্যাণময় সত্তার প্রয়োজন অনেক বেশি ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হযরত সিদ্দীককে তাঁরা এমন কোন উত্তর দেননি বরং সবাই নিরব ছিলেন এবং নতি স্বীকার করে নিলেন। তাঁরা তাঁর কথার সত্যতা অস্বীকার করেননি বরং তাঁর কথা গ্রহণ করেন, অশ্রু বিসর্জন দেন এবং তাঁরা সমস্বরে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে উঠেন। তাঁরা সকল নবীর মৃত্যুর মত অমোঘ সত্য নিয়ে ভাবেন এবং নিশ্চিত হন, তাঁরা সকলেই ইন্তেকাল করেছেন, কেউ চিরঞ্জীব ছিলেন না।

অতএব যখন প্রমাণিত হলো, জান্নাতবাসী অর্থাৎ যারা সর্বাধিপতি ক্ষমতাধর খোদার সন্নিধানে আনন্দিত, উৎফুল্ল ও নিরাপদ রয়েছেন তাদের নিয়ামত ও আনন্দঘন পরিবেশ থেকে ফিরে আসা এবং তা থেকে বহিস্কৃত হওয়া আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিপন্থী। সুতরাং মসীহ্ এত মহান সফলতা থেকে বঞ্চিত থাকবেন

তা একজন বিবেকবান মু'মিন কীভাবে বৈধ জ্ঞান করতে পারে? প্রত্যেক ব্যক্তি একবার মৃত্যু বরণ করবে আর তিনি মারা যাবেন দু'বার– এটি কি কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী নয়? সুতরাং চিন্তা কর, আর খোদার কাছে চাও, তিনি তোমাকে চিন্তাশীলদের ন্যায় বোধ-বুদ্ধি দান করবেন। আরেক স্থলে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (সূরা : হিজর-৪৯) অন্যত্র বলেছেন,

فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ (সূরা : যুমার-৪৩) আরও বলেছেন,
وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (সূরা : আম্বিয়া-৯৬)। অতএব, হে আমার প্রিয়! একটু ভেবে দেখ, কয়েকটি দুর্বল ধারণা এবং মনগড়া বিকৃত, কথায় ভিত্তি করে আমরা এ সুস্পষ্ট সত্যকে কীভাবে পরিত্যাগ করতে পারি? সুতরাং চিন্তা কর আর খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

হয়তো তোমার মনে এ সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে, জান্নাতে প্রবেশ করার পর মৃতদের জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রত্যাবর্তনে সমস্যা কোথায়? অতএব জেনে রেখো, কুরআনের আয়াত অনুসারে মৃতরা জান্নাত বা জাহান্নাম বা এ দুইয়ের বাইরে থাকলেও, আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীতে ফিরে আসে না। আমরা এখনই তোমার সামনে কুরআনের فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ (সূরা যুমার : ৪৩) اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (সূরা আম্বিয়া : ৯৬) আয়াত পড়ে শুনিয়েছি। সন্দেহাতীতভাবে এ আয়াতগুলো এই সত্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে, যারা এ পৃথিবী থেকে চলে যায় তারা প্রকৃত অর্থে আর কখনও ফিরে আসে না। প্রকৃত অর্থে প্রত্যাবর্তন বলতে, আমি এ পৃথিবীতে তাদের সকল কামনা-বাসনা ও এর আনুষঙ্গিক দিক, ভাল বা মন্দকর্ম করার শক্তি ও ভালকর্মের জন্য পুরস্কার পাবার যোগ্যতা নিয়ে ফিরে আসা বুঝিয়েছি। একই সাথে প্রকৃত প্রত্যাবর্তন বলতে আমি মৃতের সেসব লোকদের সাথে পুনর্মিলনকে বুঝাচ্ছি যাদের ছেড়ে সে চলে গেছে, অর্থাৎ যারা এ পৃথিবীতেই রয়ে গেছে। যেমন, পিতা-পিতামহ, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনের মাঝে যারা এ পৃথিবীতেই জীবিত বিদ্যমান। এছাড়া তাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, নির্মিত বসতবাড়ী, কর্ষণকৃত কৃষিজমি এবং সঞ্চয়কৃত ধনভান্ডারও এর অন্তর্গত। অধিকন্তু পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে প্রত্যাবর্তনের অপর একটি দিক হলো, পৃথিবীতে তাদের সেভাবে জীবনযাপন করা, যেভাবে তারা পূর্বে বসবাস করতো। বিয়ের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বিয়ে করা। তারা যদি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনে তাহলে তাদের সেই ঈমান গৃহীত

হওয়া আর তারা পূর্বে যে কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। বরং পৃথিবীতে ফিরে এসে তাদের ঈমান আনা এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া এটা তাদের উপকার সাধন করবে। কিন্তু কুরআনে আমরা এসব প্রতিশ্রুতির কিছুই দেখতে পাই না আর এমন কোন সূরাও নেই যাতে এ বিষয়গুলো দেখতে পাবে বরং আমরা এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○ خَالِدِينَ فِيهَا

(সূরা বাকারা : ১৬২-১৬৩) ভেবে দেখ! কত স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদের চিরস্থায়ী অভিশাপ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন! সুতরাং তারা যদি পৃথিবীতে ফিরেও আসে এবং তাঁর কিতাব ও রসূলদের প্রতি ঈমানও আনে, তাদের ঈমান অগ্রাহ্য হওয়া অবধারিত, আর প্রতিশ্রুত অভিশাপ তাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন থাকা আবশ্যক কেননা এটিই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। তুমি জানো, এ বিষয়টি কুরআনের শিক্ষা পরিপন্থী, যা ব্যুৎপত্তি সম্পন্নদের কাছে অজানা নয়।

অতএব সত্যিকার প্রত্যাবর্তনের সাথে জড়িত উপরোল্লিখিত আবশ্যকীয় বিষয়াদি ছাড়া মৃতদের জীবিত হওয়া বা জীবিতদের এক নিমিষে মৃত্যুবরণ, অথবা কুরআনের বর্ণনানুসারে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের জীবন ফিরে পাওয়া ভিন্ন একটি বিষয় ও একটি ঐশী রহস্য বিশেষ। এতে সত্যিকারের জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত লক্ষণ পাওয়া যায় না বরং তা আল্লাহ্র এবং কোন কোন নবীর নিদর্শনাবলীরও অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ না জানলেও আমরা এতে ঈমান রাখি কিন্তু একে আমরা প্রকৃত জীবন বা মৃত্যু বলি না। ধরুন, এক ব্যক্তি সহস্র বছর মৃত থাকার পর এক নবীর নিদর্শনস্বরূপ জীবিত হয়েই তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করে, এর মাঝে সে আর বাড়ীতেও ফিরে যায় না, পরিবারের কাছেও ফিরে যায় না, এমন কি জাগতিক কামনা-বাসনা, ভোগ-বিলাস কিছুই তার ভাগ্যেও জোটে না। আর তার স্ত্রীকে ফেরত পাবার বা তার ধন সম্পত্তি বা তার অর্জিত সম্পদ অথবা অন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কিছুই তার আয়ত্তে আসে না। বরং কোন কিছু স্পর্শ না করেই, নিমিষেই সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এ ধরনের জীবন লাভ করাকে আমরা প্রকৃত ও সত্যিকারের জীবন লাভ বলতে পারি না। বরং আমরা এটিকে আল্লাহ্র একটি সুগভীর নিদর্শন বলবো আর আমরা এর প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভার আল্লাহ্র হাতে সঁপে থাকি।

নি:সন্দেহে মৃতদের জীবিত করা এবং তাদের পৃথিবীতে প্রেরণ, এটা শুধু ঐশী কিতাবকে বদলে দেয় না বরং এটাকে ত্রুটিপূর্ণও সাব্যস্ত করে। আর এ ক্ষেত্রে মানুষের ইহ ও পারলৌকিক বিষয়ে অনেক বিপত্তি ও বিপর্যয় দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাড়ায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় নৈরাজ্য দেখা দেবে ধর্মীয় বিষয়ে। ধরুন, এক মহিলার একজন পুরুষের সাথে বিয়ের পর স্বামী ইন্তেকাল করে, এরপর সে অপর একজনকে বিয়ে করে আর সেও মারা যায়, এরপর সে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে আর তারও মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ্ তাদের সকলকে একই সময়ে পুনরুজ্জীবিত করলেন। তার স্বামীরা প্রত্যেকে তাকে নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় আর প্রত্যেকে দাবী করে, সেই মহিলা তার স্ত্রী। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্‌র কিতাব, যার শিক্ষা পরিপূর্ণ, যার সীমা সুনির্ধারিত; তদনুসারে তাদের মধ্যে কার অধিকার সবচেয়ে বেশী হবে? বিচারক তাদের মাঝে কীভাবে মিমাংসা করবেন? আল্লাহ্‌র কিতাব তাদের সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও বাড়ি-ঘর সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত দেবে? মৃত অবস্থা থেকে যারা জীবিত হয়েছেন তাদেরকে কী উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তা ফেরৎ দেয়া হবে? অতএব তুমি আল্লাহ্ ও রসূল প্রদত্ত বিধান সর্ম্পকে জ্ঞান রাখলে সে অনুসারে উত্তর দিয়ে স্পষ্ট কথা বলো, প্রতিদান পাবে।

একইভাবে যে মৃত্যু দু' বা এক মুহূর্তের জন্য হয়ে থাকে আর যার পর মৃত পুনরায় জীবন ফিরে পায়, এমন মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নয় বরং তা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত বিষয়। যার প্রকৃত স্বরূপ কেবল তিনিই ভাল জানেন। আপনি অবগত আছেন, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে শুধু একবারই মৃতদের একত্র করার কথা বলেছেন আর তা কিয়ামত দিবসেই হবে। আর এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, কিয়ামতের পূর্বে মৃতরা ফিরে আসবে না। তিনি যা বলেছেন, আমরা তাতে ঈমান রাখি আর কুরআনকে যাবতীয় স্ববিরোধিতা এবং পরস্পর সংঘাতপূর্ণ বক্তব্য থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করি। আর আমরা فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ (সূরা যুমার : ৪৩) আয়াতেও বিশ্বাসী এবং مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (সূরা হিজর : ৪৯) আয়াতেও ঈমান রাখি।

জান্নাতীরা পরজগতে যাওয়ার পর থেকে কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত জান্নাত থেকে দূরে কোন স্থানে আবদ্ধ থাকবে আর শহীদ ছাড়া অন্য কেউ কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে না- এটি আমাদের বক্তব্য নয় আর হতেই পারে না। আমাদের মতে নবীরা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নবী ও সিদ্দীকদের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত জান্নাত থেকে দূরে রাখা হবে, আর তাঁরা এর গন্ধও

পাবেন না, অপরদিকে শহীদ তাৎক্ষণিকভাবে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে- যে মু'মিন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে সে কি কখনও এমন কথা ভাবতে পারে?

অতএব হে আমার ভাই! নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখো এ বিশ্বাসটি পরিত্যাজ্য, নৈরাজ্যকর এবং আপাদমস্তক শিষ্টাচার বিবর্জিত। 'জান্নাত আমার কবরের নীচে অবস্থিত'- তুমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই উক্তি পাঠ করনি? তিনি বলেছেন, মু'মিনের কবর হচ্ছে জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান। আল্লাহ্ তাঁর দ্ব্যর্থহীন গ্রন্থে বলেছেন, يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَٰدِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (সূরা আল ফজর : ২৮-৩১)

অন্যত্র বলেছেন قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ (সূরা ইয়াসিন : ২৭)। এক ব্যক্তি যে মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করেছে, আমাদের উপকারার্থে তার ঘটনা আল্লাহ্ বিবৃত করেছেন। পৃথিবীতে তার এক পাপাচারী সাথী ছিলো, যে মৃত্যুর পর আগুনে প্রবেশ করে। জান্নাতী ব্যক্তি– তার সঙ্গীর কথা জান্নাতবাসীদের কাছে উল্লেখ করে বলেন, قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (সূরা সাফফাত : ৫৫-৫৮)

আপনি এই বিবরণ ভালভাবে জানেন, মু'মিনরা যে মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, সেখান থেকে যে বহিস্কৃত হবেন না আর সেই সুখের আবাসে যে চিরকাল থাকবেন- এগুলো এ কথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। একইভাবে জাহান্নামীরা যে মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এই কথা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়। فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ (সূরা আস সাফফাত : ৫৬) আয়াত নিয়ে যারা চিন্তা করে তাদের কাছে এটি অস্পষ্ট নয়। একইভাবে আল্লাহ্ বলেছেন, مِّمَّا خَطِيٓـَٰٔتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا (সূরা নূহ্ : ২৬) তুমি যদি হাদীস থেকে কোন প্রমাণ চাও তাহলে মে'রাজের হাদীসগুলো লক্ষ্য কর, কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা.) মে'রাজের রাতে জাহান্নামও দেখেছেন আর জান্নাতও দেখেছেন। তিনি জান্নাতীদের দেখেছেন জান্নাতে আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে। এক শ্রেণীকে দেখেছেন, নিয়ামতের মাঝে আর অন্যদের দেখেছেন শাস্তিপ্রাপ্তদের মাঝে।

তুমি যদি বল, আল্লাহ্র কিতাব এবং সহীহ্ হাদীস এ কথার সাক্ষী, পুনরুত্থান সত্য আর কর্মের হিসাব-নিকাশও সত্য আর আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের যে প্রশ্ন করবেন তাও সত্য ও অবশ্যম্ভাবী- এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এসব

ঘটনার পরই হাশর অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও কর্মের ভালমন্দ বিশ্লেষণের পরই জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের নির্ধারিত স্থানে আর অগ্নিবাসীরা তাদের নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করবে। এ কথাই যদি সত্য হয় সেক্ষেত্রে মুসলমানদের সর্বজন বিদিত বিশ্বাস অনুযায়ী হাশর, হিসাব-নিকাশ বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া জান্নাতী ও জাহান্নামীরা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে কীভাবে প্রবেশ করতে পারে? আমরা বলবো, এসব আয়াতের যদি আমরা আক্ষরিক অর্থ করি তাহলে ঐশীগ্রন্থের সকল ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে আর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আয়াতের পারস্পরিক সামঞ্জস্য অবশিষ্ট থাকবে না। বরং এমন পরিস্থিতিতে আমাদের মানতে হবে, পবিত্র কুরআন স্ববিরোধ ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ, এর কিছু কিছু আয়াত অন্যান্য আয়াতের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তুমি কি সেসব আয়াত লক্ষ্য করনি যেগুলি সাব্যস্ত করে, জান্নাতীরা অবিলম্বে এবং তাৎক্ষণিকভাবে চিরস্থায়ী বাগানে আর জাহান্নামীরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করবে? তুমি জেনে রেখো, এ আয়াতগুলোতে কোন বিরোধ নেই। কর্মের হিসাব ও পরিমাপ (ওজন) এবং হাশর-নশরের অর্থ, জান্নাতীদের তাদের জান্নাত ও সম্মানের আসন থেকে বেরিয়ে আসা আর তাদের কাছ থেকে অগ্নিবাসীদের মত হিসাব নেয়া নয়। আর জাহান্নামীদের আযাব থেকে বের করার বা তাদেরকে জান্নাতীদের মত করে গণ্য করাও নয়। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন এবং মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি তাদের ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে অবহিত। আর তাঁর জ্ঞান অদৃশ্যকে আয়ত্ত্ব করতে অপারগ নয় বরং হিসাব-নিকাশ ও কর্মের পরিমাপ করার উদ্দেশ্য হলো, সম্মানিতদের সম্মান ও পাপাচারীদের দুষ্কর্ম প্রকাশ করা। এতে কোন সন্দেহ নেই, পুণ্যবান ও পাপাচারীরা মৃত্যুর পরপরই কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে। তারা যেখানেই থাকুক না কেন জান্নাত বা দোযখ তাদের সাথেই থাকবে আর এক মুহূর্তের জন্যও তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি কি লক্ষ্য করনি, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কবর জান্নাতের কাননগুলোর একটি হবে বা অগ্নিগহ্বরগুলোর একটি গহ্বর হবে? লাশ কখনও কবরস্থ করা হয় আবার কখনও পুড়িয়ে ফেলা হয় কখনও বা একে নেকড়ে খেয়ে ফেলে আর কখনও পানিতে এর সলিল সমাধি হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জান্নাতের বাগান বা জাহান্নামের গহ্বর তার কাছ থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রমাণিত হলো, সকল মু'মিন ও কাফিরকে মৃত্যুর পর একটি দেহ প্রদান করা হয়। তার জান্নাত বা জাহান্নাম তার কবরেই রাখা হয়। আর কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি নতুনভাবে উত্থিত হবে এবং তাদেরকে কর্মের হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত

করা হবে। তাদের জান্নাত-জাহান্নাম এবং তাদের জ্যোতি বা মলিনতা সাথেই থাকবে। কর্মের হিসাব-নিকাশ, সম্মান বা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জেরা বা কর্মের পরিমাপ ও অন্যান্য যেসব বিষয়ের প্রতি আমরা ঈমান রাখি, এর সবকিছু প্রকাশিত হবার পর খোদার দয়া ও ক্রোধ নতুন আঙ্গিকে বিকশিত হবে। জান্নাতবাসীদের সামনে আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতকে এমন এক রূপে প্রকাশ করবেন, যা পূর্বে তাদের চোখ কখনও দেখেনি; ঠিক যেভাবে তিনি স্বীয় গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফলে এ দিনটি তাদের জন্য এক মহা আনন্দের ও সৌভাগ্যের দিন হবে। তারা আনন্দিত অবস্থায় নিরাপদে সেখানে প্রবেশ করবে।

একইভাবে জাহান্নামও এর অধিবাসীদের নিকট প্রকাশিত হবে। তিনি তাদের তা এমনভাবে দেখাবেন যার নিছক দর্শনই তাদেকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করবে। তারা এর তীব্র রোষ, গর্জন, ফোঁপানি ও বিকট শব্দ শুনবে এবং ভাববে, তারা এমনটি পূর্বে কখনও দেখেনি আর এতে প্রবেশও করেনি। এ দিনটি তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ভীতিপূর্ণ দিন হবে। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত, রহস্যাবলী ও প্রজ্ঞা প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। সুতরাং তুমি খোদার বিভিন্ন ধরনের বিকাশ দেখে আশ্চর্য হয়ো না। আল্লাহ্‌কে ডাকো, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের পথ সম্পর্কে অবহিত করবেন। এ সবকিছু খোদার বাণীতে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা একটি অক্ষরও নিজের পক্ষ থেকে লিখিনি। আমরা কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং কোনরূপ রটনাও করিনি। যে ব্যক্তি কুরআনকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে সে ধ্বংস হয় ও ধ্বংস করে এবং যে একে বাদ দিয়ে অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে সে ধ্বংস হবে, ঐশী ক্রোধ তাকে গ্রাস করবে। অতএব আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর, একে পরিত্যাগ করে অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট হয়ো না, নতুবা পথ হারাবে। আমরা যদি মু'মিন হই তাহলে আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ স্বয়ং নিজ গ্রন্থের যে প্রশংসা করেছেন তা তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। তিনি বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ (সূরা আনআম : ৩৯) وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ (সূরা ইউসুফ : ১১২) আর এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফের হাদীসে যায়েদ ইবনে আরকম (রা.)-এর পক্ষ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, একদিন মহানবী (সা.) মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী

খুম্ম নামক ঝর্ণার কাছে আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করে বক্তব্য রাখেন ও বিভিন্ন হিতোপদেশ দেন। এরপর বলেন, হে মানবমন্ডলী! শোন, আমি একজন মানুষ, আমার কাছে আমার প্রভুর দূত আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত। তোমাদের মাঝে আমি দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি **আল্লাহ্‌র কিতাব**, যাতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। অতএব আল্লাহ্‌র কিতাবকে অবলম্বন কর আর একে আঁকড়ে ধর। তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। তারপর বলেন, আমার **'আহলে বায়ত'** (পরিবার-পরিজন) সম্পর্কে সতর্ক থেকো। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়ত সম্পর্কে খোদার দোহাই দিয়ে নসিহত করছি আর আল্লাহ্‌র কিতাব যা তাঁর রজ্জু তা সম্পর্কেও সদুপদেশ দিচ্ছি। যে এর অনুসরণ করবে সে হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর যে একে পরিত্যাগ করবে সে ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে। দেখ! তিনি কত সুন্দরভাবে মানুষকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন আর এমন ব্যক্তিকে সতর্ক করেছেন যে একে অবজ্ঞাবশতঃ পরিত্যাগ করে এর স্থলে এমন ব্যক্তিকে অবলম্বন করে যে একে অবজ্ঞা করে। অতএব জেনে রেখো, কুরআন হলো পথপ্রদর্শক এবং উজ্জ্বল আলো আর তা সত্যের পানে পথ নির্দেশ করে আর এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণকৃত।

যারা হাদীসকে আল্লাহ্‌র কিতাবের তুলনায় প্রাধান্য দেয়, তারা খোদার কিতাবের মাহাত্ম্যকে ভুলে যায় আর খুব কমই এর অনুসরণ করে। তারা হাদীসকে আল্লাহ্‌র কিতাবের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা দিতে চায়। তারা খোদাকে ভয় করে না, তাঁর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না আর তাক্বওয়াও অবলম্বন করে না। তাদের পিতৃপুরুষ উদাসীন ও বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে এ পথেই প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছি। তাদের মাঝে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ও প্রতারকরা খোদার দৃষ্টির অগোচরে নয়। তারা মূর্খ ও উদাসীনদের বলে, আমাদের কাছে এসো– নিশ্চয় আমরা হেদায়তপ্রাপ্ত। অথচ নিশ্চয় এরা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। তারা কি হাদীসের বর্ণনাসমূহকে আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত বৃত্তান্তের সমকক্ষ বলে মনে করে? খোদার দৃষ্টিতে এ দু'টো কখনই সমান নয়। তারা যদি মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে খোদা এবং তাঁর আয়াতকে বাদ দিয়ে কোন্ কথায় ঈমান আনে? তারা কি মনে করে, তাদের প্রভু তাদের প্রতি হাদীসের কারণেই সন্তুষ্ট থাকবেন আর তারা আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে জিজ্ঞাসিত হবে না? কখনও না! বরং তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে।

এ বিষয়ে আমি আমার যাবতীয় বইপত্রে অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছি। যখন তারা দেখলো, এ কথাগুলো সত্য– তখন নিজেদের অনুশোচনা গোপন রাখলো আর তারা নিজেদের অবস্থান থেকে নড়েনি আর তারা প্রত্যাবর্তন করার পাত্রও নয়। হে প্রিয়ভাজন! জেনে রেখো, মুক্তির মূলমন্ত্র হলো, কুরআনী শিক্ষা। কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ কুরআন জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবিষ্ট না করবে সে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। খোদার কিতাব যাকে আগুনে আবদ্ধ করে রাখবে সে ব্যতীত অন্য কেউ আগুনে থাকবে না। অতএব সেই গ্রন্থকে আঁকড়ে ধর রাখ যাতে তোমাদের মুক্তি নিহিত এবং খোদার সমীপে সদা আনুগত্যকারী হিসেবে নিবেদিত থাকো। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর তাকিদপূর্ণ অন্তিম নির্দেশনায় বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্‌র কিতাবকে আঁকড়ে ধর এবং একে অবলম্বন কর। এটি সেই গ্রন্থ যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের রসূলকে হেদায়াত দিয়েছেন, তাই একে আঁকড়ে ধর– তাহলে তোমরা পথ পেয়ে যাবে। আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব ছাড়া অন্য কিছু নেই। অতএব আল্লাহ্‌র কিতাবকে আঁকড়ে ধর, আর তোমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। এমন কোন শর্ত যা আল্লাহ্‌র কিতাব নির্ধারণ করেনি তা মিথ্যা। খোদার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। বুখারী ও মুসলিম শরীফে লক্ষ্য করে দেখ, এসব হাদীসের সবকটি এ দু'টিতে বিদ্যমান। তলভীর লেখক বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে যদি বিরোধ থাকে তাহলে খবরে ওয়াহেদ(যে হাদীস শুধু একজন বর্ণনাকারী পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে) পরিত্যাজ্য। আর সত্যের অনুসারীরা এ বিষয়ে একমত, খোদার কিতাবই সব কিছুর তুলনায় অগ্রগণ্য, কেননা এটি এমন একটি গ্রন্থ যার আয়াতগুলোকে সুদৃঢ় করা হয়েছে, এর অগ্র বা পশ্চাত- কোন দিক থেকেই এতে মিথ্যা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। খোদা এটিকে সুরক্ষিত ও অপরিবর্তিত রেখেছেন। মানুষ এতে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। আর মানুষের কোন বাণী বা বক্তব্যও এতে মিশ্রিত হতে পারেনি।

আমাদেরকে এখন আমাদের প্রথম কথায় ফিরে যেতে হবে। তা হলো, কুরআন যেভাবে জান্নাতীদের পৃথিবীতে আগমনকে নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছে একইভাবে দোযখীদেরও পৃথিবীতে আগমন অসম্ভব আখ্যা দিয়েছে। কুরআন বলে, وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (সূরা বাকারা : ১৬৮)

একই ভাবে, অন্যত্র বলেছেন, لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا (সূরা কাহাফ : ১০৯) পুনরায় অপর এক স্থানে বলেছেন, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا (সূরা মায়েদা : ৩৮) পুনরায় আর এক জায়গায় বলেন, فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ (সূরা ইয়াসিন : ৫১) আপনি অবগত হয়েছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা মৃত্যুর অনতিপর তাদের স্ব-স্ব নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করবে, তাদের কিয়ামত দিবসের অপেক্ষা করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে মারা গেছে তার কিয়ামত সংগঠিত হয়ে গেছে। মৃত ব্যক্তি শাস্তি ও পুরস্কার যদি মৃত্যুর পর-পরই না পেতো তাহলে তার ক্ষেত্রে কিয়ামতের অর্থ কি? আমরা যেক্ষেত্রে স্বীকার করলাম, মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বেই পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। তাই আমাদের জন্য এ কথা মানা আবশ্যক হয়ে গেলো, জান্নাত এবং জাহান্নামের শাস্তি ও পুরস্কার তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পাবে। সে কারণে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কবরে মু'মিনদের ন্যূনতম পুরস্কার হলো, জান্নাতকে তাদের নিকটতর করে দেয়া এবং জান্নাতের প্রকোষ্ঠগুলোর একটি খুলে দেয়া। ফলে তাদের কাছে এই প্রকোষ্ঠ থেকে সর্বদা জান্নাতের সৌরভ ও সুবাস আসতে থাকবে। পক্ষান্তরে কবরে কাফিরের নূন্যতম শাস্তি হলো, তার জন্য জাহান্নামকে প্রকাশ করা এবং এর একটি গহ্বর উম্মোচিত করা, যার ফলে সে প্রতিনিয়ত সেই কুন্ড হতে প্রজ্জ্বলিত আগুনের উত্তাপ পেতে থাকবে। মু'মিন পৃথিবীতে যেসব পুণ্যকর্ম ও পুণ্যকর্মের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করে এসেছে সে কারণে বা তার সন্তান-সন্ততি ও পুণ্যবান ভাইবোনের দোয়ায় আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায়, তাঁর অপার দয়ায় মু'মিনদের জন্য জান্নাতের কক্ষকে সুপ্রশস্ত করবেন। আর সে কক্ষ দিন দিন সম্প্রসারিত হবে যার ফলে মু'মিনের কবর জান্নাতের একটি নন্দন কাননে রূপান্তরিত হবে। অতএব এ সকল হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও, কত সুন্দরভাবে আল্লাহ্র রসূল (সা.) বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন! এরপর তাদের কথা ভেবে দেখ, যারা নিজ ভাইদের উদ্দেশ্যে করে বলে, আমরা কুরআন শরীফ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসের প্রতি ঠিকই ঈমান রাখি কিন্তু একই সাথে হঠকারীতামূলকভাবে বলে, জান্নাতে প্রবেশ শুধু শহীদদের বিশেষত্ব আর এদের বাদ দিয়ে অন্য যাঁরা অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক এমনকি হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত বাকী সবাই জান্নাত থেকে দূরে থাকবেন, তাঁদের কাছে এর সুগন্ধ ও সৌরভও এসে পৌঁছবে না! তাঁরা কিয়ামতের পূর্বে সেখানে প্রবেশ করবেন না! সুতরাং বড়ই আক্ষেপ তাদের জন্য এবং তাদের কথাবার্তার জন্য! তারা খোদাকে ভয় করে না আর শহীদদেরকে খাতামান নবীঈনের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দেয়। এছাড়া এ কথাও তোমার অজানা নয়,

মৃত্যুর পর মৃতদের অবরুদ্ধ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয় না বরং তারা হয় নিয়ামতের মধ্যে থাকে, নতুবা শাস্তিতে পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকে। এটিইতো জান্নাত ও অগ্নি। অতএব চিন্তাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হও।*

*** টিকা**

জেনে রেখো, সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট আয়াতের ভিত্তিতে হযরত ঈসা (আ:)-এর মৃত্যু প্রমাণিত। যদি তুমি কুরআন ** থেকে প্রমাণ চাও তাহলে এতে একাধারে

***** পাদ টিকা***

আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উক্তি দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি তোমার কাছে তখন প্রমাণিত হবে যখন তুমি বুখারী শরীফে বর্ণিত সেই হাদীসটির বিষয়ে চিন্তা করবে যা ***'ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানি'*** *আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুত তফসীরে এই হাদীসটি এজন্য উল্লেখ করেছেন যেন তিনি মহানবী (সা.)-এর মুখনি:সৃত বাণী* ***'ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানী'*** *ঈসা (আ.)-এর মতই নিজের জন্য প্রয়োগ দেখিয়ে আয়াতটির তফসীর উপস্থাপন করেন। এ কারণেই ইমাম বুখারী তাঁর এই তফসীরের সমর্থনে ইবনে আব্বাসের উক্তি* ***'মুতাওয়াফফিকা এ্যায় মুমিতুকা'*** *উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী উল্লেখিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁর নিজের অবস্থান কি ছিল তা-ও স্পষ্ট করেছেন। সারকথা হলো, 'তাওয়াফ্ফী' এমন কোন শব্দ নয় যার তফসীর কেউ নিজ ইচ্ছেমতো করতে পারে বরং এর সর্ব প্রধান ব্যাখ্যাকারী হলো স্বয়ং কুরআন যা এই শব্দটি প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যু ও রূহ কবজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বিতীয় মুফাস্সের হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আর তৃতীয় মুফাস্সের হলেন হযরত আবু বকর (রা.), চতুর্থ মুফাস্সের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), পঞ্চম মুফাস্সের তাবেঈনদের একটি জামাত, ষষ্ঠ মুফাস্সের ইমাম বুখারী, সপ্তম মুফাস্সের হলেন মুহাদ্দেসদের ইমাম ইবনে কাইয়েম। বরং তিনি তাঁর রচিত* ***'মাদারেজুস্ সালেকিন'*** *এ লিখেছেন, মূসা ও ঈসা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁদের পক্ষে আমাদের নবী (সা.)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না, তিনি মহানবী (সা.)-এর হাদীসের প্রতি ইশারা করেছেন। আর অষ্টম মুফাস্সের হলেন স্বীয় যুগের মুহাদ্দিস হযরত ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী। তিনি তার বই* ***'ফওজুল কবীর'-এ 'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফীকার'*** *তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, মুতাওয়াফ্ফীকার অর্থ হলো:* ***'মুমিতুকা'*** *(অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো)। এ ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের একটি বিরাট শ্রেণী এ অর্থের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে একমত, এ আয়াতে* ***'তাওয়াফ্ফীর'*** *অর্থ মৃত্যু বৈ অন্য কিছু নয়। এ সত্ত্বেও যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা খোদার উক্তি, তাঁর রসূলের তফসীর বা তাঁর সাহাবাদের তফসীর বা তাবেঈনদের উক্তি এবং ইমাম ও মুহাদ্দিসদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অতএব তাদের কৃত সেই অর্থ যার সম্বন্ধে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থন নেই, রসূলের ব্যাখ্যার কোন সমর্থন নেই তা কীভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি তা আমাদের বোধগম্য নয়। যে সত্য উদ্ভাসিত ও পরিস্ফুটিত তা বাদ দিয়ে আমরা যাব কোথায়? ভ্রষ্ট জাতির কথা মেনে আমরা কি খোদা ও তাঁর রসূলকে পরিত্যাগ করতে পারি?* *(লেখকের পক্ষ থেকে)*

কুরআনের আয়াত থেকে আমরা হযরত মসীহ্র মৃত্যু এবং সশরীরে আকাশে আরোহণের বিরুদ্ধে ও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পরিপন্থী এই

(চলমান টিকা)

يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ (সূরা আলে ইমরান : ৫৬) فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ (সূরা মায়েদা : ১১৮) আর রয়েছে, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ এবং আয়াতটি كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ (সূরা মায়েদা : ৭৬) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (সূরা ইমরান : ১৪৫) এছাড়াও রয়েছে আয়াত- فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ (সূরা আ'রাফ : ২৬)। শেষোক্ত আয়াতটির প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কেউ কেবল খালি জড় দেহ নিয়ে আকাশে আরোহণ করে না। কেননা **'ফীহা'** শব্দ **'তাহ্ইয়াউনা'** শব্দের পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যা পৃথিবীর সাথে জীবনের সম্পর্ককে আবশ্যক আখ্যা দেয় এবং জীবনকে পৃথিবীর সাথে একইসূত্রে গেঁথে ও বেঁধে দিয়েছে। এতে সে সকল লোকদের কথার খন্ডন নিহিত আছে যারা বলে, কারো কেবল জড় দেহসহ আকাশে আরোহণ করা এবং যতদিন খোদা চান, ততদিন জীবিত থাকা অবৈধ হবে কেন? এদের কথায় আশ্চর্য হতে হয়, এরা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে আর মনে করে, আমরা নাকি মসীহ্র সশরীরে আকাশে যাবার ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট শিক্ষামালাকে পরিত্যাগ করেছি। অতএব বুদ্ধিমানকে এ স্থলে চিন্তা করে দেখা উচিত, এই বিশ্বাস পোষণ করে আমরা কি কুরআনকে পরিত্যাগ করলাম নাকি তারা কুরআন পরিত্যাগ করলো?

তারা বলে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (সূরা নিসা : ১৫৯) এবং فِيْهَا تَحْيَوْنَ (সূরা আরাফ : ২৬)। এ আয়াতের ভিত্তিতে তারা মসীহ্র সশরীরে আকাশে যাবার পক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকে। তারা চিন্তা করে না, বিষয়টি যদি এমন হয়– তাহলে দু'টো আয়াতের মাঝে অর্থাৎ **'বার রাফাআহুল্লাহু ইলাইহে'** এবং **'ফীহা তাহ্ইয়াউনা'**র মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হবে। আর তুমি জানো, কুরআনের শিক্ষা ও বিষয়বস্তু সর্বপ্রকার স্ববিরোধ মুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (সূরা নিসা : ৮৩) এ আয়াতে নির্দেশনা রয়েছে, কুরআনে স্ববিরোধ থাকতে পারে না, এটি খোদার কিতাব। এর অবস্থান ও মর্যাদা স্ববিরোধের অনেক উর্ধ্বে। অতএব যখন এ কথা প্রমাণিত হলো, আল্লাহ্র কিতাব স্ববিরোধের ঊর্ধ্বে, সেখানে এর তফসীর করতে গিয়ে আমাদের এমন পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক যার ফলে স্ববিরোধ ও বিষয়গত সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। তার দেহ উত্থিত হওয়া বা না হওয়া নিয়ে ইহুদীদের কোন মাথাব্যথা বা বিতর্ক ছিল না। অতএব আয়াত **'বার রাফাআহুল্লাহু ইলাইহে'**তে যে **রাফা'** শব্দ আছে, আয়াতের অর্থানুসারে আমাদের আধ্যাত্মিক **রাফা'** অর্থ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। যেমন কুরআন শরীফের **'ইরজেয়ী ইলা রাব্বেকে রাযিয়াতান মারযিয়্যাহ'** আয়াতে বলা হয়েছে। খোদার দিকে

প্রমাণ উপস্থাপন করেছি।★★ আর রইল মহানবী (সা.)-এর হাদীস প্রসঙ্গ, এক্ষেত্রে

(চলমান টিকা)

'সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাওয়া' এবং **"রাফা' ইলাল্লাহ্"** একই বিষয়, এ

★★টিকা

এক শ্রেণীর মানুষ যাদের কোন জ্ঞান নেই তারা বলে, মসীহ্ যে সশরীরে জীবিত আকাশে উত্থিত হয়েছেন তার প্রমাণ হলো وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ এবং আয়াত بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (সূরা নেসা : ১৫৮-৫৯) এই হলো নিছক তার উক্তি ও যুক্তি কিন্তু এই ব্যক্তি যদি এ আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানতো তাহলে নিজের উক্তি প্রত্যাহার করতো আর যুক্তি ও প্রমাণ বিরোধী কথার প্রতি দৃষ্টিই দিতো না। বৃথা কথা বলতো না বরং অনুতপ্ত হতো।

হে প্রিয়ভাজন! শোন, ইহুদীরা তৌরাতের শিক্ষানুযায়ী বংশপরাম্পরায় ভালভাবে জেনে এসেছে নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার নিহত হয় আর যে ক্রুশে মারা যায় সে অভিশপ্ত এবং আল্লাহ্র দিকে তার রাফা' হয় না। এ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো বদ্ধমূল। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ তাদের জন্য বিষয়টি এমনভাবে ঘোলাটে হয়ে যায় যেন তারা মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে সত্যিই ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল! তারা ধরে নিয়েছে, তিনি এমনভাবে অভিশপ্ত যার রাফা' হয়নি। আর তাদের অঙ্কিত ঘটনার চিত্রটি নিম্নরূপ: মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরেছেন আর ক্রুশে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তি অভিশপ্ত, তার রাফা' হয় না। তাই তাদের কাছে প্রথম চিত্র থেকে ফলাফলের দিক থেকে যা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো, হযরত ঈসা (আ.) নাউযুবিল্লাহ্ অভিশপ্ত, তাঁর রাফা' হয়নি (নাউযুবিল্লাহ্)। সুতরাং খোদা তা'লা তাদের এই সন্দেহ নিরসন করে হযরত ঈসা (আ.)-কে এই অপবাদ থেকে নির্দোষ প্রমাণ করার ইচ্ছা করেছেন– এ কারণে তিনি বলেছেন, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ...... بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (সূরা নিসা : ১৫৯-৬০) তাই সারকথা হলো, তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং এর ফলশ্রুতিতে অভিশপ্ত হওয়া এবং তাঁর রাফা' লাভ না করা- হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থান ও মর্যাদা এসব কিছুর উর্ধ্বে। বরং তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি অভিশপ্ত ছিলেন না বরং নৈকট্য প্রাপ্তরা যেভাবে উন্নীত হন সেভাবে তিনি খোদার দিকে উন্নীত হয়েছেন। এটিই সেই কারণ, যে জন্য আল্লাহ্ ঈসা (আ.)-এর ক্রুশে নিহত না হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন আর তাদের আরোপিত অপবাদ থেকে তাঁকে মুক্ত আখ্যা দিয়েছেন। নতুবা এ বৃত্তান্ত উল্লেখের পিছনে এমন কি কারণ থাকতে পারে? নবীদের নিহত হওয়া তাঁদের নিজেদের কোন ক্রুটির প্রমাণ নয় এবং তাঁদের মহিমা ও সম্মান পরিপন্থীও নয়। অনেক নবী আছেন যাঁরা খোদার পথে নিহত হয়েছেন যেমন ইয়াহিয়া এবং তাঁর পিতা। সুতরাং চিন্তা কর, হেদায়াত প্রাপ্তদের পথ সন্ধান কর আর ভ্রষ্টদের সাথে মেলামেশা করো না। (লেখকের পক্ষ থেকে)

এগুলোর মাঝে মসীহ্‌র সশরীরে আকাশে যাওয়া সম্পর্কিত একটি হাদীসও আপনি খুঁজে পাবেন না। আপনি সর্বত্র মসীহ্‌র মৃত্যুর উল্লেখ দেখতে পাবেন। কিঞ্চিত আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, এখানে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কোন হাদীসে আমরা **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দের অর্থ মানুষের সশরীরে

(চলমান টিকা)

দুইয়ের ভেতর অর্থের কোন তারতম্য নেই। পুনরায় লক্ষ্য করে দেখ, আর চিন্তা কর। আল্লাহ্ তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার শক্তি দান করুন। বিবাদ ছিলো, 'আধ্যাত্মিক রাফা' সম্পর্কে, 'দৈহিক রাফা' নিয়ে নয়। পবিত্র ও নৈকট্যপ্রাপ্ত নবীদের যেভাবে রাফা' হয় ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে সেরূপ রাফা'র অস্বীকারকারী ছিল। ঈসা (আ.) অভিশপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, আংশিকভাবে সম্মান লাভকারী নন, তারা এ কথা বলে অভিশপ্ত হয়েছে আর আজ পর্যন্ত তারা একথা বলে যাচ্ছে। খোদা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। তারা যুক্তি দেখায়, তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে অভিশপ্ত হয়েছেন। তাদের ধর্মমতে তৌরাতের দ্বিতীয় বিবরণ অনুসারে ক্রুশে নিহত ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সম্মান লাভের পরিবর্তে অভিশপ্ত। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী ঈসা (আ.)-কে এ অপবাদ যার ভিত্তি হলো তৌরাতের আয়াত ও ক্রুশীয় বর্ণনা তা থেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কেননা কোন ব্যক্তি নবী হবার দাবী করার পর যদি নিহত হয়, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যায় তাহলে তৌরাত তাকে অভিশপ্ত আখ্যা দেয়। হযরত ঈসা (আ.)-কে তাদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন, **ওয়ামা কাতালুহু ওমা সালাবুহু..... বার রাফাআহুল্লাহু ইলাইহে** অর্থাৎ সেই ক্রুশীয় মৃত্যু, তৌরাতের শিক্ষানুসারে যার আবশ্যকীয় ফলাফল হলো, অভিশপ্ত ও অসম্মানিত হওয়া তা মসীহ্‌র ক্ষেত্রে সঠিক নয় বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের দিকে রাফা' করেছেন অর্থাৎ ক্রুশীয় মৃত্যু বা নিহত হওয়া যেহেতু প্রমাণিত হয়নি তাই তাঁর অভিশপ্ত হওয়া বা রাফা' না হওয়াও প্রমাণিত নয়। অতএব সত্যবাদী নবীদের মত তাঁর আধ্যাত্মিক রাফা' প্রমাণিত হলো, আর এটিই উদ্দেশ্য। এই হল, এ বৃত্তান্তের প্রকৃত তাৎপর্য আর এখানে দৈহিক রাফা' নিয়ে কোন বাক-বিতন্ডা নেই। আর মূলতঃ এ নিয়ে ইহুদীদের মাঝে কোন বিতর্কও ছিল না। তাদের উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং ইহুদী আলেমরা হযরত মসীহ্‌কে মিথ্যাবাদী ও কাফির সাব্যস্ত করার ষড়যন্ত্র করেছে। তাঁকে মিথ্যাবাদী ও কাফির আখ্যায়িত করার জন্য তারা শরিয়তের বৈধতা সন্ধান করছিল। তাই তারা তৌরাত অনুসারে তাঁর অভিশপ্ত হওয়া এবং সত্যবাদী নবীদের মত আধ্যাত্মিক রাফা' হতে বঞ্চিত প্রমাণের জন্য তাঁকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা আবশ্যক জ্ঞান করলো, যেন খোদার কিতাবের বিরুদ্ধে কেউ কোন যুক্তি দিতে না পারে। তদনুযায়ী তাদের নিজ ধারণা মতে তাঁকে ক্রুশে হত্যা করলো। আর তারা তৌরাতের শিক্ষা অনুযায়ী তাঁর ক্রুশে মরা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি না হওয়া প্রমাণ করতে পেরে উল্লসিত হয়ে গেল। কিন্তু খোদা তাঁকে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও হত্যা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাফা দিয়েছেন। আর তিনি এ বৃত্তান্ত তাঁর সেই গ্রন্থে অবহিত করেছেন

আকাশে যাওয়া দেখতে পাই না। বরং বুখারীতে **‘ইয়া ঈসা’** সংক্রান্ত আয়াতের অর্থ ইবনে আব্বাসের তফসীরে **‘মুমীতুকা’** (অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দেব) দেখতে পাই। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন সাহাবী এক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা করেননি। সুতরাং যখন প্রমাণ হয়ে গেলো, **‘তাওয়াফ্ফির’** অর্থ হলো মৃত্যু ছাড়া

(চলমান টিকা)

যা ইঞ্জিলের পর ন্যায়বিচারক ও মিমাংসাকারীরূপে নাযিল করা হয়েছিল, যা সকল জাতির অন্যায়, অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটনকারী ও কাফিরদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারী। যেন এ কথা বলতে চাচ্ছেন, হে ষড়যন্ত্রকারীরা! হে সত্য ও সত্যবাদীদের শত্রুরা, তোমরা কেন বলছো, আমরা মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে হত্যা করেছি, ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছি, আর আমরা প্রমাণ করেছি, সে অভিশপ্ত, তাঁর রাফা’ হয়নি? হে কলুষিত জাতি! আমি তোমাদের সংবাদ দিচ্ছি, তোমরা তাঁকে হত্যাও করতে পারনি আর ক্রুশেও মারতে পারনি কিন্তু বিষয়টি তোমাদের জন্য ঘোলাটে করে দেয়া হয়েছে। তোমাদের হৃদয় বলছে, তোমরা তাঁকে হত্যা করার বিষয়ে নিশ্চিত নও, বরং আল্লাহ্ তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক রাফা’ যা তোমরা চাওনি তা হয়েছে। তোমরা ষড়যন্ত্র করেছো যেন তিনি এই মর্যাদা না পান। কিন্তু তিনি এ মর্যাদা লাভ করেছেন আর খোদা তাঁকে রাফা’ করেছেন, খোদা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এই শেষোক্ত কথাটি অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী **‘আযিযান হাকীমা’** ইঙ্গিত করছে আল্লাহ্ যাকে চান সম্মান দান করেন এবং তিনি নিজ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে স্বীয় মনোনীতদের সম্মানের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

কোন ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র তাদের ক্ষতি করতে পারে না যেভাবে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মানহানী করতে পারেনি। বরং তিনি তাঁকে সম্মান দিয়েছেন, তাঁকে আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন আর চক্রান্তকারীদেরকে ধ্বংস করেছেন।

অতএব হে সম্মানিত ভ্রাতা! নিশ্চিত জেনে রেখো, এটিই তাঁর উক্তি, **‘বার রাফাআহুল্লাহু ইলাইহি’**-এর ব্যাখ্যা। কিন্তু আমাদের জাতি তা গ্রহণ করতে নারাজ বরং এরা খোদার বাণীকে বিকৃত করে এবং এর শানে নুযুল সম্পর্কে চিন্তা করে না আর এরা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায়। যখন এদের বলা হয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে প্রথম সারির মু’মিনগণ, তাবেঈন ও প্রধান প্রধান মুহাদ্দেসগণও ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন তখন তাদের শেষ উত্তর হয় “আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যুর পর আরেকবার জীবিত করার শক্তি রাখেন।” তারা চিন্তা করে দেখে না, আল্লাহ্র কুদরত বা শক্তি তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি বলেন, فَيُمۡسِكُ الَّتِىۡ قَضٰى عَلَيۡهَا الۡمَوۡتَ (সূরা জুমার : ৪৩) এবং তিনি আরো বলেন, وَّمَا هُمۡ مِّنۡهَا بِمُخۡرَجِيۡنَ (সূরা হিজর : ৪৯) এবং তিনি বলেছেন لَا يَذُوۡقُوۡنَ فِيۡهَا الۡمَوۡتَ اِلَّا الۡمَوۡتَةَ الۡاُوۡلٰى (সূরা আদ দুখান : ৫৭)। এতে

অন্য কিছু নয়। তাই এই কথা বলা যাবে না, ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে মসীহ্‌র যে মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে তা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি বরং শেষ যুগে পূর্ণতা লাভ করবে। কেননা এই আয়াতে ধারাবাহিকভাবে যেসব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে তা সেই ক্রমধারাতেই ঘটে গেছে যেভাবে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। **'তাওয়াফ্‌ফীর'** প্রতিশ্রুতি ধারাবাহিকতার দিক থেকে এতে সর্বপ্রথম। আপনি জানেন, রাফা'র ঘটনা ঘটে গেছে। একইভাবে **'মুতাহ্‌হিরুকা মিনাল্লাযিনা কাফারু'** (সূরা আলে ইমরান : ৫৬) পূর্ণ হয়েছে। আর আমাদের নবী (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা পেয়েছে। কুরআন সাক্ষ্য দিয়েছে, মসীহ্ ও তাঁর মা ইহুদীদের অপলাপ ও অপবাদ থেকে মুক্ত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

(সূরা মায়েদা : ৭৬) তিনি আরও বলেন, وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

(সূরা আলে ইমরান : ৪৬) আর وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا

(সূরা আলে ইমরান : ৫৬) আয়াতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয়েছে। যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে পূর্ণ হয়েছে। আর তদনুযায়ী আমরা ইহুদীদেরকে পরাস্ত ও কোপগ্রস্থ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।

আপনি অবগত আছেন এ আয়াতের ধারাবাহিকতায় এই সকল প্রতিশ্রুতি **'তাওয়াফ্‌ফী'**র পরে বর্ণিত হয়েছে আর **'তাওয়াফ্‌ফী'**র প্রতিশ্রুতি রয়েছে অন্য

(চলমান টিকা)

কোন সন্দেহ নেই, পুণ্যবানদের যিনিই মারা যান তিনি জান্নাত লাভ করেন, একই সাথে তাঁর জন্য দ্বিতীয় মৃত্যু হারাম হয়ে যায়। তাই সেক্ষেত্রে ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন আর জান্নাতের স্বাদ ও নিয়ামত থেকে বহিস্কৃত হওয়া, তাঁর জন্য এর বাতায়ন রুদ্ধ করে দেয়া এবং এরপর আরেকবার তাঁকে মৃত্যু দেয়া কীভাবে বৈধ হতে পারে? অথচ আমি যে আয়াত উপস্থাপন করেছি অর্থাৎ

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ (সূরা আদ দুখান : ৫৭)

পারলৌকিক জীবনের স্থায়িত্ব আর দ্বিতীয়বার মৃত্যু না হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর এদিকেই আয়াতে ব্যবহৃত **'ইল্লা'** শব্দটি ইঙ্গিত করেছে। কেননা এটি এক্ষেত্রে সার্বজনীনতা ও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে আর বাক্যের প্রথমাংশে যে সাধারণ 'লা' বা না সূচক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এটা বিষয়টিকে এমন সামগ্রিক রূপ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা থেকে কেউ মুক্ত নয়। এক্ষেত্রে কেবল মাত্র একটি ব্যতিক্রম থাকলেও বেশি উল্লেখযোগ্য হত।

(লেখকের পক্ষ থেকে)

সকল প্রতিশ্রুতির পূর্বে। আর এই জাতি অর্থাৎ মুসলমানরা এ বিষয়ে একমত এসব ঘটনা সেভাবেই পূর্ণতা লাভ করেছে যে ধারাবাহিকতায় উক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে। যদি আমরা ধরেও নেই, **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দটি **রাফা'**র পরে বসবে তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে, ঈসা (আ.)-এর **'তাওয়াফ্ফা'** হয়েছে **রাফা'**র পর এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার পূর্বে; কিন্তু বিরোধীদের কেউই এ বিশ্বাস রাখে না। আমরা যদি বলি, **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দটি **'মুতাহ্হিরুকা মিনাল্লাযিনা'**র পরে এবং সেই প্রতিশ্রুতির পূর্বে হবে যা আয়াতের ধারাবিন্যাসের দিক থেকে পরে এসেছে, তাহলে আমাদের অবশ্যই একথা স্বীকার করতে হবে, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু আমাদের নবী (সা.)-এর অনতি:পর তাঁর অনুসারীদের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর জাতির দাবী অনুসারে এটিও মিথ্যা। কেননা, তারা বিশ্বাস করে, মসীহ্ কেবল সকল জাতির ধ্বংসের পরই মৃত্যুবরণ করবেন। যদি আমরা এ সমস্ত কথা বাদ দিয়ে মূল বিষয়ে ফিরে আসি আর বলি মসীহ্ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার পূর্বে মরবেন না, যা وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ (সূরা আলে ইমরান : ৫৬) আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত। সেক্ষেত্রে আমাদের এ কথাও স্বীকার করতে হবে, হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামত দিবসের পূর্বে মৃত্যুবরণ করবেন না। কেননা এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপ্তি কেয়ামত পর্যন্ত প্রসারিত। আর ঈসা (আ.)-এর অবতরণ সেক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়ার পরেই সম্ভব। তর্কের খাতিরে যদি আমরা এই অসম্ভব কথাটি মেনেও নেই তথাপি আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে কিয়ামতের পর ছাড়া তাঁর পা রাখার আর কোন স্থান দেখি না। হায়! আমাদের শত্রুরা দাবী করে, **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফীকা'**, আয়াতের **'মুতাওয়াফফীকা'** শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পরে হবে, এখন যেখানে আছে সেটি এর যথার্থ স্থান নয়। কিন্তু তারা আমাদেরকে এ কথা বলে না, যদি আমরা এই শব্দটি এখান থেকে অপসারণ করি তাহলে কোথায় বসাবো? আমরা কি প্রক্ষেপণকারীদের মত খোদার ঐশী কিতাব থেকে তা বাদ দিয়ে দেব?

যারা বলে, **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দটি রাফা'র পরে এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতির পূর্বে বসবে, তাদের কথা শুনে প্রত্যেক বুদ্ধিমান হাসবে এবং তাদের বোকামী দেখে অবাক হবে। তারা কি জানে না, ঈসার মৃত্যুকাল সম্পর্কে তারা যে অলিক বিশ্বাস রাখে এ দাবীটি এর পরিপন্থি? আমরা এখনই উল্লেখ করেছি তাদের বিশ্বাস হলো, **'তাওয়াফ্ফী'**র প্রতিশ্রুতি সকল সম্প্রদায় ধ্বংস হবার আগে পূর্ণ হবে না। তাই তাদের একথা মেনে নেয়া প্রয়োজন শুধু **রাফা'** শব্দের পরে নয় বরং **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দটিও আয়াতে বর্ণিত সর্বশেষ প্রতিশ্রুতিরও পরে বসবে।

চিন্তাবিদদের কাছে এটি অজানা নয়, কৃত্রিমভাবে যে শব্দ পরে রাখা হয় তা সব সময় স্বাভাবিক বিন্যাসের পরে বসে। এছাড়া আমাদের এমন কি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যার কারণে আল্লাহ্ তাঁর নিজ সুরক্ষিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ঐশীগ্রন্থে যা পূর্বে রেখেছেন, তা খোদা ও রসূলের সনদ ছাড়া পরে নিয়ে যাবো? এটাই সেই প্রক্ষেপণ যে কারণে খোদা তা'লা ইহুদীদের অভিশপ্ত করেছেন। সুতরাং খোদাকে ভয় কর আর তাঁর আয়াতসমূহকে এর সুবিন্যস্ত হয়ে যাবার পর স্থানচ্যুত করো না, যদি তোমাদের হৃদয়ে খোদাভীতি বলে কিছু থাকে। তুমি জানো! **'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী'** আয়াতটি হযরত ঈসার মৃত্যু বিষয়ে আর একটি প্রমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই এবং মূল তফসীরের পরিপন্থী কোন নতুন তফসীর ছাড়াই নিজের জন্য 'ফালাম্মা **তাওয়াফ্ফাইতানী'** বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। অথচ মহানবী (সা.) কুরআনের অর্থ, ইঙ্গিত ও রহস্য সবচেয়ে বেশী জানতেন। এই আয়াতে ব্যবহৃত **'তাওয়াফফী'** শব্দের অর্থ যদি সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে যাওয়া হতো তাহলে তিনি (সা.) এই শব্দটি নিজের জন্য ব্যবহার করতেন না। কিন্তু তিনি এ আয়াতটিকে নিজের প্রতি ঠিক সেভাবেই আরোপ করেছেন যেভাবে মসীহ্র প্রতি আরোপ করা হয়েছে। অতএব, এই আয়াতে **'তাওয়াফ্ফাইতানী'** শব্দের অর্থ 'তুমি আমাকে মৃত্যুদান করেছো' এই হচ্ছে এর সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ। এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এই আয়াতের ভিত্তিতে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আর এই অর্থটিকে একই সূত্রে তিনি বেঁধে দিয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কৃত অর্থ **'মুতাওয়াফ্ফিকা' এ্যায় 'মুমিতুকা'**র সাথে। সুতরাং সত্যসন্ধানী জাতির জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর প্রমাণ স্বরূপ এর তুলনায় স্পষ্ট যুক্তি আর কি হতে পারে? খোদা তা'লা এই আয়াতে হযরত ঈসার মৃত্যুর ক্ষণ এভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তিনি বলতে চেয়েছেন, হে মানুষ! যখন তোমরা দেখবে, খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদা বানিয়ে বসেছে, আর নিজেদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে তখন নিশ্চিত হতে পারো হযরত ঈসা ইন্তেকাল করেছেন। দেখ! তিনি কীভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও ইবনে আব্বাসের তফসীরের মাধ্যমে **'তাওয়াফ্ফী'**র অর্থ স্পষ্ট করেছেন ও উদঘাটন করেছেন। দেখ! কীভাবে খ্রিষ্টানদের ধর্ম বিকৃত হওয়া ও ঈসাকে উপাস্যরূপে অবলম্বনের পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলো। তুমি জানো, আমরা যদি ধরেও নেই, ঈসা এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন তাহলে আমাদের এ কথাও স্বীকার করতে হবে, খ্রিষ্টানদের ধর্ম আজ পর্যন্ত সঠিক ও নির্ভেজাল রয়েছে আর এর সাথে

শির্কের কোন মিশ্রণ ঘটেনি! সুতরাং চিন্তা কর আর চিন্তাশীলদের জিজ্ঞেস কর।

কোন কোন ত্বরাপ্রবণ ব্যক্তি বলে **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দ কুরআনে ঘুমের অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,
اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا (সূরা যুমার : ৪৩) এবং তিনি আরও বলেছেন–
وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى
(সূরা আল আনআম : ৬১) স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা এখানে **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দ শুধু মৃত্যু বা রূহ কবজ করার অর্থেই ব্যবহার করেছেন। সে কারণে তিনি ইঙ্গিতবাহক শব্দ 'কারিনা' উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন **'ওয়াল্লাতি লাম তামুত ফি মানামেহা'**। অর্থাৎ যার সত্যিকার মৃত্যু হয় না খোদা তা'লা তাকে তার ঘুমে রূপক মৃত্যু দেন। দেখ! এখানে এ আয়াতে তিনি কত পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত করলেন ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মা কবজ করা রূপক এক মৃত্যু। অতএব এখানে ঘুম শব্দটি 'কারিনা'। এখানে **'তাওয়াফফি'** শব্দটি তিনি ঘুম বা **'মানাম'** শব্দের কারিনাসহ ব্যবহার করেছেন, এ কথা পরিষ্কার জানানোর উদ্দেশ্যে যে **'তাওয়াফফি'** শব্দটি এক্ষেত্রে তার প্রকৃত শব্দ থেকে সরিয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এটি এদিকেও ইঙ্গিত করে **'তাওয়াফফি'** শব্দের প্রকৃত অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা **'সুম্মা ইয়াবআসুকুম'** ও **'লাইল'** এর কারিনার উল্লেখ করেছেন। সেই আয়াত হলো وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ একথা স্পষ্ট করার জন্য যে, **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দ এখানেও ঘুমের অর্থে নয় বরং মৃত্যু দেয়ার অর্থে ও মৃত্যুর পর উত্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেন একথা বিচার দিবসে পুনরুত্থানের প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত হয়।

এই কারণেই খোদা তা'লা এই আয়াতের পর কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। আর তাই তিনি বলেন, **'সুম্মা ইলাইহে মারজেউকুম'**। উদ্দেশ্য হলো, এই রূপক মৃত্যু ও রূপক উত্থানকে (অর্থাৎ ঘুম ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া) প্রকৃত মৃত্যু ও প্রকৃত উত্থানের প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। অতএব তোমাকে স্মরণ করানোর পর তুমি অনাচারী জাতির সংস্পর্শে বসবে না। তুমি কি দেখ না তিনি 'তাওয়াফ্ফী' শব্দ উল্লেখের পর বা'স শব্দ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, **'সুম্মা ইয়াবাসুকুম ফীহে'**। এটা সবার জানা কথা, ঘুমন্তদের বেলায় **'ইকায'** (জাগরণ) শব্দ ব্যবহার হয় বা'স (পুনরুত্থান) শব্দ নয়। যদি

এখানে **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দের অর্থ ঘুম পাড়ানো হতো তাহলে তিনি বলতেন, **'হুওয়াল্লাযি ইয়াতাওয়াফ্ফাকুম বিল লাইলে ওয়া ইয়ালামু মা জারাহতুম বিন নাহারে সুম্মা ইউকেয়ুকুম ফীহে'**। কিন্তু তিনি **'সুম্মা ইউকেয়ুকুম ফীহে'** বলেননি বরং তিনি বলেছেন, **'সুম্মা ইয়াবআসুকুম ফীহে'**। অতএব এর তুলনায় স্পষ্ট প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? কেননা পুনরুত্থান মৃতদের সাথে সম্পর্ক রাখে, ঘুমন্তদের সাথে নয়।

এই রূপক বিষয়ের দৃষ্টান্ত কুরআনে অনেক আছে যেভাবে তিনি বলেন, اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (সূরা হাদীদ : ১১৮) একথা বলা যায় না, এখানে **'ইয়ুহ্ঈ'** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো উৎপন্ন করা। বরং এটি রূপক ভাষা। এর উদ্দেশ্য হলো, উদ্গত করাকে জীবিত করার সাথে তুলনা করা যেন মৃত যে পুনরুজ্জীবিত হবে তা এর মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)। অতএব এ কথা বলা যাবে না, তাদের বধির ও অন্ধ বানানো আভিধানিক অর্থে তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করা বুঝায়। বরং এটি একটি রূপক উপমা। অতএব তুমি এ আশা রেখো না আর অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে **'তাওয়াফ্ফী'**র অর্থ ঘুম করার ব্যর্থ আশায় নিজেকে অনর্থক কষ্টে ফেল না। কেননা, এটি যদি সত্য হয় তাহলে তোমাকে মানতে হবে এবং অভিধান থেকে প্রমাণ করতে হবে, আয়াত **'ইউহ্ঈল আরযা'তে 'ইয়ুহ্ঈ'** শব্দটি উৎপাদন বা উদ্গত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে তুমি যদি এ নিয়ে হঠকারিতার আশ্রয় নাও তাহলে তোমাকে **'আসাম্মাহুম'** এবং **'আমা আবসারাহুম'** শব্দের অর্থ করতে হবে, তাদের পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাদের সত্য থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিয়েছে। অধিকন্তু আমাদেরকে আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাবলী থেকেও এ অর্থ দেখাতে হবে। কিন্তু তোমার এ কাজের সাধ্য কোথায়? অতএব সন্দেহযুক্ত চিন্তা ধারার অনুসরণ করো না। যা প্রমাণিত তা গ্রহণ করা এবং নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তোমার জন্য আবশ্যক।

জেনে রেখো, আপাতঃদৃষ্টিতে উপস্থাপিত আয়াতের যে অর্থ মনে করা হয় তুমি এ সকল অর্থের কোন চিহ্ন প্রকৃত অর্থে আরবী ভাষার কোন গ্রন্থে পাবে না। যদি তোমার চোখ থেকে থাকে তাহলে দেখবে, কুরআন এমন দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটি স্বীকৃত বিষয়, কোন কারিনা (প্রসঙ্গ) ছাড়াই এর প্রকৃত অর্থের অজস্র ব্যবহার রয়েছে। অতএব তোমার উচিত কুরআনকে মনোযোগ সহকারে পড়া, যেন তোমার সামনে **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দের কারিনা

বিহীন ব্যবহার স্পষ্ট হয়ে যায় যা পবিত্র কুরআনে সর্বত্র মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **'তাওয়াফ্ফী'** ক্রিয়ার কর্তা যদি আল্লাহ্ হন আর এ ক্রিয়াটি যদি মানুষের উপর সম্পাদিত হয় অর্থাৎ কর্মকারক মানুষ হয় তাহলে কোন হাদীস বা কোন কবির পঙক্তিতে এর অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অর্থ তুমি খুঁজে পাবে না। পারলে খুঁজে বের করে দেখাও, আর আমাদের পক্ষ থেকে পূর্ব ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ কর, যদি তুমি নিজ দাবীতে সত্য হয়ে থাকো।

যারা বলে, **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফীকা'** আয়াতে উল্লেখিত **'মুতাওয়াফফীকা'** শব্দের অর্থ **'ইন্নী মুনিমুকা'** অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাকে ঘুম পাড়াতে যাচ্ছি এটিই তাদের একমাত্র ভুল নয়। বরং তারা তাদের এ দাবীতে নানা ধরনের পদস্খলন ও বিভ্রান্তির সমাহার ঘটিয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর তফসীরকে অবজ্ঞা করেছে অথচ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যিনি রহমান খোদার প্রেরণায় কথা বলতেন। তাঁর কথা সকল কথার তুলনায় উত্তম ছিল। তাঁর উক্তি, আধ্যাত্মিক স্বাদ, আত্মিক শক্তি, জ্ঞান, তত্ত্ব এবং সেই জ্যোতিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে যা তাঁকে রহমান খোদার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। আর ইবনে আব্বাস **'মুতাওয়াফ্ফীকা'**র অর্থে যা কিছু বলেছেন তারা তা পরিত্যাগ করেছে আর এই শব্দের বিষয়ে তারা কুরআন ও এতে বর্ণিত এই শব্দের প্রয়োগ এবং ক্রমাগত ব্যবহার ও দ্ব্যর্থহীন ব্যবহারের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে আর অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করেছে। আর তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

আবার বিতর্কের ছলে যদি আমরা **'তাওয়াফ্ফা'**র অর্থ ঘুমও ধরে নেই তাহলেও এই অর্থ তাদের বিন্দুমাত্র কাজে লাগবে না। কেননা, ঘুমের অর্থ হলো রূহ কবজ হওয়া এবং দেহের চৈতন্য লোপ পাওয়া, কিন্তু দেহ ও আত্মার সম্পর্ক তখনও অবিচ্ছিন্ন থাকে। অতএব এথেকে কীভাবে প্রমাণিত হলো, আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্র দেহ কবজ করেছেন? তুমি কি খোদার আদি সুন্নত সম্পর্কে জানো না, তিনি ঘুমের সময় আত্মা কবজ করেন আর জড় দেহ এ জগতেই পড়ে থাকে। অতএব তুমি কীভাবে জানলে, **'মুতাওয়াফ্ফীকা'** শব্দ দেহের রাফা'র প্রতি ইঙ্গিত করে? পুরো সৃষ্টি-জগত নিদ্রাযাপন করে কিন্তু আল্লাহ্ তাদের কারো দেহ কবজ করেন না। অতএব তুমি হঠকারিতা ও অহংকার পরিহার কর এবং ঈমান ও সততার ভিত্তিতে চিন্তা কর যেন খোদা তোমার হৃদয়ে সত্য ফুৎকার করেন আর তোমাকে তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কথার কথা, আমরা যদি এ অর্থ মেনেও নেই তাহলে আর একটি বিশৃংখলা

দেখা দেবে। আর তা হলো, এ আয়াতে ব্যবহৃত **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দ অপরাপর প্রতিশ্রুতির মত একটি নতুন প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। এই অর্থ যদি সত্য বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে রাফা'র সময় তাঁর ঘুমানোই তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় কাজ হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে এটাও মানতে হবে রাফা'র পূর্বে তিনি কখনও ঘুমাতেন না। কেননা, এমন একটি বিষয় যা তাঁর জীবনে বহুবার ঘটেছে–সেই একই কথার বিষয়ে খোদা তা'লা নতুনভাবে প্রতিশ্রুতি দিবেন এটা কিভাবে সম্ভব? কোন কিছুর নতুনভাবে প্রতিশ্রুতি দেয়ার অর্থ হলো, প্রতিশ্রুতি দেয়ার পূর্বে সে বস্তুর যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না। নতুবা এটি যা দেওয়া আছে, তাই প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার নামান্তর। এটি একটি বৃথা কাজ যা খোদা তা'লার মর্যাদা বা সম্মান পরিপন্থী। অতএব খোদার প্রতিশ্রুতিকে এর ঊর্ধ্বে রাখা আবশ্যক। এছাড়া এই অর্থ যদি সঠিক হয় তাহলে فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (সূরা মায়েদা : ১১৮) সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? তুমি কি মনে করো, খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসাকে তাঁর ঘুমের পর খোদা হিসেবে অবলম্বন করেছে মৃত্যুর পরে নয়? তুমি কি মনে কর মসীহ্ খ্রিষ্টানদের ভ্রষ্টতার পূর্বে সারা জীবন কখনও ঘুমাননি? আর তাঁর চোখ রাফা'র পূর্বে কখনও নিদ্রাচ্ছন্ন হয়নি আর রাফা'র পূর্বে তিনি সদা জাগ্রত ছিলেন? ন্যায়সঙ্গতভাবে দৃষ্টিপাত করে বল, এ স্থলে কি এ অর্থ দাঁড়াতে পারে এবং এর দ্বারা কি অন্তরের প্রশান্তি, আত্মিক স্বস্তি ও হৃদয়ের তৃপ্তি লাভ হয়? তুমি ভালভাবেই জানো, এটি সুদূর পরাহত একটি বিষয় এবং স্পষ্টতই ভ্রান্ত আর ব্যাখ্যাকারীদের কোন ব্যাখ্যাই একে সঠিক বলে আখ্যা দিতে পারে না? অতএব এটি সত্য অস্বীকারকারী আলেমদের ভয়াবহ উদাসীনতা বৈ কিছু নয় যারা একটি ভ্রান্ত অর্থকে সঠিক বলে মতামত ব্যক্ত করেছে। অতএব তোমাদের শোনার মত যোগ্যতা থেকে থাকলে মন দিয়ে শোন।

এ ছাড়া বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে **'তাওয়াফ্‌ফী'**র স্পষ্ট ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে **'মুতাওয়াফফীকা'** অর্থ হলো, **'মুমিতুকা'** (আমি তোমাকে মৃত্যু দিব)। সাহাবাগণ, তাবেঈন, তাবা তাবেঈনদের সকলে একই মতের অনুসারী ছিলেন। কেউ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেননি। মানুষ যদি সত্যান্বেষী হয় তাহলে এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে?

আমি এখনই উল্লেখ করে এসেছি, আমরা যদি কথার কথা ধরেও নেই, আর বলি এক্ষেত্রে অর্থাৎ **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফীকা'** আয়াতে **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দ ঘুমের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলেও ঘটনার রূপ ভিন্ন হতো আর এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত যুক্তি বিরোধী জাতির পক্ষে যেতো না। বিরোধীদের মরিয়া

হওয়ার কারণ কেবল একটি, তারা যেন হযরত মসীহ্ (আ.)-এর সশরীরে ঊর্ধ্বগমন সাব্যস্ত করতে পারে। কিন্তু এ অর্থ দ্বারা কোনভাবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না বরং এর বিপরীত অর্থ প্রমাণিত হয়। কেননা, এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ, হে ঈসা আমি তোমার আত্মা কবজ করবো। দেহ ও আত্মার সম্পর্ক সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য থাকা অবস্থায় তোমার শরীরকে পৃথিবীতে পরিত্যাগ করবো। কেননা ঘুম মূলতঃ এক অর্থে আত্মা কবজ করা এবং দেহকে এতদুভয়ের (আত্মা ও দেহ) সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য থাকা অবস্থায় পরিত্যাগ করার নাম। একটু চিন্তা করো দেখ! এ অর্থের মাধ্যমে বিরোধীদের উদ্দেশ্য কীভাবে সিদ্ধি হতে পারে? আর এথেকে ঈসা (আ.)-এর আকাশে যাওয়া কীভাবে প্রমাণিত হতে পারে? বরং **'তাওয়াফ্ফী'**র অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করা সত্ত্বেও বিষয়টি যেমন ছিল তেমনিই আছে। কেবল সে ব্যক্তি ব্যতিরেকে যার মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও সততা বলতে কিছু নেই এবং যার সাথে বিদ্বেষ ও ঘৃণার অন্ধকার গাঁটছড়া বেঁধেছে, সে ছাড়া প্রত্যেক সুবিচারক আমাদের এই বক্তব্যকে অনুধাবন করবে ও এর দ্বারা উপকৃত হবে। কেননা দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি পক্ষপাতদুষ্ট বিদ্বেষী জাতির কোন উপকার সাধন করে না।

পুনরায় তুমি যদি এই আয়াতকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ আর একে সঠিকরূপে ও সর্বোত্তমভাবে নাও তাহলে এর ভাব ও প্রসঙ্গ যে মসীহ্র মৃত্যুরই অর্থ প্রদান করছে তা তোমার সামনে গোপন থাকবে না, যা আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় থেকেও স্পষ্ট। কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজ উক্তি **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফীকা ওয়া রাফিউকা ইলাইয়া'-র** পর এমন কথা উল্লেখ করেছেন যাতে মসীহ্র জন্য মানসিক প্রশান্তি, শুভসংবাদ এবং তাঁর মৃত্যুর পর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদের বিজয়ের সংবাদ রয়েছে। আর এটা হযরত ঈসার ইপ্সিত ও বহু প্রতীক্ষিত আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় লাভের পূর্বে তাঁর মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে মূল কথা হলো, খোদা তা'লা নবীদের এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে তাঁরা চান তাঁদের হাতে সত্য জয়যুক্ত হোক আর তাঁদের চোখের সামনে তাঁদের মাধ্যমে উম্মতের সুসংহতি ও ঐক্য ফিরে আসুক। তাঁরা চান, সত্য ছাড়া বাকী সব দলাদলি ধ্বংস হয়ে যাক। তাঁদের সম্পর্কে খোদার চিরন্তন রীতি হলো, তিনি তাঁদেরকে প্রাধান্য ও বিজয় দেখিয়ে দেন, শত্রুর লাঞ্ছনা দেখান আর প্রকাশ্য বিজয়ের পূর্বে তাঁদের ক্ষেত্রে মৃত্যু দেন না। এর প্রমাণ আমাদের রসূল (সা.)-এর জীবনী। খোদা তা'লা দেখতে পেলেন কাফেররা তাঁর রসূলকে কাফির, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে, আল্লাহ্র ওহী নিয়ে হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে আর যাতনা দিচ্ছে, তখন তিনি আপন নবীকে

সাহায্য ও সমর্থন করেন আর প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছিল তাকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র থেকে অপবিত্র পৃথক না হয়ে গেছে, আর তিনি স্বীয় নবীকে দেখান, মানুষ দলে দলে খোদার ধর্মে প্রবেশ করছে সত্য, সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে আর মিথ্যা মিথ্যা সাব্যস্ত হয়েছে, হিদায়েত ও ভ্রষ্টতার মাঝে তফাৎ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং বিশৃঙ্খলাপরায়নদের লাঞ্ছনাও প্রতিভাত হয়েছে।

কখনও কখনও খোদার প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম যুক্তিবোধ নবীর বাহ্যিক বিজয় ও সাফল্য লাভের পূর্বে তাঁর মৃত্যুর দাবী করে। তিনি তাঁকে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও নিরাশ অবস্থায় মৃত্যু দেন না বরং তাঁকে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর অনুসারীদের উপর্যুপরি ভবিষ্যৎ বিজয়ের শুভ সংবাদ দেন যাতে এর মাধ্যমে তাঁর হৃদয় প্রশান্ত হয়, তিনি যেন দুঃখ ভারাক্রান্ত না হন আর ব্যথাতুর হৃদয়ে যেন নিজ প্রভুর কাছে ফিরে না যান। বরং এ পৃথিবী থেকে যেন প্রশান্ত, আনন্দিত, উৎফুল্ল ও পরিতৃপ্ত নয়নে বিদায় নিতে পারেন। ঐশী শুভ সংবাদ ও সত্য প্রতিশ্রুতি লাভের পর তাঁর মনে যেন কোন বেদনা না থাকে আর নিজ প্রভুর কাছে যেন দুঃখমুক্ত ও আনন্দিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন। হযরত ঈসার ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য। তিনি নিজ জীবনে কোন বিজয় দেখেননি। মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে খোদা তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীদের বিজয়ের সংবাদ দিয়েছেন। তাঁর নিজ জীবদ্দশায় বিজয়ের সংবাদ দেননি। আলোচ্য আয়াত নিয়ে পুনরায় চিন্তা কর আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ- তুমি এ অর্থের ভেতর কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? তিনি যেন এ আয়াতে বলতে চেয়েছেন, হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে সাফল্য, বিজয় ও প্রাধান্য লাভের পূর্বে মৃত্যু দেব। তবে ইহুদীদের দাবীর বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সম্মানজনক মর্যাদা রাফা' ও নৈকট্য প্রদান করবো। অতএব বিজয় দেখার পূর্বে ইন্তেকালের কথায় নিরাশ হবে না। তোমার অনুসারীদের দুর্বলতা এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাবে না। তোমার পর আমি তোমার বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করবো, আমি তোমার শত্রুদের চুর্ণ-বিচূর্ণ করবো এবং তাদের চিরতরে নির্মূল করবো। আর যারা তোমার অনুসারী এবং তোমার খিলাফতের সমর্থক কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে জয়যুক্ত রাখবো। এই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপনকারী খোদার বাণীর মর্ম।

ভবিষ্যতে কোন সময় হযরত ঈসার আকাশ থেকে নাযিল হওয়ার কথা থাকলে তিনি এমন করে বলতেন না বরং তিনি বলতেন, দুঃখ করো না আর ভয় পেও না। কেননা আমরা তোমাকে মৃত্যু দেবো না বরং জীবিত আকাশে নিয়ে যাবো। পুনরায় আমরাই তোমাকে পৃথিবীতে তোমার উম্মতের কাছে ফেরত পাঠাবো

এবং তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাকে বিজয় দান করবো আর তোমার অনুসারীদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবো। সুতরাং নিজেকে পরাজিত ভেবো না। কিন্তু খোদা তাঁকে আকাশ থেকে প্রেরণ ও তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেননি বরং তাঁকে এই বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত রাখবেন। অতএব তিনি যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তেমনটিই করেছেন, যার পর অনেক শতাব্দী কেটে গেছে।

বাকী রইলো 'নুযূল' বা অবতীর্ণ হবার বিষয়টি– এক্ষেত্রে তুমি এর কোন লক্ষণ বা চিহ্ন আজ পর্যন্ত দেখতে পাওনি। অতএব চিন্তা কর! পৃথিবীর বয়স শেষ যুগে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন আসলেন না? এই রহস্য উদঘাটনের তথ্যটি হল 'নুযূল' মূলতঃ খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বরং তা বক্র স্বভাব ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার অধিকারী লোকদের বানানো কথা। এ কারণে তা এখনও প্রকাশ পায়নি। কেননা খোদা এমন প্রতিশ্রুতিই দেননি। যে সকল প্রতিশ্রুতি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ছিল তার সবক'টি প্রকাশ পেয়েছে ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তুমি কি দেখতে পাও না, ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ উক্তি অর্থাৎ **'মুতাহ্হিরুকা মিনাল্লাযিনা কাফারু'**- পূর্ণ করার জন্য একজন "নিরক্ষর" নবীকে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর কীভাবে হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করে স্বীয় প্রতিশ্রুতি **'ওয়া জায়েলুল্লাযিনাত তাবাউকা'** পূর্ণ করেছেন। নাযিল হওয়া বা নুযূল যদি এ সকল প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে তা অপরাপর প্রতিশ্রুতির সাথে অবশ্যই পূর্ণতা পেতো। লক্ষ্য কর প্রতিশ্রুতির অপরাপর অংশ পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নুযূলের প্রতিশ্রুতি কোথায় হারিয়ে গেল? অতএব সেই অস্তিত্বের কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যা বলেছি তা-ই সত্য। রইলো নুযূলের বিষয়টি। অতএব এটি এ সকল প্রতিশ্রুতির অংশ নয় আর এসব প্রতিশ্রুতির সাথে কুরআনে তা উল্লেখ করা হয়নি এবং খোদার কিতাবে এর কোন নাম-গন্ধও দেখা যায় না বরং তা সন্দেহবাদীদের সন্দেহ বৈ আর কিছু নয়। সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবার পর একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না। খোদাকে ভয় কর এবং মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হও। কুরআনে তাঁর জীবিত থাকার কোন ইঙ্গিতও খুঁজে পাবে না বরং পবিত্র কুরআন একাধারে তাঁর যৌবন প্রাপ্তির, প্রৌঢ়ত্বে উচ্চমার্গের কথাবার্তা বলার এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হবার, আল্লাহ্র বাণী ও বার্তা পৌঁছে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ যুক্তি প্রমাণ প্রদান শেষে তাঁর মৃত্যু লাভের সংবাদ দান করে।

অতএব হে লোক সকল! সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবার পর সাক্ষ্য গোপন করবে না আর পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়াবে না। পরস্পর ভালোবাসা ছড়াও, ঘৃণা ছড়িও না। পুণ্যকর্ম সম্পর্কে একান্তে পরামর্শ কর, অবাধ্যতার কাজে পরামর্শ করো না। সত্যের অনুসরণ কর, আর সীমালঙ্ঘণ করো না। চিন্তা কর, তড়িঘড়ি করো না। আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করাচ্ছি। অতএব তোমরা মু'মিন বিশ্বাসী হয়ে থাকলে তাঁর তাক্ওয়া অবলম্বন কর। জেনে রেখো! তোমরা যা গোপন রাখো এবং প্রকাশ কর আল্লাহ্ তা'লা তা ভাল জানেন। কোন লুকানো বিষয় তাঁর কাছে গোপন নয়। যে নিজ প্রভুর নির্দেশের অবাধ্য হয় এবং তাঁকে মানে না, সত্ত্বর তিনি তাকে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করবেন, তার কাছ থেকে কঠোর হিসাব গ্রহণ করবেন। তাকে স্বীয় অপকর্মের পরিণতির স্বাদ গ্রহণ করাবেন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করবেন।

আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশ সম্বন্ধে এ কথা বলা হয় না, এর দ্বারা ঘুমের পর রাফা' হবার কথা বুঝায়! কেননা যেখানে প্রমাণিত হলো, 'তাওয়াফফী'র অর্থ হলো শুধু আত্মা কবজ করা, দেহ নয়। একই কারণে প্রমাণ হলো, রাফা'র সম্পর্ক আত্মার সাথে দেহের সাথে নয়। কেননা আল্লাহ্ সেটিকেই রাফা' করেন যেটিকে তিনি কবজ করেন। জানা কথা, আল্লাহ্ তা'লা আত্মা কবজ করেন, দেহ নয়। আপনি জানেন, এ সম্পর্কে কুরআনের সর্বত্র সাক্ষ্য রয়েছে। কুরআনে যে সকল স্থানে 'তাওয়াফ্ফী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি স্থানেও আপনি আত্মাসহ দেহ উত্তোলন অর্থে এর ব্যবহার দেখবেন না। আদম সৃষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই হলো খোদার রীতি। কেননা তিনি আত্মা কবজ করেন আর দেহকে মাটিতে, বিছানায় বা মেঝেতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেন। অতএব যে বস্তু আল্লাহ্ তা'লা কবজ করেননি তা কীভাবে তাঁর দিকে উত্থিত হতে পারে? রাফা'র জন্য কবজ করা একটি আবশ্যকীয় শর্ত। এছাড়া কুরআনে যে **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দের ব্যবহার রয়েছে আমরা যদি তা অনুসন্ধান করি তাহলে ২৫টি স্থানে এর ব্যবহার দেখি কিন্তু কোন স্থানেই আল্লাহ্ তা'লা আত্মা কবজ করা ছাড়া অন্য কোন অর্থে তা ব্যবহার করেননি। তুমি এ কথার বিরোধী কিছু পাও কিনা তা কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখ? তাঁর পক্ষ থেকে শিখানো رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ (সূরা আ'রাফ : ১২৭), تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ (সূরা ইউসুফ : ১০২), وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ (সূরা ইউনুস : ৪৭), وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ (সূরা ইউনুস : ১০৫) উক্তি নিয়ে চিন্তা করুন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত

حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ (সূরা নিসা : ১৬), اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ (সূরা আ'রাফ : ৩৮) নিয়েও ভাবো। একইভাবে আরো বাণী রয়েছে আর সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত এই **'তাওয়াফ্ফী'** সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ তুমি কি মৃত্যু ছাড়া এ শব্দটির ভিন্ন কোন অর্থ দেখতে পাও। আর সিহাহ্ সিত্তাহ্ (ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ) ও অপরাপর হাদীসে এবং কবিদের কাব্যে এর এতো ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে যে তা গুণে শেষ করা যাবে না। অতএব চিন্তা করুন আর অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। চিন্তা-ভাবনায় আপনাকে সাবধান হতে হবে, তড়িঘড়ি করে কোন উত্তর দেবেন না।

জেনে রাখুন! যারা আমাদের এ কথার বিরোধিতা করে আর বলে, **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফিকা'** *(সূরা আলে ইমরান-৫৬)* এবং **'ফালাম্মা তাওয়াফ্ফাইতানী'** *(সূরা মায়েদা-১১৮)* আয়াতে **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দ সশরীরে রাফা'র জন্য ব্যবহার হয়েছে, তাদের কথাটি এমন– যার কোন প্রমাণ নেই। তারা এর পক্ষে কোন আয়াত উপস্থাপন করেনি। তারা ঐশী গ্রন্থের কোন বাগধারা বা আল্লাহ্‌র রসূল বা সাহাবীদের কোন তফসীর বা ভাষাবিদদের কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি। নিঃসন্দেহে পক্ষপাতদুষ্টদের অভ্যাসের ন্যায় এটি একটি স্বেচ্ছাচারিতা মাত্র।

অতএব যখন প্রমাণ হয়ে গেল, কুরআনের সর্বত্র **'তাওয়াফ্ফী'** শব্দ মৃত্যু দেয়া এবং রূহ কবজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে আয়াত **'ইয়া ঈসা ইন্নী মুতাওয়াফফীকা'**-তে যে **'তাওয়াফফী'** শব্দ ব্যবহার হয়েছে সে সম্পর্কে তোমার মত কি? এটি কি তোমার মতে এমন শব্দের মত যা কুরআনের সর্বত্র ক্রমাগতভাবে মৃত্যু ও রূহ্ কবজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? না-কি এর এমন কোন বিশেষ অর্থ আছে যার দৃষ্টান্ত কুরআনেও পাওয়া যায় না আর কোন হাদীস বা সাহাবীর কোন উক্তি, আরবের কোন বাগ্মীর বাণী বা তাদের পূর্বাপর কোন কবির কাব্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না? তুমি যদি মনে কর, আলেমগণ কৃত্রিমভাবে মিছেমিছে **'মুতাওয়াফ্ফীকা'** শব্দের যে উদ্ভট অর্থ করেছে– আরবী ভাষা, কুরআন শরীফ ও রাসূলুল্লাহ্‌র হাদীসে এর আরও দৃষ্টান্ত আছে, আর তুমি যদি এ ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাকো তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর । তুমি যদি তা উপস্থাপন করতে না পারো, যা তুমি কখনও পারবে না- তাহলে সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর নিকট তুমি প্রত্যাবর্তন করবে। এরপর তোমরা যা জানতে আর করতে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। বিশ্ববাসীর হৃদয়ের সংবাদ আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আমি খোদার পবিত্র অস্তিত্ব এবং তাঁর মর্যাদার নামে শপথ করে বলছি! আমি

খোদার কিতাবের প্রতিটি আয়াত পড়েছি এবং তাতে গভীর অভিনিবেশ করেছি, এরপর গভীর দৃষ্টিতে হাদীসের বই পড়েছি এবং তা নিয়েও ভেবেছি। যেখানে খোদা 'কর্তা' আর মানুষ 'কর্ম' হিসেবে উল্লেখিত, সেখানে **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দের মৃত্যু বা রূহ্ কবজ ছাড়া অন্য কোন অর্থ দেখিনি। যে এর বিপরীত অর্থ প্রমাণ করতে পারবে তার জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রচলিত মুদ্রার এক সহস্র দেরহাম পুরস্কার থাকবে। যারা অস্বীকার করে এবং মনে করে, খোদার বাণীতে **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দ কোন মানুষের জন্য রূহ কবজ এবং মৃত্যুর অর্থে ব্যবহার হয় না বরং হাদীস ও বিশ্বপ্রতিপালকের কিতাবে তা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাদেরকে আমি যেসব বই ছেপে প্রচার করেছি তাতে একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সত্য কথা হলো, **'তাওয়াফ্‌ফী'** শব্দ যখন কোন বাণীতে ব্যবহার হয় আর যেখানে কর্তা খোদা আর স্পষ্টতঃ বা ইঙ্গিতে যদি কোন আদম সন্তান কর্ম হয়- উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্ যায়েদের **'তাওয়াফ্‌ফী'** করেছেন বা বকরকে **'তাওয়াফ্‌ফী'** করেছেন অথবা খালেদের **'তাওয়াফফী'** হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় মৃত্যু দেয়া বা জীবন হরণ ছাড়া অন্য কোন অর্থ হয় না। তুমি খোদার বাণী, রসূলের উক্তি, কোন আরব কবির কাব্যে বা যুগের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মতে এর কোন ব্যতিক্রম দেখবে না। অতএব সর্বত্র দৃষ্টিপাত করে দেখ! আমরা কি সত্য বললাম না কি আমরা মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত? চিন্তাশীলদের চিন্তার খোরাক হিসেবে আমরা আমাদের এই বক্তৃতাকে উপর্যুপরী যুক্তিতে সাজিয়েছি।

কোন কোন অজ্ঞের জন্য পরিতাপ! তারা আমাদের এ যুক্তি শুনে হেদায়েত অনুসন্ধানীদের মত গ্রহণ করার পরিবর্তে উপেক্ষার ছলে নিজেদের পক্ষ থেকে আমাদের যুক্তি খন্ডনের মানসে আয়াত ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفۡسٍ (সূরা ইমরান : ১৬২) ও অনুরূপ আয়াতগুলো পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং চরম অজ্ঞতার কারণে বুঝে না আমাদের কথা খন্ডন করতে গিয়ে তারা যেসব আয়াত পাঠ করে তার প্রত্যেকটি **'বাবে তাফঈল'** থেকে নির্গত, **'তাফা'উল'** নয়। আর এটিই তো বিতর্কের বিষয়। দেখ! এরা সকল দিক থেকে কীভাবে সত্যের জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায়। আবার দেখ, কীভাবে এরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়! তারা কুরআনের অনেক আয়াত উদাসীনতার ঘোরে পাঠ করে। তাদের জনবল তাদের অহংকারী করে তুলেছে। যার ফলশ্রুতিতে তারা দুর্বলদের প্রতি অহংকারবশত অত্যাচার ও অন্যায় করছে।

শোন! খোদা তোমায় নিরাপদ রাখুন এবং তোমাকে কলুষমুক্ত করুন। বিরোধীদের আরো অনেক আপত্তি রয়েছে যা তাদের ভুল ধারণা ও চিন্তাশক্তির

অভাব থেকে জন্ম নিয়েছে। আমরা আমাদের এই বইতে তা খন্ডন সহকারে লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেন মানুষের মাঝে যারা সুস্থ বিবেকবান, মনোনীত, বিদ্বেষমুক্ত এবং সত্যান্বেষী- তারা উপকৃত হতে পারে।

এর একটি হলো, তারা বলে মানুষ যেভাবে পাহাড় থেকে নীচের দিকে নামে ফিরিশ্‌তারাও আকাশ থেকে সেভাবে অবতরণ করেন। তাঁরা তাদের অবস্থানস্থল থেকে দূরে চলে যায় আর যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে ফিরে না যায় তাঁদের নির্ধারিত স্থানটি খালি অবস্থায় ছেড়ে দেন। এ হলো তাদের বিশ্বাস যা তারা বলে বেড়ায়। আমরা এটি মানি না আর আমরা বলবো, তারা এক্ষেত্রে সত্য-বিচ্যুত। এতে তারা ভীষণ ক্ষেপে যায় আর বলে, এরা সুন্নীদের বিশ্বাস ও সুন্নী জামাত থেকে বেরিয়ে গেছে বরং এরা কুফরী করেছে এবং মুরতাদ হয়ে গেছে। এই ছুতো ধরে তারা আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করে।

এর উত্তরে জেনে রেখো! তারা ফিরিশ্‌তাকে মানুষের মত ভেবে ভুল করেছে। আর যাকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার চিন্তাধারা সুনিশ্চিত, নিশ্চয় এটি তার অজানা নয় ফিরিশ্‌তা সত্যিকার অর্থে কোন গুণেই মানুষের সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। কিতাব, সুন্নত ও ইজমায় এ কথার কোন প্রমাণ নেই, যখন তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করেন, আকাশকে এমন এক জনপদের মত খালি অবস্থায় পরিত্যাগ করেন যেন এর অধিবাসীরা সে জনপদ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। আর তাঁরা নিজেদেরকে কষ্টে নিপতিত করে মানুষের কাছে আসার লক্ষ্যে যাত্রা করেন! সফরের কষ্ট ও বেদনা, দীর্ঘ পথ পাঁড়ি দেয়ার ক্লান্তি ও শ্রান্তি এবং সকল হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পর অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় তাঁরা পৃথিবীতে পৌঁছেন! কিন্তু কুরআন অনুসারে ফিরিশ্‌তাগণ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এ প্রসঙ্গে খোদা তা'লা বলেন, وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (সূরা আল ফজর : ২৩) লক্ষ্য করে দেখ! খোদা তোমার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করুন! তিনি কিভাবে আয়াতে তাঁর আগমন এবং ফিরিশ্‌তাদের আগমন আর তাঁর অবতরণ ও ফিরিশ্‌তাদের অবতরণকে স্বরূপ ও অবস্থার দিক থেকে একই আখ্যা দিয়েছেন। রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ্‌র আর্‌শ থেকে অবতরণ সম্পর্কে যা প্রমাণিত তা আপনাকে স্মরণ করানোর আর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আপনি তা জানেন। একই সাথে আমি বিশ্বাস রাখি, আপনি এই অবতরণকে দৈহিক অবতরণ মনে করেন না আর এ বিশ্বাসও করেন না, আল্লাহ্‌ যখন নিম্ন আকাশে নেমে আসেন তখন আর্‌শ তাঁর অস্তিত্বশূন্য হয়ে যায়। ফিরিশ্‌তার অবতরণ আল্লাহ্‌র অবতরণের মত যার প্রতি উপরোক্ত আয়াত ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহ্‌ তা'লা নিজ অস্তিত্বের মত ফিরিশ্‌তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমানের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্গত

করেছেন। তিনি বলেছেন,

الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

(সূরা বাকারা : ১৭৮) এবং তিনি আরও বলেছেন, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ *(সূরা মুদ্দাসিসর: ৩২)* সুতরাং তিনি মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিলেন, ফিরিশ্‌তাদের স্বরূপ এবং তাঁর সুমহান গুণাবলীর মর্ম বোধশক্তির সীমার ঊর্ধ্বে, খোদা ছাড়া তা আর কেউ জানে না। কাজেই তোমরা খোদা ও ফিরিশ্‌তা সম্পর্কে বড় বড় কথা বলো না আর তাঁর কাছেই সমর্পন করো।

তুমি অবগত আছো, প্রত্যেক মু'মিন মুসলমান এ বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ তা'লা আরশে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে নেমে আসেন। এ বিশ্বাস সত্ত্বেও কোন সমালোচকের সমালোচনা বা কোন কটাক্ষকারীর সেদিকে দৃষ্টি যায় না বরং মুসলমানরা এ বিষয়ে প্রত্যেকেই একমত আর তাদের সাথে কোন মু'মিন এ বিষয়ে বিতর্ক করে না। একইভাবে ফিরিশ্‌তা নির্ধারিত স্থানে অবস্থান সত্ত্বেও পৃথিবীতে অবতরণ করেন। এটি তাঁর অগাধ শক্তির নিগূঢ় রহস্যাবলীর একটি। এসব নিগূঢ় রহস্যই যদি না থাকতো তাহলে কাহ্‌হার (পরাক্রমশালী) খোদাকে চেনা যেতো না। ঊর্ধ্বলোকে ফিরিশ্‌তাদের নির্ধারিত স্থান ও অবস্থান এমন একটি প্রমাণিত বিষয়, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যেখানে খোদা তা'লা তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিবৃতির ভাষায় বর্ণনা করেছেন, وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ *(সূরা আস সাফ্‌ফাত : ১৬৫)* তাঁরা মহাকালের কোন এক মুহূর্ত নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে বলে আমরা কুরআনের কোন আয়াতে খুঁজে পাই না। বরং কুরআন এ দিকে ইঙ্গিত করে, খোদা তাঁদের যে যে স্থানে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা সে স্থান পরিত্যাগ করেন না। একই সাথে তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করেন আর খোদার নির্দেশে পৃথিবীবাসীদের সাথে মিলিত হন এবং বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। কখনও নবীদের সামনে মানুষের রূপধারণ করেন আর কোন সময় তাদের 'আলো'র মত মনে হয়। আবার কখনও দিব্যদর্শনকারীরা তাঁদের বালকের মতো দেখেন আবার কোন সময় দেখেন গোঁফবিহীন যুবকের মত। খোদা তাঁর সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপি শক্তির মাধ্যমে তাঁদের প্রকৃত ও মূল দেহের বাইরে এক নতুন ধরনের দেহ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের দেহ ঊর্ধ্বলোকে বিদ্যমান থাকে আর তাঁরা তাঁদের স্বর্গীয় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হন না, নিজ অবস্থানে স্থির থাকেন। তাঁরা তাঁদের জন্য নিজ নিজ নির্ধারিত স্থান পরিত্যাগ না করেই নবী এবং যাদের প্রতি তাঁরা প্রেরিত হন তাদের কাছে যান। এটি খোদার

রহস্যাবলীর একটি, তাই এতে আশ্চর্য হয়ো না। তুমি কি জানো না, নিশ্চয় খোদা তা'লা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সুতরাং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

ফিরিশ্‌তাদের বিষয়ে লক্ষ্য করে দেখ, কীভাবে খোদা তা'লা তাঁদেরকে নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সদৃশ বানিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের শক্তি এবং ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তৈরী করেছেন। আর এই **'ফায়কুনিয়াত'** শব্দটি প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সিদ্ধান্ত **'কুন ফায়াকুন'** শব্দাবলী থেকে নির্গত। তাঁরা স্ব-স্ব স্থান থেকে সিঙ্গায় ফুৎকার দেন। তাঁরা যাকে চান তাঁকে নিজেদের আহ্বান এবং বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন। এঁদের কেউই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অবস্থানরত প্রত্যেকটি মানুষকে এক নিমিষে কিংবা এর চেয়েও অল্প সময়ে নাগালের মধ্যে আনতে অপারগ নন। তাঁদের কোন এক কাজ অন্য কাজের পথে বাঁধা হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যুর ফিরিশ্‌তাকে লক্ষ্য করে দেখুন, যাকে মানুষের বিষয়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কিভাবে সে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেকের প্রাণ হরণ করে। ধরুন একই মুহূর্তে যাদের মৃত্যু দেয়া হয় তাঁদের একজন সুদূর প্রাচ্যে আর অপর ব্যক্তি পৃথিবীর সবচেয়ে পশ্চিমের কোন দেশে অবস্থান করছে। এখন এই ঐশী ব্যবস্থাপনার ভিত্তি যদি ফিরিশ্‌তাদের আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে বা এক শহর থেকে অন্য শহর বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থান পরিবর্তনের উপর হতো তাহলে এই মানবীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তো আর ঐশী তকদীর ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেক বিপত্তি দেখা দিতো। কোন ফিরিশ্‌তার জন্য যদি সময় নষ্ট না করে বা অভীষ্ট লক্ষ্যে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে যাওয়া সম্ভব না হতো তা হলে অবশ্যই তাঁদের কোন না কোন সময়ে ভর্ৎসনা শুনতে হতো আর নির্ধারিত সময়ে যে কাজ করতে পারেনি তার জন্য অবশ্যই কোন না কোনদিন বিশ্ব-প্রতিপালকের ক্রোধভাজনও হতে হতো এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তিও পেতে হতো। আপনি ভালভাবেই অবগত আছেন, ফিরিশ্‌তাদের অবস্থান ও মর্যাদা এর ঊর্ধ্বে। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সম্পাদিত কর্ম প্রকৃতপক্ষে খোদার কর্মই হয়ে থাকে। এর মাঝে কোন অসামঞ্জস্য নেই। অতএব চিন্তা কর আর উদাসীন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।*

*** টিকা**

সকল সুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির মাথায় স্বাভাবিকভাবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। আর তা হলো, ফিরিশ্‌তারা কি তাঁদেরকে প্রদত্ত নির্দেশাবলী সেই নির্ধারিত সময়ের ভেতর পালন করতে পারে যা তাঁদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার জন্য যথেষ্ট তো নয়-ই

তুমি আবার চিন্তা করে দেখ। দোয়া করি, খোদা তোমায় সাহায্য করুন, আর ঐশী তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার সৌভাগ্য দিন। মহাশূন্য ও পৃথিবীতে বিদ্যমান যাবতীয় জিনিষের তুলনায় ফিরিশ্‌তারা অপেক্ষাকৃত বড়দেহের অধিকারী। যা কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত। কাজেই এতে কোন সন্দেহ নেই তাদের একজনও যদি নিজের বিশাল ও শক্তিশালী দেহ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে তাহলে সমগ্র পৃথিবীকে ঢেকে ফেলবে এবং এর অধিবাসীদের ধ্বংস করে দেবে আর তাকে ধারণ করার মত ক্ষমতা পৃথিবীরও নেই। সত্যিকার অর্থে তাঁদের অবতরণ– রূপক ভাবে হয়ে থাকে। তাঁদের আসল দেহ আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে অবতরণ করে না। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থার দাবী অনুসারে খোদা ধরাপৃষ্ঠে তাঁদের ভিন্ন একটি দেহ সৃষ্টি করেন যা পৃথিবী ধারণ করতে পারে আর এমনভাবে করেন যা দৃষ্টিবানদের দৃষ্টি অনুধাবন করতে পারে। অতএব আমাদের এই কথা যদি বুঝতে হয় তাহলে যথাযথভাবে চিন্তা কর আর তাড়াহুড়ো করো না আর কথা বুঝতে হলে কিছুক্ষণ একটু কষ্ট কর।

আমাদের এই উক্তিটির প্রতি একবার ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকাও আর আমার কথার প্রকৃত মর্ম উদঘাটনের চেষ্টা কর। আমি যা বলছি তা একবার মন দিয়ে শোন এরপর তুমি যা ইচ্ছা করো, গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা একান্তই তোমার। আমাদের কথার সারমর্ম হলো, ফিরিশ্‌তাদের স্থায়ী ঐশী শক্তির ধারক

(চলমান টীকা)

বরং তা তাঁদের নিজ স্থানে প্রথমত দাঁড়াতে গিয়ে ফুরিয়ে যায়? এর উত্তরে যদি বলা হয়, তাঁরা এরূপ করতে পারে, তাহলে অবতরণ একটি বৃথা কাজ আর এটি সময় নষ্ট করার নামান্তর। বরং তা দুর্বলতার লক্ষণ অধিকন্তু তা এক প্রকার অবাধ্যতা ও উদাসীনতাও বটে। যে জেনেশুনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে সে অবাধ্যতা করে। যদি বলা হয় তাঁরা পারে না। তাহলে এর ফলে পৃথিবীতে ফিরিশ্‌তার অবতরণ পর্যন্ত ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য খোদা তা'লার অপেক্ষা করা আবশ্যক হয়ে যায়। বুদ্ধিমানদের সামনে এ কথার ত্রুটি অজানা নয়। কেননা, অপেক্ষা করার সীমাবদ্ধতা খোদার মাঝে থাকতেই পারে না। তাঁর ইচ্ছার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা বা তাঁর পছন্দের পথে কোন বাঁধা এবং অপেক্ষাকারীদের ন্যায় কোন কালক্ষেপণ তাঁর ক্ষেত্রে চিন্তাও করা যেতে পারে না। কেননা সময় এমন একটি বিষয় যা থেমে নেই। এতে সন্দেহ নেই অবতরণের বিষয়টি নিজের স্থানে দাঁড়ানো এবং সর্বজ্ঞানী খোদার কথা শোনা সময়ের অংশ নয়। আপনি ভালভাবেই জানেন, তিনি যখন কোন কিছু করতে চান তখন শুধু বলেন, হও আর তা হয়ে যায়। আপনি কি মনে করেন খোদার ফিরিশতারা মনোবল ও শক্তির দিক থেকে সোলায়মানের সেই দরবারীর চেয়েও দুর্বল, যে নিজের স্থান ত্যাগ না করে, কোন জায়গায় না গিয়ে চোখের পলকে বিলকিসের সিংহাসন উপস্থিত করেছিল। অতএব চিন্তা কর আর বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। (লেখকের পক্ষ থেকে)

ও বাহক হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাঁরা ক্লান্তি, শ্রান্তি ও অবসন্নতার ঊর্ধ্বে। তাঁদের জন্য কোনভাবে সফরের ক্লান্তি, পথ মাড়ানোর শ্রান্তি এবং গন্তব্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছতে গিয়ে কষ্ট পাওয়া বা সময় ব্যয় হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁরা কালক্ষেপণ না করে খোদার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার পরিপূর্ণতার জন্য তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিসেবে কাজ করে। আর তাঁদের অবতরণ ও আরোহণ বিষয়টি যদি মানুষের অবতরণ ও আরোহণের মতো হতো তাহলে আকাশসমূহের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়তো আর এতে যা কিছু আছে সব কিছু বিকল হয়ে যেতো এবং এসব কিছুর জন্য সে খোদা দায়ী হতেন, যিনি প্রতিপালন, সৃজন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁদেরকে তাঁর নিজের জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা হলেন তাঁর কাজের পরিচালনা এবং তাঁর পক্ষ থেকে সব কিছুর সংরক্ষক। তাঁদের কার্য সম্পাদনের নিয়ম হলো, তাঁরা যখন কোন কিছু করতে চান তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে যায়। সুতরাং এখানে সফর করার কথা কোত্থেকে আসলো? আর এক্ষেত্রে দূরত্ব অতিক্রম, স্থানান্তর হওয়া এবং কালক্ষেপণ করে পৃথিবীতে আসার বিষয়টি কোথায় গেলো? কাজেই এ ব্যাপারে কূটতর্ক করো না আর যারা ভয়াবহ উন্মাদনারূপী রাহুর কবলে পড়েছে এবং যারা তাদের উন্মাদনার কারণে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো না।

মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে সে কথাই প্রমাণিত হয়েছে যা ফিরিশ্‌তা বাহ্যিক অবতরণ না করা সম্পর্কে আমাদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, 'ঊর্ধ্বলোকে এক পা ফেলার জায়গাও এমন নেই যেখানে কোন না কোন ফিরিশ্‌তা সেজদা বা কেয়াম না করছে।' আর এই বিষয়ে ফিরিশ্‌তাগণের উক্তি হলো وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ (সূরা আস সাফ্‌ফাত : ১৬৫)।

খোদা তোমার প্রতি করুণা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, এটি এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ ফিরিশ্‌তারা তাঁদের স্থান পরিত্যাগ করেন না। যদি তা না হয় তাহলে এ কথা বলা কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন ফিরিশ্‌তা নেই। ফিরিশ্‌তারা যদি বাহ্যত পৃথিবীতে আসেন তাহলে এ অবস্থা কীভাবে বজায় থাকতে পারে? তুমি কি বিশ্বাস কর না জিব্রাইলের দেহ এমন যা পূর্ব ও পশ্চিমকে ছেয়ে ফেলেছে? এই বিশাল দেহসহ জিব্রাইল যদি পৃথিবীতে অবতরণ করেন আর আকাশ তাঁর দেহশূন্য হয়ে যায় তাহলে সে স্থানের কথা চিন্তা কর যা শূন্য হয়ে যাবে। আর একই সাথে 'মাওযিয়া কাদামিন' (ঊর্ধ্বলোকে এক পা সমান জায়গাও এমন নেই যেখানে কোন না কোন ফিরিশ্‌তা সেজদা বা কেয়াম না করছেন) সংক্রান্ত হাদীস নিয়ে

ভাবো এবং বিনয় অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

আবার তুমি যদি লাইলাতুল কদর সূরা সম্পর্কে চিন্তা কর তাহলে তোমার মনে এর চেয়েও বেশী অনুশোচনা ও আক্ষেপ সৃষ্টি হবে কেননা খোদা এ সূরায় বলেন, এ রাতে ফিরিশ্‌তা ও রুহুল কুদুস তাঁদের প্রভুর নির্দেশে নাযিল হন আর প্রভাত উদিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থান করেন। সমস্ত ফিরিশ্‌তা যদি এ রাতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন তাহলে তোমার বিশ্বাস অনুসারে তাঁদের অবতরণের পর পুরো আকাশ খালি হয়ে যাবার কথা! আর এটি হাদীস **'মাওযিয়া কাদামীন'** অনুসারে বলছি। অতএব প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার পথে অগ্রসর হয়ো না। অথচ তুমি ভালভাবেই জানো, সত্য ও ভ্রষ্টতা উভয়েই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে গেছে। তুমি আমাদের এমন কোন হাদীস বের করে দেখাতে পারবে না যা এ দিকে ইঙ্গিত করে, ফিরিশ্‌তার নাযিল হবার পর আকাশ শূন্য হয়ে যায়। অতএব খোদা ও রসূলের সামনে ধৃষ্টতা দেখাবে না। আর যে বিষয়ের তোমার কোন জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করবে না, নইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃসঙ্গ থেকে যাবে আর পথ হারিয়ে বসবে।

যারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথ সন্ধান করে তারা নিজেদের কথা ও কাজে হঠকারিতার আশ্রয় নেয় না। যখন তাঁরা বুঝেন তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। তুমি তাঁদের চোখ থেকে তখন অশ্রুধারা বইতে দেখবে। তাঁরা বলেন, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয় আমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলাম। তাঁদের প্রভু তাদের ক্ষমা করেন আর দয়া ও অনুগ্রহ পরবশ হয়ে তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারী ও পবিত্রতা সন্ধানীদের ভালোবাসেন। নিশ্চিত জেনো! আল্লাহ্ ও তাঁর সেই রসূল (সা.) যাঁকে গভীর অর্থবোধক ভাষা দান করা হয়েছে– তাঁরা উভয়েই কথার মাঝে ব্যাপকভাবে রূপকের ব্যবহার করেছেন। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে চিন্তা করে না সে এ বিষয়ে ভুল করে। একইভাবে সে ব্যক্তিও ভুল করে যে সময়ের পূর্বেই এর ব্যাখ্যা করে আর আক্ষরিক বিষয় না হওয়া সত্ত্বেও এর বাহ্যিক অর্থ করে এবং হাত দেয়ার সময় হবার আগেই এতে হাত দিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে হয় সে নিজ ভুলে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, অন্যথায় আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা তার সুরক্ষা করে এবং সে পরিণতিতে চক্ষুষ্মানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

খোদার চিরাচরিত রীতি হলো, প্রায়শঃ তাঁর ভবিষ্যত সংক্রান্ত সংবাদ রূপক কথায় সজ্জিত–সূক্ষ্মতত্ত্বের এমন কিছু অনুষঙ্গ থাকে, যার মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে খোদা তা'লার নিয়মের অধীনে এ

পরীক্ষার কারণে তাদের রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা ত্বরাপ্রবণতা বশতঃ খোদার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যবশত সেই ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যাঁকে খোদা তা'লা স্বীয় জ্ঞান দান করেছেন আর খোদার ভয়ে ভীতদের মত চিন্তা করে না। এরপর যখন তাঁর নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত হয় আর তাঁর সত্যতার সমুজ্জ্বল প্রমাণ প্রকাশ পায় তখন তারা হয় অনুশোচনার সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা বিদ্বেষের গহ্বরে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় আর তাদের কাছ থেকে খোদা মুখ ফিরিয়ে নেন। কেননা, খোদা বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন। আর যাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়েছে এবং খোদার পক্ষ থেকে আলোকিত করা হয়েছে এমন মানুষ ঐশী জ্ঞান চর্চায় দক্ষতা রাখেন আর প্রকৃত তত্ত্ব চিনেন, খোদার জ্যোতিতে দেখেন আর খোদার নিরাপত্তার ছায়াতলে আশ্রিতদের মত সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সৌভাগ্য পান।

এখন আমাদেরকে প্রথম কথার দিকে ফিরে যেতে হবে আর আমরা বলবো খোদা তা'লা তাঁর দ্ব্যর্থহীন গ্রন্থে বলেন, اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (সূরা আত্ তারেক: ৫)। যেক্ষেত্রে ফিরিশ্তারা নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, আরশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর তত্ত্বাবধান করছে এবং সেক্ষেত্রে এক মুহূর্তের জন্যও যেগুলোর সংরক্ষণের দায়িত্বে তারা নিয়োজিত তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব। লক্ষ্য কর! এর মাধ্যমে কীভাবে প্রকৃত বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে গেল! আর কিভাবে বাহ্যিক দেহসহকারে তাঁদের অবতরণ ও আরোহণের যারা দাবী করে তাদের সকল দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হলো! কাজেই আমরা যেসব সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা লিখেছি তা গ্রহণ না করে পলায়নের আর কোন রাস্তা নেই অর্থাৎ ফিরিশ্তা আক্ষরিক অর্থে অবতরণ করেন না আর সফরের ক্লান্তি ও শ্রান্তিও তাঁদের স্পর্শ করে না। বরং আল্লাহ্ যখন তাঁদেরকে মানুষের মাঝে দেখাতে চান তখন পৃথিবীতে তাঁদের জন্য এক ধরনের অস্তিত্ব সৃষ্টি করেন। তাঁদেরকে সেই চোখই কেবল দেখে যা কাশফের বাগানে বিচরণে অভ্যস্ত। এমনটি যদি না হতো তাহলে ফিরিশ্তা যখন রূহ্ কবজ করা বা অন্য দায়িত্ব পালনে পৃথিবীতে আসেন তখন অবশ্যই সব মানুষ তাঁদের দেখতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তখন তার সকল নিকটাত্মীয়ের বা যাদের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধন আছে অথবা পিছনে রেখে যাওয়া আত্মীয়স্বজন এবং তার গোত্র বা বন্ধুবর্গ প্রত্যেকেরই চোখের সামনে মৃত্যুর ফিরিশ্তাকে দেখতে পাবার কথা। কেননা ফিরিশ্তা বাহ্যিক দেহসহ অবতরণ করলে তাদের অপরাপর দৈহিক বস্তুর মতই না দেখার কোন কারণ নেই। আপনি জানেন, আমাদের চোখের সামনে অনেক জীব মারা যায়। আর আমরা তাদের অন্তিম মুহূর্তে বা মৃত্যুর যন্ত্রনা ও ঘোরের সময় সেই

ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখি না– যিনি তাদের মৃত্যু দেন আর তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে কি জিজ্ঞেস করে আর কি কথা বলে তাও আমরা শুনতে পাই না। সত্যকথা হলো, এ বিষয়টি এবং অনুরূপ বিষয়াবলী রূপক জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে যার রহস্য খোদা তা'লা মানবীয় বোধবুদ্ধি ও মানুষের দৃষ্টির কাছে প্রকাশ করা পছন্দ করেননি। আর দিব্য জগতের ঘটনাবলীর উদাহরণ অনেক আছে যার একটি হলো, ফিরিশ্‌তাদের অবতরণ এবং হাদীসে অনেক বিবরণও রয়েছে যেমন, মু'মিনের কবর জান্নাতের একটি উদ্যান বা জাহান্নামের গহ্বরগুলোর একটি। আর এ কথাও কোন হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনের জন্য তাঁর কবরে জান্নাতমুখী একটি কক্ষ খুলেন আর কাফিরের জন্য জাহান্নামমুখী একটি কক্ষ খুলেন। কিন্তু আমরা কখনও কখনও কবর যিয়ারত করি বা কবরের মাটিও খুঁড়ে থাকি কিন্তু জান্নাত বা জাহান্নাম অভিমুখী কোন কক্ষ দেখতে পাই না। সেখানে বাগান তো দূরের কথা একটি বৃক্ষও দেখি না। দগ্ধকারী প্রজ্জলিত অগ্নি দূরে থাক একটি জ্বলন্ত অঙ্গারও দেখি না। প্রশ্নোত্তরের সময় যেভাবে সেখানে মৃতের বসে থাকা বা জীবন সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে আমরা সেখানে মৃত্যুর পর কোন মৃত ব্যক্তিকে বসে থাকতে বা জীবন যাপন করতে দেখি না বরং আমরা কাফনে আবৃত এমন মৃতদেহ দেখি যার মাংস ও কাফনকে মাটি খেয়ে ফেলেছে। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে শহীদদেরকে পবিত্র ফলফলাদি, দুধ ও পানীয় দেয়া হয়। কিন্তু তাঁদের সেই কবর যা জান্নাতের বাগানগুলোর অন্তর্গত তাতে আমরা কোন ফল, সুগন্ধি বা কোন দুধ বা মদের পান পাত্র দেখি না। অনেক সময় লাশ কয়েকদিন পর্যন্ত দাফন করা হয় না কিন্তু কৈ আমরা লাশের কাছে ফিরিশ্‌তার আনাগোনাতো দেখি না। অথচ আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, ফিরিশ্‌তা কাফিরদের চেহারায় আঘাত করবে কিন্তু আমরা কোন মারমুখী ফিরিশ্‌তা বা প্রহারের কোন চিহ্ন দেখি না আর প্রহৃতের চিৎকারও শুনি না।

কোন কোন হাদীসে দেখা যায়, যখন দুধের শিশু দুধের বয়স পার হবার পূর্বে মারা যায় তার দুধের দিন কবরেই পুরো হবে। কিন্তু কৈ? আমরা তো কবরে কোন ধাত্রী মাকে বসে থাকতে এবং কোন শিশুকে তার দুধ পান করতে দেখি না! কোন কোন হাদীসের বর্ণনানুসারে, মু'মিনের কবর এত বা এত পরিমাণ প্রশস্ত করা হয়, কিন্তু আমরা এমন কোন প্রশস্ততার চিহ্ন দেখতে পাই না বরং প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ছাড়াই আমরা সেটাকে কাফিরের কবরের মতই দেখতে পাই। এগুলোকে কীভাবে বাহ্যিক হিসেবে দাবী করতে পারি, অথচ এর কোন লক্ষণও দেখি না। একইভাবে বলা হয়, শহীদরা জীবিত,

তাঁরা পানাহার করেন কিন্তু জীবিতদের ন্যায় তাঁদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত ও কবর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আপন গৃহে ফিরে আসতে দেখি না। এ বিষয়গুলো অর্থাৎ ফিরিশ্তার অবতরণ, মু'মিনের কবর প্রশস্ত হওয়া, এতে বাগান থাকা, মৃতদের কবরে উঠে বসা, এছাড়া কুরআন ও হাদীসে যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায় তা যদি রূপক বিষয় না হয়ে এ পৃথিবীর আক্ষরিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হতো তাহলে আমরা এ পৃথিবীর অন্যান্য জিনিষের মত এগুলোও দেখতাম। তুমি জানো, আমাদের কেউ এ পৃথিবীর অপরাপর জিনিষ যেভাবে দেখে এগুলোকে সেভাবে দেখে না। আমরা এ পৃথিবীর বৃক্ষরাজি এবং বাগান দূর থেকে দেখি আর এর ফল ডাল-পালা ঝুলন্ত দেখি কিন্তু আমরা একজন শহীদের কবর খুঁড়লে তাতে এর কোন লক্ষণ দেখি না। অথচ আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি, তাঁদের কবর বিভিন্ন নিয়ামতে পরিপূর্ণ আর সর্ব প্রকার সুগন্ধিতে সুরভিত, তাঁদেরকে তাসনীমের (জান্নাতীদের জন্য নির্ধারিত এক প্রকার পানীয়) পানীয় পরিবেশন করা হয়। আর প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত করা হবে। আর এগুলোতে জান্নাতের বাগানগুলোর একটি উদ্যান, দুধ ও ঐশী মাদকতা সৃষ্টিকারী পানীয়ের পানপাত্র বিদ্যমান। কিন্তু আমরা আমাদের চর্মচোখে এসবের কিছুই দেখি না এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও তা অনুভব করি না। তাই আমাদের জন্য এর ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এজন্য আমরা বলেছি, এ সব বৃত্তান্ত অর্থাৎ ফিরিশ্তাদের অবতরণ ও জান্নাতে আগমন প্রভৃতি একটি সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় যার একটির সাথে আর একটি তুলনাযোগ্য। কিন্তু নি:সন্দেহে কোন বিরোধ ও পার্থক্য ছাড়া এর স্বরূপ এক ও অভিন্ন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই, এগুলো একই সূত্রে গাঁথা। অতএব বিবেক খাটাও, তাহলে আপত্তিকারীর আপত্তি হতে রেহাই পাবে। আর সেসব লোকদের প্রতি আকর্ষিত হবে না যারা অন্যায় করেছে আর হেদায়াত এবং ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে যাবার পরও হীন ও ভ্রান্ত পথ বেছে নিয়েছে। বরং তুমি সে বক্তব্যকে অনুসরণ করো যা বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে খুলে দিয়েছে আর অজ্ঞদের অন্ধ অনুসরণের চাদরকে সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। কোন ব্যক্তির তিরস্কার বা মিথ্যা অজুহাতের ধার ধারবে না। সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হও যারা খোদার আনুগত্যের জন্য সদা সোচ্চার ও সচেতন।

তোমার জন্য এ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক, ফিরিশতাদের অবতরণ, কবরে মৃতদের জীবন ফিরে পাওয়া, কবরে তাদের উঠে বসা আর এতে জান্নাত এবং জাহান্নামের অস্তিত্ব এ জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় নয় বরং ইন্দ্রিয়ানুভূতির গন্ডির ঊর্ধ্বে এবং তা ভিন্ন জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে। এসবকে ইহজাগতিক

ঘটনাবলী হিসেবে গণ্য করা বা ইহজগতের ঘটনাবলীর নিরিখে তার পরিমাপ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে উচিত হবে না বরং তা বস্তুজগতের রীতি-নীতি এবং নাগালের উর্ধ্বে। এর স্বরূপ খোদা তা'লা ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই এ প্রসঙ্গে নিজের পক্ষ হতে কোন কথা বলতে যেও না আর সীমালঙ্ঘন করো না।

তুমি ভালভাবে জানো, ফিরিশ্‌তাদের আরোহণ ও অবতরণ যে মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কিতাবে একথা বলেননি । বরং তাঁর দ্ব্যর্থহীন গ্রন্থের অনেক স্থানে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, ফিরিশ্‌তার অবতরণ ও আরোহণ তাঁর অবতরণ ও আরোহণের মত একটি বিষয়। একথা তোমার অজানা নয়, আল্লাহ্ তা'লা রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন। কিন্তু এর অর্থ এরূপ করা সমীচীন হবে না, তিনি যখন অবতরণ করেন তখন আরশ খালি থেকে যায়। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর গ্রন্থে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাসহ মেঘমালার ছায়ায় অবতরণের কথা বলেছেন। অতএব আল্লাহ্ যখন তাঁর সকল ফিরিশ্‌তাসহ পৃথিবীতে আসেন আর এই আগমন যদি দৈহিক হয় তাহলে তোমাকে মানতেই হবে, আরশ্ এবং আকাশসমূহ সেদিন খালি থেকে যাবে। তাতে রহমান খোদা এবং ফিরিশ্‌তা কেউ থাকবে না। অতএব তুমি উপদেশ গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে উপদেশ গ্রহণ কর। আর আমাদের বক্তব্য সুদৃষ্টিতে দেখ। যদি তুমি সত্যান্বেষী হও তাহলে জ্ঞানের কথা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকো।

তুমি কি মনে কর উর্ধ্বলোক অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না? কোন সময় ফিরিশ্‌তায় পরিপূর্ণ থাকে আর তাঁদের সমবেত হবার কারণে ভরে যায়। আবার কখনও কখনও এমনভাবে খালি হয়ে যায় যখন সেখানে কেউ থাকে না? যদি তুমি এ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে সত্যায়ন কর আর ফিরিশ্‌তার সশরীরে অবতরণের প্রতি জোর দাও তাহলে তোমার উচিত কুরআন এবং হাদীসের আলোকে নিজ দাবীর সত্যতা প্রমাণ করা বা মুত্তাকীদের ন্যায় অনুতপ্ত হওয়া।

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিব্রাঈল হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে ত্রিশ বছর অবস্থান করেছেন আর এক মুহূর্তের তরেও তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করেননি। আর অপরাপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে উর্ধ্বলোকে অবস্থান করা ছাড়া ওহীর নির্দেশ লাভ করে না। সে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ওহী লাভ করে তারপর অন্যদের অবহিত করে। অতএব আক্ষরিক অর্থে নিলে এটি তোমার জন্য আরেকটি সমস্যা। তুমি কখনও এই হাদীসগুলোর ভেতর সামঞ্জস্য এবং মিল সাব্যস্ত করতে পারবে না ।

তোমার মনে হয়তো একটি সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে আর তুমি হয়তো বলতে পারো, ফিরিশ্‌তা অবতরণের পর আমি আকাশ শূন্য রয়ে যাওয়াতে বিশ্বাসী নই। তোমার কথার উত্তর হলো, তুমি তোমার পূর্বের বিশ্বাস ভুলে গেছো। তুমি কি ফিরিশ্‌তারা সশরীরে নাযিল হয় বলে বিশ্বাস করতে না? তোমাদের এ বিশ্বাসের দরুন তাঁদের প্রকৃত দেহসহকারে অবতরণ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। তুমি জানো, তাঁদের সশরীরে নাযিল হবার আবশ্যকীয় ফলাফল হলো, আকাশ খালি হয়ে যাওয়া। আর তোমার বিশ্বাস যদি বলে, ফিরিশ্‌তারা তাঁদের আসল দেহসহ অবতরণ করে না বরং আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে পৃথিবীতে আরেকটি দেহ দান করেন যা অনুভবও করা যায় না আর দেখাও যায় না। তাহলে জেনে রেখো, আমরাও একই বিশ্বাস পোষণ করি। কিন্তু যদি তুমি প্রকৃত দেহ নিয়ে অবতরণে জোর দাও তাহলে এটি এমন একটি বিশ্বাস যা পবিত্র কুরআন বিরোধী। কেননা, কুরআন ফিরিশ্‌তাদের অস্তিত্বকে ঈমানের আবশ্যকীয় অঙ্গগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে এবং আকাশে তাঁদের নির্ধারিত স্থানের কথা উল্লেখ করে অর্থাৎ, সেই স্থান যেখানে খোদা তাঁদের দাঁড় করিয়েছেন। তিনি একথা বলেননি, তাঁরা কোন সময় তাঁদের স্থান পরিত্যাগ করে। তাঁদের অবতরণ সম্পর্কে স্মরণ রাখবেন, তাঁদের অবতরণের বিষয়টি খোদার অবতরণের মত একটি বিষয় আর এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাঁদের কতক সারিবদ্ধভাবে (ইবাদতে নিমগ্ন) আছে আবার তাঁদের আরেক দল খোদার পবিত্রতার গুণগানে রত, তাঁদের একাংশ রুকুতে আর তাঁদের অপরাংশ সেজদারত আর কুরআনের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁদের অনেকে সদা দন্ডায়মান। অবসর লোকদের মতো তাঁদের কেউ বসে থাকে না।

অতএব তাঁদের কেউ যখন সশরীরে অবতরণ করেন তখন তাঁর নিজ স্থান ছেড়ে দেয়া, সারি থেকে বেরিয়ে আসা আর খোদা তাঁকে তসবীহ্ বা রুকু বা সিজদা যে কাজেই দাঁড় করিয়েছেন সেখান থেকে দূরে সরে আসা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর পৃথিবীতে তিনি মুসাফিরের ন্যায় অবতরণ করেন। কুরআনে আমরা এ শিক্ষার কোন চিহ্ন দেখি না বরং খোদা তা'লা ফিরিশ্‌তাদের অবতরণকে তাঁর নিজের অবতরণের মত আখ্যায়িত করেছেন আর তাঁদের আগমনকে তাঁর নিজের আগমনের ন্যায় আখ্যায়িত করেছেন। তুমি কি আল্লাহ্‌র বাণী
وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (সূরা ফজর : ২৩) এবং তাঁর বাণী -
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (সূরা বাকারা : ২১১) এসব আয়াত লক্ষ্য করনি। এখানে

আরেকটি সূক্ষ্ম কথা নিহিত। আর তা হলো–খোদা তা'লা যখন ফিরিশ্‌তাসহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন সকল ফিরিশ্‌তার অবতরণ করা আবশ্যক। ফিরিশ্‌তারা খোদার সেনা দল। তাই আরশের অধিপতি খোদা যখন পৃথিবীতে আসেন তখন তাঁদের কারো পিছিয়ে থাকা সম্ভবই নয়। অতএব যখন এটি নির্ধারিত হয়ে গেল তখন এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা দাঁড়াবে তাহলো, আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে আগমনের কারণে আরশ থেকে নিম্ন আকাশ পর্যন্ত খালি হয়ে যাবে! তাতে দয়ালু ও আরশের অধিপতি প্রভু এবং কোন ফিরিশ্‌তা থাকবে না! যুক্তি যেহেতু ভ্রান্ত তাই তার ফলাফলও তদ্রূপই হবে আর একথা চিন্তাবিদদের অজানা নয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরপর যদি আমরা ধরে নেই, পৃথিবীতে এক লক্ষ নবী এসেছেন, যাঁদের কতক পূর্বে আর কতক পশ্চিমে, যাঁদের কতক দক্ষিণের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসেছেন আর কতক সুদূর উত্তরাঞ্চলীয় দেশে আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা জিব্রাঈলকে তাঁদের সবার প্রতি একই সময়ে এমনভাবে ওহী পৌঁছানোর নির্দেশ দেন– যেন তাঁদের কেউ এগিয়ে বা পিছিয়ে না থাকে। অথবা আমরা যদি ধরে নেই, আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুর ফিরিশ্‌তাকে নির্দেশ দেন, তুমি পূর্বে ও পশ্চিমে বসবাসরত এক লক্ষ মানুষকে একই নিমিষে মৃত্যু দাও, আগে পরে যেন না হয়। তোমার কি ধারণা? জিব্রাঈল বা মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা যদি পূর্বে অবস্থান করে তাহলে পশ্চিমের দায়িত্ব পালন করতে অপারগ থাকবে নাকি পূর্বে থাকলেও পশ্চিমের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে? যদি পারে, তাহলে একইভাবে আকাশ হতে অবতরণ ছাড়াই সে– অবতরণ কারীদের মতই যা চাইবে তা করতে সক্ষম হবে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত আছে, আমরা তোমার কাছে যার উত্তর চাই। তাহলো, মৃত্যুর দূত মহামারীর যুগে রূহ্ কবজ করার জন্য প্রাচ্যের কোন বড় দেশে আসে বা নাযিল হয় আর সেখানে অনবরত ও অব্যাহতভাবে ব্যাপক হারে মৃত্যুর কারণে দু'মাস তার অবস্থানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এক ব্যক্তির রূহ্ কবজ না করতেই আরেকজনের রূহ কবজ করার সময় হয়ে যায়, উপর্যুপরি এই ধারা তাঁকে সেখানেই ব্যস্ত রাখে। নাগরিকদের রূহ কবজ না করে সেই দেশকে এড়িয়ে যাওয়া তার জন্য অসম্ভব আর এই কারণেই সে সেখানে অবস্থান করে আর তাঁর অবস্থান সেখানে দু'মাস দীর্ঘ হয়ে যায়। একই সময় পশ্চিমা দেশে তখন যাদের মৃত্যুর সময় হয়ে আসে, তাদের কী হবে? কেননা মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তাদের কাছে নির্ধারিত সময় পৌঁছতে পারেনি। তারা কি রূহ্ কবজকারী পৌঁছার পূর্বেই মারা যাবে? নাকি মৃত্যুর তীর–তাদের রূহ্ কবজে ব্যর্থ হবে? সত্যবাদী হয়ে থাকলে,

তাহলে আমার কথার উত্তর দাও? তোমার বক্তব্য অনুযায়ী একথা বলা যাবে না, মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা পূর্বদিকে অবস্থান করেও পশ্চিমা লোকদের রূহ্ কবজ করতে পারে। কেননা, তাহলে আমরা বলবো , যদি এমন কাজ সে করতে পারে অর্থাৎ পূর্বে থেকেও পশ্চিমের দায়িত্ব পালন করতে পারে তাহলে আকাশ থেকে অবতরণে কেন সে বাধ্য হবে? কেননা, তার পৃথিবী পরিভ্রমণের কোন প্রয়োজন নেই।

যেক্ষেত্রে তুমি মানলে এবং স্বীকার করলে, কোন ফিরিশ্‌তা একটি বিশেষ দেশে অবস্থান করেও সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর কার্য সম্পাদন করে বেড়াতে পারে এবং তাঁর এক কাজ অন্য কাজে বাঁধ সাধে না। যে পশ্চিমে থেকেও একই সময় পূর্বের লোকদেরকে মৃত্যু দিতে পারে। সেখানে তোমার একথা বলতে অসুবিধে কোথায়, ফিরিশ্‌তা আকাশে থাকা সত্ত্বেও খোদার ইচ্ছায় পৃথিবীর কার্য সমাধা করে? তারা যেখানে পৃথিবীর এক স্থানে থেকে অন্য স্থানের লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সমাধা করতে পারে সেখানে তাঁদের আকাশ হতে অবতরণের এমন কি আবশ্যকতা থাকতে পারে?

তুমি আমাদের কাছে যদি এমন কোন দৃষ্টান্ত চাও যার মাধ্যমে তোমার সামনে আমাদের বিশ্বাস স্পষ্ট হতে পারে তবে এক্ষেত্রে তুমি জেনে রেখো, উপমা এবং উদাহরণ প্রদানের চেয়ে বড় একটি বিষয় এটি। আনুমানিকভাবে বলা যেতে পারে সুনির্দিষ্টভাবে নয়। পৃথিবীতে ফিরিশ্‌তার অবতরণের বিষয়টি আকাশের নক্ষত্রের মতো বিষয় যার আকৃতি সমুদ্র, নদী, চৌবাচ্চা বা সেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয় যা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সত্য কথা হলো, 'নুযুল' বা অবতরণের বিষয়টি যুক্তি ও উপমা প্রদানের চেয়েও ঊর্ধ্বের একটি বিষয়। এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে একটি নতুন সৃষ্টি– যিনি প্রত্যেক সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অবহিত। আর মানব দৃষ্টি তাঁর প্রজ্ঞার গভীরতা ও রহস্যের নাগাল পায় না। কাজেই ফিরিশ্‌তার অবতরণকে মানুষের অবতরণের সাথে তুলনা করা বোকামী এবং ভ্রষ্টতা আর একে অস্বীকার করা খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর। আর সেই ফিরিশ্‌তাদের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অর্থ নিরূপণ করা, যারা আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ–পূর্ণ মারেফত ও সঠিক পথ প্রাপ্তির পরিচায়ক, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং সমস্ত নেক বান্দাদের দান করেছেন।

এ হলো, নুযুলের সর্বোত্তম তা'বীর বা ব্যাখ্যা যা অধিকাংশ মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। অতএব, কৃতজ্ঞতার সাথে তা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর। এসব এমন

জ্ঞান যা খোদা তা'লা আমার হৃদয়ে ফুৎকার করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমার হৃদয়কে প্রশান্ত করেছেন। এটি সে প্রশান্তি যা মুহাদ্দাসদের মুখে তখন প্রকাশ পায় যখন আল্লাহ্ তাদের অস্বচ্ছ ভাবনা এবং ধারণা নিরসনের চাহিদা অনুভব করেন। অতএব তুমি যদি দৃঢ়বিশ্বাস লাভের পথ সন্ধানী হলে এ নিয়ে চিন্তা করো আর একে পাশ কাটিয়ে যেও না। এ সকল রহস্যের উদ্ঘাটনকল্পে খোদা তা'লা আমাকে ইমাম নিযুক্ত করেছেন যদিও প্রকৃতিগতভাবে নেতৃত্বের প্রতি আমার ভেতর অনিহা ও ঘৃণা কাজ করতো। কিন্তু যাকে মিথ্যাবাদী, অভিশপ্ত ও কাফির আখ্যা দেয়া হয়েছে তার প্রতি কৃপা ও সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ তিনি এমনটি করেছেন, আর শত্রুদেরকে দেখাতে চেয়েছেন, তারাই মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। মানবপ্রকৃতি যে জ্ঞানের প্রকাশ দেখতে চেয়েছে, যুগের মানুষকে সেই জ্ঞান দান করাই হলো এর মূখ্য উদ্দেশ্য। খোদা যা চান তা-ই করেন। তাঁর কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন অধিকার মানুষের নেই বরং তারাই জিজ্ঞাসিত হবে।

সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিয়েছেন, আমাকে গ্রহণ করেছেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে লালন-পালন করেছেন আর আমাকে নিজের পক্ষ থেকে সুস্থ বুদ্ধি ও সঠিক চিন্তাধারা দান করেছেন। অনেক জ্যোতি আমার হৃদয়ে সঞ্চার করা হয়েছে যার কল্যাণে কুরআনের সেই জ্ঞান আমি লাভ করেছি যা অন্যরা জানে না আর তাঁর পক্ষ থেকে আমি তা পেয়েছি যা আমার বিরোধীরা বুঝতেও পারে না। আর এর বুৎপত্তির ক্ষেত্রে আমি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছি অধিকাংশ মানুষের চিন্তা-ভাবনাই সেখানে পৌঁছতে পারে না। এটি নিছক তাঁর অনুগ্রহ বিশেষ এবং তিনি শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।

তাদের একটি আপত্তি হলো, আমার বই **'তৌযীহে মারাম'** পড়ে তারা এতে লিপিবদ্ধ দেখতে পেয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রে এমন কিছু প্রভাব আছে যার মাধ্যমে খোদা পৃথিবীর যাবতীয় উপকরণের লালন-পালন করছেন। এই ভিত্তিতে আমার বিরুদ্ধে তারা আপত্তি করে বসলো, এটি এমন একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস যা হাদীসের বক্তব্য বিরোধী। আক্ষেপ! তাদের জন্য, তারা হাদীসের অর্থ বুঝতে পারেনি আর আমার কথার মর্মও বুঝেনি। উপরন্তু তড়িঘড়ি করে কুধারণার আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু পুণ্যবানদের আচরণের ন্যায় তারা আমার কাছে আমার কথার অর্থ জানতে চায়নি। বরং তারা অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে মুরতাদ ও কাফির আখ্যা দিয়েছে এবং অনেক জঘন্য কথাবার্তা বলেছে। তারা অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে কেবল নিজেদের নোংরামী ও অজ্ঞতাই প্রকাশ

করেছে। এতে তারা শুধু নিজেরাই নগ্ন হয়েছে কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতার খবর এরা রাখে না।

হে গভীর দৃষ্টিপাতকারী ও প্রখর দৃষ্টির অধিকারীগণ! স্মরণ রাখবেন যে আমরা আমাদের বইতে এমন কিছু লিখিনি যা কুরআনের আয়াত ও হাদীস বিরোধী। এমন কোন বিষয়ে আমরা কস্মিনকালেও মুখ খুলিনি আর খোদা তা'লা আমাদেরকে এমন গর্হিত কাজ করা থেকে নিরাপদে রেখেছেন, কিন্তু তারা কোন কিছু বুঝার আগেই আপত্তি করে বসে। আর নিজেরা হেদায়াত পাবার পূর্বেই আমাদেরকে অজ্ঞ মনে করে। আমরা সব কিছুকে সাক্ষী রেখে বলছি আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন, আমরা কখনও চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রের কোনটি নিজ কর্মে স্বাধীন বা নিজগুণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে বিশ্বাস করি না। অথবা আমরা একথাও মানি না, প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এর কোন কর্তৃত্ব আছে বা আলো দান, বৃষ্টি বর্ষণ, পদার্থ ও বস্তুনিচয় এবং ফলফলাদির প্রতিপালনে এর প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা আছে। আর আমরা এ বিশ্বাসও রাখি না, এসব উজ্জ্বল গ্রহ নক্ষত্রের কোনটি আমাদের কল্যাণ সাধনের কারণে প্রশংসা কীর্তন বা ইবাদতের যোগ্য অথবা বিশ্ববাসীর উপর তাদের বিন্দুমাত্র কোন অনুগ্রহ বা ইহসান রয়েছে বা তা মানুষের দোয়া শুনতে পায় বা প্রশংসাকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়। যে আমাদের প্রতি এ বিষয়গুলো হতে কোন একটি অপবাদও আরোপ করবে সে অন্যায় করবে। খোদা ভালভাবে জানেন এমন ব্যক্তি মিথ্যা রটনাকারী ও চরম মিথ্যাচারী। সে প্রকাশ্য নির্লজ্জতা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয় আর প্রতারকদের রীতি অবলম্বন করে।

বরং আমরা ঈমান রাখি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ তা'লা এক অদ্বিতীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বনির্ভরস্থল। তাঁর মহান সত্তা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁর কোন অংশীদার নেই। যে ব্যক্তি আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুকে খোদার সাথে শরীক করে, আমাদের দৃষ্টিতে সে কাফির ও মুরতাদ এবং ইসলাম পরিত্যাগী এবং পৌত্তলিকদের অন্তর্ভুক্ত।

এতদসত্ত্বেও আমরা এ বিশ্বাস রাখি, বস্তুনিচয়ের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বাস্তব ও সত্য বিষয়। আর সর্বজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাশীল সেই খোদার ইচ্ছায় এগুলিতে অনেক প্রভাব বিদ্যমান যিনি কোন কিছু বৃথা সৃষ্টি করেননি। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, মশা-মাছি, উকুন ও রেশমের কীটসহ প্রত্যেক বস্তুর কোন না কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা খোদা তা'লা সৃষ্টি করেছেন। অতএব এটি আমরা কীভাবে ভাবতে পারি সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রের সৃষ্টি এসবের তুলনায় তুচ্ছ আর এ সবের

প্রকৃতিতে কোন বিশেষত্ব বা এগুলোতে মানুষের জন্য কোন উপকারিতা নিহিত নেই। বা এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই অথবা খোদা তা'লা এসব বৃথা ও অর্থহীন বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করেছেন? খোদা বান্দাদের জন্য এতে সামান্য উপকারিতা নিহিত রাখা ছাড়া তেমন কোন বৈশিষ্ট্যই সৃষ্টি করেননি যা অন্য অনেক বস্তু দ্বারাও পূর্ণ হতে পারে যেমনটি নক্ষত্রের সৃষ্টি সম্পর্কে তুমি নিজেই দাবী করে থাকো, এগুলো যে মুসাফিরদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে দিক নির্দেশক তা তুমি অবগত আছো। মানুষ নিজেদের জন্য অর্থাৎ সড়ক ও নৌ পথে স্বীয় সফরের জন্য অন্য অনেক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে যা এখন আর তাদেরকে নক্ষত্রের মুখাপেক্ষী রাখেনি। তাদের এখন প্রকৃতপক্ষে এমন দিক নির্দেশকের আর প্রয়োজন নেই। অতএব তুমি যদি ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকো তাহলে তোমার এ কথা বলা আবশ্যক, মানুষ এখন আর সফরের জন্য পথনির্দেশিকা হিসেবে গুটিকতক নক্ষত্র ছাড়া সকল নক্ষত্রের উপর নির্ভর করে না। আর রইল নক্ষত্ররাজির বিষয়টি, এর সংখ্যা এত বেশী যে, তুমি গণনা করেও শেষ করতে পারবে না। অতএব মুসাফিরদের এর প্রয়োজন কি? তোমরা যদি স্পষ্টভাষী হও তাহলে পরিষ্কার করে কথা বল, পুরস্কৃত হবে। আর যদি স্পষ্টভাবে কথা বলতে না পারো যা তোমরা কখনও পারবে না– তাহলে খোদাকে ভয় কর, যিনি মিথ্যাচারীদের ভালোবাসেন না।

তুমি কীভাবে ভাবতে পারো আল্লাহ্ তা'লা নক্ষত্ররাজিকে নিরর্থক সৃষ্টি করেছেন, এগুলোতে বিস্ময়কর সব প্রভাব সৃষ্টি করেননি অথচ আমরা তাঁর অতি ক্ষুদ্রাকার সৃষ্টির মাঝেও গভীর প্রভাব বা কার্যকারিতা লক্ষ্য করি। আমরা কীভাবে বিশ্বাস করবো খোদা তা'লা যেখানে এসব আলো বিচ্ছুরণকারী গ্রহ-নক্ষত্রকে বাহ্যিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় ও অসাধারণ দীপ্তিময় অবয়ব দিয়ে সজ্জিত করেছেন সেক্ষেত্রে এগুলো ভেতর অন্য আলো অর্থাৎ এমন কোন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দেননি যা মানুষের উপকারে লাগতে পারে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছেন আর এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, এ সবকিছু মানুষের স্বার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিকেও এ সবকিছুর অস্তিত্ব তাঁর মহান অনুগ্রহ ও কৃপারাজির অন্তর্গত বলে ইশারা করেছেন। তিনি তাঁর দ্ব্যর্থহীন চিরস্থায়ী কিতাবে অনেক বস্তুতে নিহিত প্রভাবরাজির কথা উল্লেখ করেননি কিন্তু তা অভিজ্ঞদের কাছে সুস্পষ্ট। সেক্ষেত্রে আমাদের কী হয়েছে আমরা বস্তুনিচয়ের যে গুণাবলী আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন তা স্বীকার করবো না? বাস্তবিক পক্ষে তিনি এগুলোকে অধিকাংশ নিয়ামতের তুলনায় প্রাধান্য দিয়েছেন আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন এবং এর নিদর্শনাবলী

নিয়ে চিন্তা করতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বলেন,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ

(সূরা আল ইমরান : ১৯১) সত্য কথা হলো, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গুণাগুন এমন যা মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করে আর একে অস্বীকার করার কোন জো নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন ঋতু এবং এর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থান এবং প্রত্যেক মৌসুমের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ বিশেষ রোগব্যাধি, পরিচিত সব গাছপালা ও চিরচেনা কীটপতঙ্গসহ প্রকাশিত হয় এ বিষয়টি তোমারও জানা। এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি জানো, সূর্য যখন উদিত হয় আর এর আলো উদ্ভিদ, জড়জগত ও প্রাণীজগতের উপর ছড়িয়ে পড়ে সেই সময়ের যে একটি নিজস্ব প্রভাব আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। বেলাশেষে যখন দিনের অবসান হয় সে সময়টির ভিন্ন সব প্রভাব রয়েছে। সারকথা হলো, বৃক্ষরাজি, ফলফলাদি, পাথর এবং আদম সন্তানের প্রকৃতির উপর সূর্যের দূরত্ব ও নৈকট্যের যে প্রকাশ্য প্রভাব ও গভীর কার্যকারিতা রয়েছে এ বিষয় অস্বীকার করার কোন জো নেই। আমাদের জন্য এটি স্বীকার করা আবশ্যক। অন্যথায় সকল জাতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত জ্ঞান থেকে আমরা কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি? বিদগ্ধ আলেম ও কৃষিবিদরা চাঁদের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের কথা জানেন। অতএব বড়ই আক্ষেপ তাদের জন্য, যারা জ্ঞানী হবার দাবী করে কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট মূর্খের ন্যায় কথা বলে।

চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত মানুষের মাঝে সবচেয়ে সুঠাম ও ভারসাম্যপূর্ণ গঠন তাদের যারা বিষুবরেখার কাছে বসবাস করে। এটি এতদঞ্চলের বিশেষ প্রভাব বৈ আর কি যা তাদের উত্তম স্বাস্থ্য এবং জ্ঞানে উৎকর্ষ ও তুখোর বুদ্ধির কারণ। এতে কোন সন্দেহ নেই, এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর সুবিদিত ও প্রকাশ্য বিষয়। যুক্তির আলোতে যার পদচারণা হয়নি সে ছাড়া অন্য কেউ এটিকে উপেক্ষা করতে পারে না এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হতে পারে না। অতএব, অবজ্ঞাকারীদের জন্য পরিতাপ! আমাদের ধর্মে এটি স্বীকৃত, কোন কোন মুহূর্ত এমন রয়েছে যা অতীব কল্যাণময় হয়ে থাকে, যখন দোয়া করলে তা গৃহীত হয় আর আকুতি-মিনতির উত্তর পাওয়া যায়; যেমন লাইলাতুল কদর ও রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ। গবেষকরা বলেন, নামাযের জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক অপ্রকাশিত কল্যাণরাজি রয়েছে। সে কারণেই খোদা তা'লা তা নামাযের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে এর মূল্যায়ন করবে আর সব নামায বিগলিত চিত্তে যথাসময়ে পড়বে, কোন সন্দেহ নেই, তাকে এর কল্যাণের ভাগী করা হবে। সে এর অংশ পাবে, অভীষ্ট সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং নোংরা

সাথীর হাত থেকে তাকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। কাজেই এ ব্যাপারে যথাযথভাবে চিন্তা কর। কেননা, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে আন্তরিকভাবে সন্ধান ও চেষ্টা করবে ঐশী দান, সৌভাগ্য ও ঐশী মনোনয়নের সু-দৃষ্টি তার উপর পড়বে এবং খোদা তা'লা লাঞ্ছনা থেকে তাকে রক্ষা করবেন এবং তাকে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

তুমি যদি এটি বুঝো এবং সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী হও তাহলে প্রকৃত বিষয় বুঝতে পারবে এবং এ সম্পর্কে তোমার অনেক সন্দেহ ও সংশয় দূর হবে, সন্দেহের পর্দা বিমোচিত হবে এবং সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে আর রহস্যের পর্দা উন্মোচিত হবে। ফলে দৃঢ় বিশ্বাসের জ্যোতিতে তুমি দেখতে পাবে। এটি যদি তোমার জন্য যথেষ্ট না হয় আর যদি তুমি মনে কর, তোমার জন্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া উচিত তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো কুরআন বিষয়টি একাধিক স্থানে খোলাসা করেছে। যেমন فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ﴿١٢﴾ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا (সূরা হা মিম সাজদা : ১২-১৩), يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ (সূরা আততালাক : ১৩), يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ (সূরা আস্ সাজদা : ৬) এ আয়াতগুলোর প্রতিটি প্রমাণ বহন করে, প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী, রহীম-করীম ও কৃপাশীল খোদা আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে নর ও নারীর মত করে সৃষ্টি করেছেন। ক্রিয়া ও ক্রিয়ার প্রভাব গ্রহণের দিক থেকে তাঁর প্রজ্ঞা এ দু'টোকে সমবেত করার এবং একটির উপর অপরটিকে প্রভাব বিস্তারকারী বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটিই তাঁর উক্তি **'ওয়ালিল আরদে ই'তিয়া'** এর অর্থ। অতএব এ আয়াত সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তা কর আর খোদা সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করো না এবং পুণ্য অর্জনে সোচ্চার হও, মৃত্যুর পূর্বে ভুলভ্রান্তির সুরাহা কর এবং উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

আবার দেখ! তিনি অন্যত্র বলেন, قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا (সূরা আ'রাফ : ২৭) এবং তিনি বলেন, أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ (সূরা হাদীদ : ২৬) এবং وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ (সূরা আয যুমার : ৭) এটি জানা কথা, এই বস্তুগুলো আকাশ থেকে নামে না। আল্লাহ্ তা'লা যে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তার কারণ হলো, এসব বস্তুর সৃষ্টি ও গঠনের প্রধান কারণ হলো, মহাজাগতিক, সৌর, চন্দ্র ও নক্ষত্রীয় নানাবিধ প্রভাব। এসব আয়াতে খোদা তা'লা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, এ পৃথিবীর প্রভাব এক স্ত্রীর মত এবং আকাশ তার স্বামী স্বরূপ। তাদের একজনের কাজ অপরজনকে বাদ দিয়ে সম্পন্ন হয় না। তাঁর পক্ষ থেকে প্রজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ তিনি উভয়ের মিলন ঘটিয়েছেন আর খোদা তা'লা সর্বজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

অতএব এ আয়াতগুলো সর্ম্পকে গভীরভাবে চিন্তা কর এবং পুনরায় দৃষ্টিপাত কর। জেনে রেখো! যে গবেষণা করে, বুঝার চেষ্টা করে এবং সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করে তার জন্য এ স্থানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর। আর এ লক্ষ্য করে আয়াতগুলোকে খোদার এ উক্তি فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ *(সূরা ওয়াকেয়া : ৭৬)* সমর্থন করে। তুমি বুঝতে পারছো, এ বাণীর মাঝে এ পৃথিবীর অবস্থান এক স্ত্রীর মত এবং আকাশ তার স্বামী স্বরূপ। ইঙ্গিত রয়েছে, নক্ষত্ররাজী ও এগুলোর অবস্থান স্থলের মাঝে, নবীর যুগকে শনাক্ত করা এবং ওহী অবতরণের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সে কারণেই বলা হয় যে, কোন কোন নক্ষত্র– কোন নবীর যুগ ছাড়া উদিত হয় না। কাজেই সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে খোদার এ ইঙ্গিতকে বুঝে এবং খোদাভীরুর ন্যায় তা গ্রহণ করে আর লাগামহীন, চরম নির্লজ্জ, অবাধ্য ও অহংকারীদের ন্যায় আক্রমণ করে না।

আমাদের এ বক্তব্যের ন্যায় যদি স্পষ্ট কোন বক্তব্য তুমি ইতোপূর্বে না শুনে থাকো, তবে এতে তুমি আশ্চর্য হয়ো না। কেননা প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানুষ চাই আর প্রত্যেক যুগের নিজস্ব চাহিদা আছে অর্থাৎ সবকথা সব জায়গায় খাপ খায় না। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়োজন ছাড়া সূক্ষ্ম জ্ঞান নাযিল করেন না বা জ্ঞান উম্মোচিত করেন না। এমন কত সূক্ষ্ম রহস্য আছে যা এক যুগের মানুষের সামনে গুপ্ত থাকে আবার অন্য এক যুগে তা প্রকাশের সময় হয়। সে সময় খোদা একজন সংস্কারককে প্রেরণ করেন আর যুগের মুহাদ্দাস সেসব অন্তর্নিহিত সত্যের আলোকে কথা বলেন। যুগের দাবী অনুসারে প্রচ্ছন্ন বিষয়াদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন আর তার মুখ থেকে খোদার কিতাবের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জারী করা হয় যা খোলাসা করার তখনই সময় হয়ে থাকে। তিনি পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও বীরত্বের সাথে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করেন আর একে সে ব্যক্তি গ্রহণ করে যে দুনিয়া ছেড়ে খোদার দিকে বিনত হয় আর অজ্ঞ ব্যক্তি নিজ অথর্বতা ও চরম দুর্ভাগ্যবশত একে অবজ্ঞা করে। অতএব খোদাকে ভয় কর আর পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হও।

জেনে রেখো, আমরা এমন আয়াতের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি– জ্ঞানে পরিপক্ক অনেক আলেমও সে অর্থই করেছেন। তারা এ বিশ্বাস রাখতেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের অনেক কার্যকারিতা রয়েছে যা খোদা তা'লা বান্দাদের কল্যাণের নিমিত্তে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি **আল্লামা রাযি** তাঁর **তফসীরে কবীর**'এ লিখেছেন যা হলো নিম্নরূপ:

"সূর্য হলো দিনের রাজা আর চন্দ্র রাতের । যদি সূর্য না হতো তাহলে চার ঋতু হতো না। যদি তা না হতো তাহলে সমগ্র বিশ্বের পুরো নিখুঁত ব্যবস্থা

সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়তো। আমরা এ পুস্তকের প্রথম দিকে সূর্য ও চন্দ্রের উপকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি।”

তাঁর কথা শেষ হলো; সুতরাং এ সম্পর্কে চিন্তা কর আর ঘুমন্ত লোকদের ন্যায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না।

হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ* পুস্তকের লেখক বলেন:

“রাশি ও জ্যোতির্বিদ্যা’ সম্বন্ধে জানা উচিত, এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। শরিয়ত কেবল এতে অযথা জড়িয়ে যেতে বারণ করে কিন্তু এর বাস্তবতা সমূলে অস্বীকার করে না; অতীত বুযুর্গানদের থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা হলো, জ্যোতির্বিদ্যাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যারা করে তাদের তিরস্কার করা এবং এর তথাকথিত প্রভাব স্বীকার না করা, কোন ক্রমেই যে এগুলোর কোন প্রভাব নেই- কথাটি এমন নয়। এর কয়েকটি প্রভাব স্পষ্ট ও অনস্বীকার্য। যেমন ঋতুর পরিবর্তন সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। একইভাবে আরও বিষয় রয়েছে। অনুমান, অভিজ্ঞতা ও মানমন্দিরের মাধ্যমে এগুলোর কোন কোন প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ সাব্যস্ত করে, আদার মাঝে উষ্ণ প্রভাব রয়েছে এবং কর্পূরের মাঝে রয়েছে শীতলতা। আর এসব প্রভাব দু’ভাবে প্রমাণিত হওয়াও অসম্ভব নয়। একটি হচ্ছে তার প্রকৃতিগত সামঞ্জস্যতা– যেমন সবকিছুর একটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে যা তার একান্ত নিজস্ব যথা গরম, শীত, শুষ্কতা ও আদ্রতা ইত্যাদি, যার সূত্র ধরে রোগ ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। একইভাবে সূর্যের তাপ আর চন্দ্রের স্নিগ্ধতার ন্যায় নভোমন্ডল ও নক্ষত্রেরও কিছু অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য আছে। যখন নক্ষত্র নিজ নির্ধারিত স্থানে আসে তখন পৃথিবীতে এর প্রভাব প্রকাশ পায়। তুমি কি জানো না, নারী চরিত্র ও অভ্যাসের সাথে তিক্ততার এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যেন এটি তাদের প্রকৃতির অংশ, যদিও সচরাচর এটি বুঝা যায় না। একইভাবে পুরুষও প্রকৃতিগত বীরত্ব, গুরুগম্ভীর আওয়াজ এবং এ ধরনের বিষয়াদির জন্য বিশেষত্ব রাখে। সুতরাং এই সকল সুপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর ন্যায় পৃথিবীর উপর শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের কোন প্রভাব যে পড়তে পারে তা অস্বীকার করবে না। দ্বিতীয় প্রকারের প্রভাব আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা চরিত্র বা স্বভাবের ক্ষেত্রেও একই। ভ্রুণ পিতা মাতার পক্ষ

*** নোট:**

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ.)-এর রচিত। (অনুবাদকের পক্ষ থেকে)

থেকে যে আত্মিক শক্তি লাভ করে এটি তার মত একটি বিষয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সাথে জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের যেমন সম্পর্ক ভ্রুণের নিজ পিতামাতার সাথে তেমনই সম্পর্ক। সুতরাং এই শক্তি পৃথিবীকে প্রথমে প্রাণীর আকৃতি ধারণ আর এরপর মানবীয় বৈশিষ্ট্য বরণের জন্য প্রস্তুত করে। নভোমন্ডলে নক্ষত্রের অবস্থানের দিক থেকে এসকল বৈশিষ্ট্য কয়েকরূপে প্রকাশ পেতে পারে আর প্রত্যেক রূপের আবার কিছু বিশেষ ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে। জ্ঞানের এই শাখা নিয়ে অনেকেই চিন্তা করেছে। ফলে তাদের জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে যার মাধ্যমে তারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়। কিন্তু খোদার তকদীর যদি এক্ষেত্রে ভিন্ন হয় তাহলে নক্ষত্ররাজির প্রভাবকে প্রকাশ করেন আরেক রূপে যা পূর্ববর্তী রূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে নক্ষত্র জগতের বিধানকে পদদলিত না করেই আল্লাহ্ স্বীয় সিদ্ধান্ত পুরো মহিমায় প্রকাশ করে থাকেন।"

লেখকের বক্তব্য এখানেই শেষ হলো। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

অতএব, হে প্রিয়ভাজন! খোদা তোমার সাথী হোন। তুমি চিন্তা করে দেখ, নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে যিনি এসব কথা বলেছেন তিনি ভারতীয় একজন খোদাভীরু আলেম। তিনি স্বীয় যুগের মুজাদ্দেদ ছিলেন আর তাঁর পান্ডিত্য এদেশে একটি সর্বজন-বিদিত বিষয়। ছোট বড় সবার দৃষ্টিতে তিনি ইমাম ছিলেন। মু'মিনদের কেউ তাঁর মহান মর্যাদা সম্পর্কে দ্বিমত রাখে না। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা স্বামীর ঘাড়ে চেপে বসা জাঁদরেল স্ত্রীলোকদের মত মুসলমানদের কাফের আখ্যা দেয়ার ধৃষ্টতা দেখায় কিন্তু স্বীয় ইমামদের কথা নিয়ে চিন্তা করে না। তারা কাফেরদের সংখ্যা বৃদ্ধি আর মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস করতে চায়। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া প্রদানের মাধ্যমে উম্মতকে ভয়াবহ পরীক্ষায় ঠেলে দিতে চায়। নিজ ঈমানকে নিকৃষ্ট দ্রব্যাদি ও তুচ্ছ ফেনার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। গোলাপ, সুগন্ধি, কস্তুরি, পদ্মরাগমণি এবং সুপেয় পানির ঝর্ণাকে পরিত্যাগ করে। নোংরা মাছির মত মানুষের বমি, আমাশয়ের আবর্জনা ও বর্জ্যের উপর আছড়ে পড়ে। সুতরাং স্মরণ রেখো, সেই বিদগ্ধ পন্ডিত, যাঁর তফসীরের কিছু কথা আমরা লিপিবদ্ধ করেছি তিনি **'ফুয়ূজুল হারামাইনে'** আরও বড় কথা লিখেছেন। আমরা এখানে তাঁর কথার কিছুটা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি যাতে নক্ষত্র ও নভোমন্ডলের বিষয় রয়েছে। আর তা নিম্নরূপ :

"অনেক সময় গোড়াতে এক ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত হয় না কিন্তু সে এমন এক যুগে জন্ম নেয় যখন নভোমন্ডলে নক্ষত্রের অবস্থান তার বংশের পুণ্যবান হওয়ার

দাবী করে। আমার মতে এটি শনি গ্রহ যখন সূর্য ও বৃহস্পতির সমান্তরালে আসে, যখন শনি একটি আয়নার মত কাজ করে যাতে সূর্য ও বৃহস্পতির আলো প্রতিফলিত হয়। আমার মতে, সে কারণেই কেউ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় হয়ে থাকে, বাকী আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। এ সকল নক্ষত্র যখন এক রেখায় আসে তখন এই বিন্যাসের ফলাফল কল্যাণমন্ডিত ব্যক্তির মাঝে সেভাবে প্রকাশ পায় যেভাবে পিতামাতার চেহারা ও গঠন-গড়ন শিশুর মাঝে সংরক্ষিত হয়। অথচ তা এই ব্যক্তির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিজাত্য নয়।"

পুনরায় অন্যত্র তিনি তাঁর এই গ্রন্থ **আল-ফুয়ূজে** বলেনঃ

"নিন, আমার প্রভু আমাকে এটি বুঝিয়েছেন। প্রথম আকাশের সাহায্যে যা আসে তা হলো বিধান, পারস্পরিক সম্পর্ক ও পোষাক। আর দ্বিতীয় আকাশের সাহায্যে আসে সুশৃংখল নিয়ম-কানুন যা লিখানো, পড়ানো ও শিখানো হয় আর গ্রন্থ রচিত হয়। তৃতীয় আকাশের সাহায্যে এক সহজাত ধাচের কল্যাণ লাভ হয় যা তাদের বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয় যার প্রতি মানব প্রকৃতি আকৃষ্ট হয়, এর জন্য তাদের মাঝে প্রবল আত্মাভিমান কাজ করে, তারা এর সুরক্ষা বিধান করে, এর সমর্থনে দন্ডায়মান হয় এবং এর পক্ষে যুদ্ধ করে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জীবনের ন্যায় এরা তাঁকে ভালোবাসে। চতুর্থ আকাশের সাহায্যে প্রবল শক্তি ও বশীভূত করার বৈশিষ্ট্য লাভ হয়। বড়-ছোট আলেম শ্রেণী ও সম্পদশালী সকলকেই এতে নিয়োজিত করা হয়। আর পঞ্চম আকাশের সাহায্যে শাস্তি প্রদানের বৈশিষ্ট্য ও কঠোরতা আসে। যে এর অস্বীকার করে তাকে তুমি কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন ও বিপদাপদে নিপতিত হতে দেখবে আর অভিশপ্ত ও শাস্তিতে জর্জরিত দেখতে পাবে, যেন অদৃশ্য থেকে এর পক্ষে এক সাহায্যকারী দন্ডায়মান হলো। ষষ্ঠ আকাশের মাধ্যমে আসে মহান হেদায়াত, সে ব্যক্তি মানুষের হেদায়াত ও উৎকর্ষে পৌঁছার কারণ হয়ে থাকে। সপ্তম আকাশের মাধ্যমে আসে স্থায়ী সম্মান যা পাথরে খোদাই করা লেখার মত। যতক্ষণ একে খন্ডবিখন্ড ও টুকরা টুকরা না করা হয় ততক্ষণ এটি বলবৎ থাকে। এই সাতটি কথা (আরকান) ঊর্ধ্বলোকে দেখতে পাবে যা এক সুঠাম দেহে পরিণত হয়। এরপর দেহে খোদার (খোদার মহান নৈকট্যের কল্যাণে) পক্ষ থেকে আত্মার ন্যায় এক আকর্ষণ ফুৎকার করা হয়। যে এই কথাগুলো ও চিন্তা-ভাবনাকে নিজের জীবনের রীতি হিসেবে অবলম্বন করে এবং এই পোষাকে সজ্জিত হয় তাকে ঐশী রহমত নিজ কোলে স্থান দেয়। উপরে, নীচে, ডানে ও বামে এমন কি অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে সে খোদার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে। এরপর এই শিশুকে

ঊর্ধ্বলোকের নেতৃস্থানীয়রা অর্থাৎ ফিরিশ্‌তা লালনপালন করে আর দুনিয়ার মানুষ তার সেবা করে। এভাবে তার বিষয় উত্তরোত্তর দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে আর তার মহিমা বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ না এ বিষয়ে খোদার সিদ্ধান্ত এসে যায়। এই হলো তরিকত বা ধর্মের দৃঢ়তা লাভের পথ। সুতরাং ধর্মের মূল ও শাখাকে এই ভিত্তিতে অনুমান কর। অতএব যে দাবী করে খোদা তাকে তরিকাত বা খোদাপ্রাপ্তির পথ দান করেছেন, কিন্তু তাকে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা যদি না দেয়া হয় তাহলে নিশ্চয় সে নিজ অবস্থান বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে সবাইকে ধর্মের নিগূঢ় জ্ঞান দেয়া হয় না আর ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে যে সকল কাজ করা হয় এমন বিষয়ের আল্লাহ্‌র কাছে কোন স্থান নেই। এটি তাকে দেয়া হয় যার সৃষ্টি কল্যাণমন্ডিত ও পবিত্র। সপ্তম আকাশ ঊর্ধ্বলোক ও পৃথিবীবাসীর সাহায্যের জন্য নিবেদিত থাকে। আর মহান খোদার নৈকট্যের কল্যাণে সে বিশেষ কৃপা লাভ করে। অনেক মহান তত্ত্বজ্ঞানী আছেন যারা ফানা বা খোদার সত্তায় সম্পূর্ণভাবে বিলীন হওয়া ও 'বাকা' বা আধ্যাত্মিক জীবনের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও আশিষমন্ডিত ও পবিত্র হয় না। এ কারণে তাদের ধর্মীয় পরাকাষ্ঠা প্রদান করা হয় না বরং প্রত্যেক কাজের জন্য এক বিশেষ পুরুষের প্রয়োজন হয়ে থাকে যাকে এর উপযোগী প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়। আর তার আবির্ভাবের বিষয়টি স্বাভাবিক বা সাধারণ উত্থানের চেয়ে এক অন্য ধরনের অভিনব উত্থান হয়ে থাকে। যার প্রকৃত স্বরূপ হলো একটি কল্যাণধারা যা অবস্থা ও কর্মে প্রতিফলিত হয়।"

তাঁর (রহ.) কথা এখানেই শেষ। সুতরাং কাউকে যদি এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাফির আখ্যা দিতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম তাঁকে কাফির আখ্যা দাও। সৌভাগ্য তাদের প্রাপ্য যারা এগিয়ে রয়েছে।

তাদের একটি আপত্তি হলো, তারা বলে, এ ব্যক্তি মসীহ্‌র নিদর্শনাবলীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। আর এগুলোকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে বলে, এসব কিছু নয়; চাইলে আমিও এমনটি দেখাতে পারি বরং এর চেয়েও বড় নিদর্শন দেখাতে পারি। কিন্তু আমি তা অপছন্দ করি এবং অতি আগ্রহীদের মত আমি এগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করি না।

এর উত্তরে স্মরণ রেখো, নিদর্শন দেখানো বান্দার কাজ নয় বরং খোদা তা'লার কর্মের অন্তর্গত। একথা বলা বান্দার সাজে না যে, আমি নিজ পছন্দ ও ইচ্ছা মোতাবেক অমুক অমুক কাজ করবো বা করি। মানুষ নিজের পছন্দ, ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বলে যা করে তা তার নিজের কাজ; একে আমরা মো'জেযা বলতে

পারি না বরং তা চক্রান্ত বা যাদু। অতএব হে আমার ভাই! বুঝার চেষ্টা কর। খোদা তোমাকে হেদায়াতে সমৃদ্ধ করুন। ত্বরাপ্রবণরা যেমনটি ভেবেছে আমি তেমন কোন কথা বলিনি। বরং মুহাম্মদ মুস্তফা খাতামান নবীঈন (সা.) যে মহা অনুগ্রহের ভাগী হয়েছিলেন সেদিকে চেয়ে আমি তাঁর একজন প্রকৃত অনুসারী হিসেবে যা বলার বলেছি।

আমি মসীহ্ (আ.)-এর বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিনি আর তাঁর নির্দশনাবলীকে তিরস্কারের লক্ষ স্থলে পরিণত করিনি। বরং আমার উক্তির অর্থ হলো, আমাদেরকে একটি সম্পূর্ণ ধর্ম ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ একজন নবী দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে যে মানুষের কল্যাণার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক নবী আছেন নিজগুণে যাঁদের অনেক উৎকর্ষ রয়েছে কিন্তু তাদের চেয়েও বেশি উৎকর্ষ এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমাদেরকে প্রতিবিম্ব আকারে দান করা হয়েছে। এটি খোদার অনুগ্রহ, যাকে চান তিনি দান করেন। তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তি দেখনি, 'জান্নাতে এমন একটি স্থান আছে তা এক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ পাবে না আর আমি আশা করি আমিই সে ব্যক্তি।' এক ব্যক্তি এ কথা শুনে কাঁদলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সাথে বিচ্ছেদ আমি সইতে পারবো না, আপনি এক স্থানে থাকবেন আর আমি দূরে অন্যত্র আপনার দর্শন লাভ করা থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবো তা আমার জন্য অসহনীয়। তখন তিনি (সা.) বললেন, তুমি সে স্থানে আমার সাথে-ই থাকবে। দেখ! খোদা তাঁকে কীভাবে সে সকল নবীদের উপর প্রাধান্য দিলেন যাঁরা সেখানে স্থান পাননি। আবার তুমি আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহ্‌র শেখানো এই দোয়ার প্রতি লক্ষ্য কর:

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ *(সূরা ফাতেহা : ৬-৭)*।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে সকল নবীর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং খোদার কাছে তাঁদের যাবতীয় উৎকর্ষ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেখানে নবীদের যাবতীয় উৎকর্ষের অবস্থা হলো বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন টুকরোর ন্যায়, কিন্তু আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন এগুলোর প্রত্যেকটি লাভ করার আকাঙ্খা পোষণ এবং নিজেদের মাঝে এইসব বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলোর সমষ্টিগত রূপ জড় করি। অতএব মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যে প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ আমাদের এমন কিছু লাভ হওয়া আবশ্যক যা অন্য কোন নবীও লাভ করতে পারেননি। মুসলমান আলেমগণ এ বিষয়ে একমত, নবী না হওয়া সত্ত্বেও এমন কারো কারো মাঝে এমন কতক আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যা কোন কোন নবীর মাঝেও পাওয়া যায় না। এরপর ইমাম মাহদীর পদমর্যাদা সম্পর্কে ইবনে

সিরিনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি যা বলেন, তা নিয়ে ভাব। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তিনি কি শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে আবু বকরের ন্যায় হবেন? তিনি বলেন, সত্য কথা হলো, তিনি কোন কোন নবীর চেয়েও বড়। এ বিষয়ে উম্মতের আলেমদের কারো কোন দ্বিমত নেই, এই উম্মতের মাঝে মহানবীর প্রতিচ্ছায়া হিসেবে লব্ধ মর্যাদা নবীদের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের তুলনায় মহান। সে কারণেই বলা হয়, বিগত নবীরা এই উম্মতকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁদের অধিকাংশ এদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাসনা পোষণ করতেন। কাজেই বনী ইসরাঈলী নবীদের মাঝে পাওয়া যায় না এমন সব শ্রেষ্ঠত্ব যদি এই উম্মতের মধ্যে না-ই থাকে তবে তাঁরা কেন আপন প্রভুর কাছে এই উম্মতভুক্ত হবার বাসনা প্রকাশ করলেন? মসীহ্‌র কোন কোন নিদর্শন আমাদের অপছন্দ হওয়ার বিষয়টি একটি বাস্তব সত্য। সেই বিষয়টি অপছন্দ না করে আমরা কীভাবে থাকতে পারি? যে বিষয়টি দৃষ্টান্ত স্বরূপ যোহনের ইঞ্জিলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর মায়ের সাথে এক বিয়েতে আমন্ত্রিত হন। আর তিনি নাকি সেখানে মানুষের জন্য এক পেয়ালা পানিকে মদে রূপান্তরিত করেন যেন মানুষ তা পান করে। এখন তুমিই বল, এ ধরনের নিদর্শনকে আমরা কীভাবে অপছন্দ না করে থাকতে পারি। আমরা মদ পান করি না এবং এটিকে কোন পবিত্র বস্তু হিসেবেও মনে করি না। এমন নিদর্শনে কীভাবে আমরা প্রীত হতে পারি? অনেক বিষয় আছে যা নবীদের রীতিনীতিভুক্ত ছিল, কিন্তু আমরা তা ঘৃণা করি আর তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। 'আদম' (আ.) খোদার মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন আর তাঁর মেয়েদের সাথে ছেলেদের বিয়ে দিতেন, কিন্তু আমরা আমাদের যুগে এ কাজকে ভাল ও পবিত্র কাজ বলে জ্ঞান করি না বরং আমরা একে ঘৃণা করি।

অতএব প্রত্যেক যুগের একটি দাবী থাকে আর প্রত্যেক উম্মতের একটি রীতি বা পন্থা থাকে। একইভাবে আমরা নিজেদের জন্য পাখি বানানোর নিদর্শনকেও ঘৃণা করি। কেননা, খোদা তা'লা আমাদের রসূল (সা.)-কে এ নিদর্শন দেননি। আমাদের নবী (সা.) একটি অসাধারণ পাখি সৃষ্টি করাতো দূরের কথা একটি মাছিও সৃষ্টি করেননি। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো, তওহীদ বা একত্ববাদের নামকে সমুন্নত করা এবং যাবতীয় বিপজ্জনক অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তরাখা। কেননা, কোন কোন সময় তা শির্‌কের বীজ হিসেবে কাজ করে। আমাদের বইতে আমরা যা লিখেছি তার অর্থ এটিই। কর্ম নিয়্যত বা সংকল্প অনুসারে যাচাই হবে। অতএব কিছুক্ষণ চিন্তা কর, হয়তো খোদা তোমাকে সত্যায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

তাদের একটি আপত্তি হলো, তারা বলে, এই ব্যক্তি ফিরিশ্‌তাকে চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজির প্রাণ বলে মনে করে। কাজেই এর উত্তর হলো, তারা এ বিষয়ে চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। খোদা তা'লা জানেন, আমি ফিরিশ্‌তাকে নক্ষত্রের প্রাণ আখ্যায়িত করি না বরং আমি আমার প্রভু প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি, ফিরিশ্‌তারা চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র এমন যা কিছুই আকাশ ও পৃথিবীতে আছে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। খোদা তা'লা বলেছেন, اِنۡ كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ (সূরা আত্‌তারেক-৫) এবং তিনি আরো বলেন, فَالۡمُدَبِّرٰتِ اَمۡرًا (নাযিয়াত : ৬) আর পবিত্র কুরআনে এমন অগণিত আয়াত রয়েছে। সুসংবাদ তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।

কুফরীবাজদের একটি আপত্তি হলো, এ ব্যক্তি নবী হবার দাবী করেছে এবং বলে আমি নবীদের অন্তর্ভুক্ত। এর উত্তর হলো, হে ভাই! আমি নবী হবার দাবী করি নি আর আমি তাদের বলিনি, আমি নবী। আসলে তারা তড়িৎ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। আর আমার কথা বুঝতে ভুল করেছে। তারা সত্যিকার অর্থে চিন্তা করেনি বরং প্রকাশ্য অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তুমি দেখবে, তারা ঝট করে কাউকে কাফির বলে বসে, মু'মিনদের একদলকে কাফের আখ্যা দেয় আর অপর দলকে প্রতারিত করে। অত্যাচারীদের হৃদয়ের স্বরূপ খোদার অজানা নয়। তাদের ভেতর এমন মানুষও আছে, যার কথা মানুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হয় আর সে কসম খেয়ে বলে, সে সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন ব্যক্তি ঘোর মিথ্যুক। সে সত্য মিথ্যা ঘোলাটে করতে ত্বরাপ্রবণ। আর মিথ্যার উপর সত্যের প্রলেপ দেয় আর দানবীয় অপচেষ্টা চালায় এবং কুসংস্কার ও কূটচালের মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠকে কলুষিত করে। তার চক্রান্ত সব ষড়যন্ত্রকারীকে হার মানায়। এ ছাড়া সে সত্যবাদীদের নাম রাখে দাজ্জাল।

আমি আমার বইতে যা লিখেছি মানুষকে তার বাইরে কিছু বলিনি অর্থাৎ আমি মুহাদ্দাস আর আল্লাহ্ আমার সাথে সেভাবে বাক্যালাপ করেন যেভাবে মুহাদ্দাসদের সাথে করেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন, তিনিই আমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন। অতএব খোদা আমাকে যা দান করেছেন আর যে রিয্‌ক আমাকে দিয়েছেন তা আমি কীভাবে প্রত্যাখান করতে পারি? আমি কি তবে বিশ্ব স্রষ্টার অবাধ কল্যাণ অগ্রাহ্য করবো? আর আমার দ্বারা নবুওয়তের দাবী করে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়া এবং কাফের জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া মোটেও সম্ভবপর নয়। দেখ! কুরআনের মাপকাঠিতে যাচাই না করে আমি আমার কোন ইলহামকে গ্রহণ করি না। জেনে রেখো! যা কুরআন বিরোধী তা মিথ্যা, খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মদ্রোহীতা। সেক্ষেত্রে আমি মুসলমান হয়েও কীভাবে নবী

হবার দাবী করতে পারি? আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ, আমার ইলহামসমূহের মধ্যে একটিও আমি এমন দেখি না যা খোদার কিতাবের বিরোধী বরং এর সবক'টি খোদার কিতাব সম্মত দেখতে পেয়েছি।

এক শ্রেণীর মানুষের দাবী হলো, এই উম্মতের জন্য ইলহামের দ্বার বন্ধ। এরা কুরআন সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে ভাবেনি আর ইলহাম প্রাপ্তদের সাথেও তাদের দেখা হয়নি। হে সুস্থ-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি! এ কথাটি স্পষ্টতই মিথ্যা এবং কুরআন, সুন্নত ও পুণ্যবানদের সাক্ষ্য পরিপন্থী। রইলো আল্লাহ্‌র কিতাবের বিষয়টি, সেক্ষেত্রে তুমি কুরআন করীমে এমন সব আয়াত পাঠ করে থাকো যা আমাদের এ দাবী সমর্থন করে থাকে। খোদা তা'লা তাঁর দ্ব্যর্থহীন গ্রন্থে এমন কিছু পুরুষ ও নারী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন–যাদের সাথে তাঁদের প্রভুর বাক্যালাপ হয়েছে। তিনি তাঁদের সম্বোধন করেছেন, তাঁদের আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন; অথচ তাঁরা নবী বা রাসূলদের অন্তর্গত ছিলেন না। তুমি কি কুরআনে পড়নি,

وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ *(সূরা কাসাস : ৭)*।

হে ন্যায়পরায়ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি! চিন্তা করুন, শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া সত্ত্বেও এই উম্মতের কয়েকজন পুরুষের সাথেও আল্লাহ্ কথা বলবেন না এটা কীভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? অথচ তোমাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া জাতির নারীদের সাথেও আল্লাহ্ তা'লা কথা বলেছেন! আর তোমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্তও রয়েছে! আমার ইলহাম সম্পর্কে যদি কারো সন্দেহ হয় আর এই উম্মতের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র সম্বোধন এবং নবী না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে কথপোকথন যদি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হয়, তাহলে তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তারা কেন কুরআনকে বিচারক নির্ধারিত করে না? আর যদি তারা মু'মিন হয় তাহলে কেন বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে খোদা ও রসূলের কাছে নিয়ে যায় না? খোদা তা'লা কুরআনে বলেন, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا *(সূরা ইউনুস : ৬৫)* তিনি আরও বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ *(সূরা হামিম সাজদা : ৩১-৩২)*

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ *(সূরা আল মু'মিন : ১৬)*

يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا *(সূরা আনফাল : ৩০)* وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ *(সূরা হাদীদ : ২৯)* সেই জ্যোতি যা খোদার বিশেষ বান্দা ও অন্যান্য বান্দাদের মাঝে পার্থক্যসূচক বিষয়, তা হলো– ইলহাম, দিব্যদর্শন ও বাক্যালাপ এবং কিছু

রহস্যজনক সূক্ষ্ম বিষয় যা খোদার পক্ষ থেকে বিশেষ বান্দাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। একইভাবে খোদা তা'লা বলেন, وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ *(সূরা আত্‌তালাক : ৩-৪)*

তুমি জানো, যারা প্রভু থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে তাক্‌ওয়া ও খোদাভীতির পরম মার্গে উপনীত হন। তাদের দৈহিক প্রশান্তি বিধান করে এমন জীবিকা অর্থাৎ রুটি-মাংস ও নানা রকমের খাদ্য-পানীয় এবং পোশাক ইত্যাদি নিয়ে তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। বরং তারা আধ্যাত্মিক সম্পদ উপার্জনে সোচ্চার। তাদের অন্তরাত্মা ও চাওয়া-পাওয়া খোদামুখী হয়ে থাকে আর এমন জীবিকার প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকে যা তাদেরকে বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে এবং তাদের খোদাপ্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে। তারা ইহজাগতিক কামনা-বাসনা এবং আমোদ-প্রমোদের প্রতি মোহ রাখেন না। ইহজগত তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয় এবং খাওয়া দাওয়া তাদের মূল লক্ষ্য নয় আর তারা নিজেদের জীবন বৃথা ভোজন-ভক্ষণে নিঃশেষ করতে চান না আর সম্পদশালীদের ন্যায় বিলাসী জীবন কাটিয়ে দেয়াও তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য নয়। অতএব সেই জীবিকা যা মুত্তাকীদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে তা হলো, অদৃশ্য কল্যাণধারা অর্থাৎ দিব্যদর্শন, ইলহাম বা খোদার সাথে কথপোকথন। যেন তারা নিশ্চিত বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত হতে পারেন এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হন। খোদা তা'লা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন এবং বলেনঃ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ *(সূরা আত্‌তালাক : ৩-৪)*

যারা মনে করে, রিয্‌ক বা জীবিকা কেবল দৈহিক নিয়ামতের মাঝেই সীমাবদ্ধ তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। প্রকৃতপক্ষে তারা পবিত্র কুরআনে অভিনিবেশ করেনি এবং তারা উদাসীন।

একইভাবে তাঁর উক্তি اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا *(সূরা আনফাল : ১৩)* এর অর্থ হলো, তাদের হৃদয়ে দৃঢ়তার বাণী ফুৎকার কর অর্থাৎ **'লা তাখাফু ওয়া লা তাহযানু'** বা অনুরূপ বাণী সঞ্চার কর যার মাধ্যমে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হতে পারে। অতএব এসব আয়াত সাক্ষ্য বহন করে, খোদা তা'লা স্বীয় ওলীদের সাথে বাক্যালাপ করেন, তাঁদেরকে সম্বোধন করেন যেন তাঁদের বিশ্বাস ও অন্তর্দৃষ্টি দৃঢ় হয় আর তাঁরা যেন প্রশান্তি লাভ করেন।

একইভাবে খোদা তা'লা স্বীয় বান্দাদের اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ *(সূরা ফাতেহা : ৬-৭)*

দোয়া শিখিয়েছেন আর এটি জানা কথা, দিব্যদর্শন, ইলহাম, সত্যস্বপ্ন, ঐশী সংলাপ ও বাক্যালাপ হেদায়াতেরই বিভিন্ন রূপ– যাতে এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের রহস্য প্রকাশ পায় এবং নিশ্চিত বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বরং এই স্বর্গীয় কল্যাণধারা ছাড়া নিয়ামতের কোন অর্থই নেই। কেননা, এটিই আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাঁরা চান, যেন তাঁদের কাছে তত্ত্বজ্ঞানের নিশ্চিত নিগূঢ় রহস্যাবলী প্রকাশিত হয়। তাঁরা নিজ প্রভুকে এ পৃথিবীতেই চিনতে চান, আর ঈমান ও ভালবাসায় সমৃদ্ধি লাভ ও সম্পূর্ণভাবে নিজ প্রেমাস্পদের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া তাঁদের জীবনের পরম লক্ষ্য। সে কারণে খোদা তাঁর কাছে এই নিয়ামতের প্রত্যাশি হবার জন্য স্বীয় বান্দাদের হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। কেননা, খোদাকে পাওয়া, খোদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের পিপাসা সম্পর্কে তিনি তাঁদের হৃদয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তাই তিনি তাঁদের প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হন আর সত্যান্বেষীদেরকে সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন এবং তাঁদেরকে সকাল-সন্ধ্যা, দিবারাত্রি এর সন্ধানে রত থাকার নির্দেশ দেন। যতক্ষণ তিনি তাঁদের সে নিয়ামত প্রদানের ইচ্ছা না করেন ততক্ষণ তিনি তাঁদের সে নির্দেশ দেন না। বরং তাঁদের তা থেকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এবং সেসব নবীর উত্তরাধিকারী করার সিদ্ধান্তের পরই এই নির্দেশ দেন যাঁদেরকে তাঁদের পূর্বে হেদায়াতের সকল নিয়ামত সরাসরি বা ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে দেয়া হয়েছে। তুমি লক্ষ্য কর! খোদা আমাদের প্রতি কত অসাধারণ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাদেরকে উম্মুল কিতাবে অর্থাৎ সূরা ফাতেহায় নবীদের যাবতীয় হেদায়াত লাভের মানসে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁদের যোগ্যতা ও সংকল্প মোতাবেক– আনুগত্যের কল্যাণে ও প্রতিচ্ছায়া হিসেবে যা প্রকাশ করেছেন আমাদের জন্যও সেসব কিছু প্রকাশ করেন। কাজেই আমরা যদি হেদায়াত সন্ধানী হই তাহলে আল্লাহ্‌র সেই নিয়ামতকে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারি যা আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে? আর সবচেয়ে সত্যবাদী রসূল যে সংবাদ আমাদের দিয়েছেন তা পাবার পর কীভাবে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি?

আর জেনে রেখো! এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত ও হাদীস থেকে যা প্রমাণিত তা হলো, তিনি (সা.) বলেছেন, তোমাদের পূর্বে বনী ঈস্রাইলীদের মাঝে এমন মানুষও ছিলেন যারা নবী না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছেন আর আমার উম্মতে যদি এমন কেউ থাকে সে হলো উমর। পুনরায় বলেছেন, তোমাদের পূর্বে যে সকল উম্মত গত হয়েছে তাদের

মাঝে মুহাদ্দাসও ছিলেন। আমার এই উম্মতে যদি তাদের মতো কেউ থাকে তিনি হলেন, উমর বিন খাত্তাব। বুখারী শরীফের হাদীসে وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى (সূরা হজ্জ : ৫৩) আয়াতটি সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় তিনি এতে 'ওয়া লা মুহাদ্দাসিন' যোগ করতেন অর্থাৎ তিনি পড়তেন 'ওয়ামা আরসালনা মিন কাবলিকা মিন রাসূলিন ওয়া লা নবীঈন ওয়া লা মুহাদ্দাসিন।' এর বিস্তারিত উল্লেখ দেখতে পাবে ফাতহুল বারী গ্রন্থে। অতএব তোমার কাছে সত্য প্রতিভাত হওয়ার পর তা উপেক্ষা করো না আর চিন্তাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হও।

আমি আমার কোন কোন বইয়ে লিখেছি, মুহাদ্দাসের মর্যাদা নবীর পদমর্যাদার সাথে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই দুইয়ের মাঝে অন্তর্নিহিত যোগ্যতা এবং এর কার্যকারিতার পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য নেই। এরা আমার কথা না বুঝে বলে বসেছে, এই ব্যক্তি নবী হবার দাবী করে! খোদা তা'লা জানেন, তাদের এ কথাটি ঢাহা মিথ্যা, এর সাথে সত্যের কোন সংশ্রব নেই এবং প্রকৃতপক্ষে এর কোন ভিত্তিই নেই। মানুষকে নিছক কুফরী, গালমন্দ, অভিসম্পাত, শত্রুতা ও নৈরাজ্যে উসকে দেয়া আর মু'মিনদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টির উদ্দ্যেশ্যেই তারা একথা রটিয়েছে।

খোদার কসম! আমি খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি আর আমি বিশ্বাস রাখি, তিনি খাতামান নবীঈন। অবশ্য আমি একথা বলেছি, সকল তাহদিসেই (বান্দার সাথে খোদার কথোপকথন) নবুওয়তের অংশ পাওয়া যায় কিন্তু তা অন্তর্নিহিতভাবে থাকে কার্যতঃ নয়। অতএব মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও স্বরূপের দিক থেকে নবী হয়ে থাকেন। যদি নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ না হতো তাহলে কার্যতঃ তিনি নবীই হতেন। আর এ বিষয়ে আমাদের এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে, মোহাদ্দাসের পরম উৎকর্ষের নামই নবী। কেননা, তিনি তাঁর সকল গুণাবলীর সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন প্রতিফলন হয়ে থাকেন, কেবল তা বাস্তবে পর্যবসিত হয়নি। একইভাবে একথা বলাও বৈধ হবে, মুহাদ্দাস নিজ সুপ্ত গুণাবলীর নিরিখে নবী অর্থাৎ মুহাদ্দাস অন্তর্নিহিত যোগ্যতার নিরিখে নবী। নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ পুরোপুরিই মুহাদ্দাসের মাঝে প্রচ্ছন্ন ও সুপ্ত থাকে। নবুওয়তের প্রতিবন্ধকতাই কার্যতঃ এর প্রকাশ ও আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ রেখেছে। মহানবী (সা.) 'আমার পরে নবী থাকলে উমর নবী হতো' উক্তিতে এদিকেই ইশারা করেছেন। উমর (রা.)-এর মুহাদ্দাস হবার ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছেন। অতএব তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, মুহাদ্দাসের মাঝে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য ও বীজ সুপ্ত থাকে কিন্তু খোদা তা'লা সেই অন্তর্নিহিত যোগ্যতাকে কার্যকর রূপ দিতে চাননি। আর ইবনে

আব্বাসের **'ওয়া মা আরসালনা মির রসূলীন ওয়া লা নবীইন ওয়া লা মুহাদ্দাসিন'** কেরাআতটিও এ দিকেই ইঙ্গিত করে। দেখ! কীভাবে নবী, রাসূল ও মুহাদ্দাসদের এই কেরাআতে একই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে! আর খোদা তা'লা বলেন, তাঁরা সকলেই নিষ্কলুষ ও রাসূলদের অন্তর্গত।

নি:সন্দেহে, মুহাদ্দাসীয়্যত সম্পূর্ণভাবে খোদার দান। এটি আদৌ চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না। যেভাবে নবুওয়তের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তিনি মুহাদ্দাসদের সাথে সেভাবেই কথা বলেন, যেভাবে নবীদের সাথে কথা বলেন। মুহাদ্দাসদের সেভাবে প্রেরণ করা হয় যেভাবে রাসূলদের প্রেরণ করে থাকেন। মুহাদ্দাস সেই একই ঝর্না থেকে আধ্যাত্মিক সুধা পান করেন যেখান থেকে নবী পান করেন। যদি দ্বার রুদ্ধ না হতো তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী হতেন। রাসূলুল্লাহ্ যে হযরত উমর (রা.)-কে মুহাদ্দাস আখ্যা দিয়েছেন তার রহস্য এটিই, যার সাথে তাঁর এই উক্তিও রয়েছে, 'আমার পর নবী হবার থাকলে– উমর নবী হতো'। এটি কেবল এদিকে ইঙ্গিত করে একজন মুহাদ্দাস নিজের মাঝে নবুওয়তের যাবতীয় উৎকর্ষ ধারণ করে থাকেন। অতএব তফাৎ কেবল প্রকাশিত গুণ ও অন্তর্নিহিত গুণের এবং অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত যোগ্যতা এবং সেই যোগ্যতার বাহ্যিক প্রতিফলনের। কাজেই নবুওয়তের উপমা হলো, একটি বাহ্যিক ফলবতী গাছের মত, যা অজস্র ফলবহন করে আর তাহদীস এক বীজ সদৃশ যাতে অন্তর্নিহিত সেসব কিছু থাকে যা কার্যতঃ ও বাহ্যতঃ বৃক্ষে থেকে থাকে। যারা ধর্মের নিগুঢ় তত্ত্বের সন্ধানে থাকে তাদের জন্য এটি একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। 'আমার উম্মতের আলেমরা বনী ঈস্রাইলী নবীদের ন্যায়'-এ হাদীসে মহানবী (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এখানে ওলামা বলতে সেসব মুহাদ্দাসদের বুঝানো হয়েছে যাদেরকে নিজ প্রভুর সন্নিধান থেকে জ্ঞান দেয়া হয়ে থাকে এবং তারা সম্বোধিত হন।

কিছু সংখ্যক মানুষের জন্য নবুওয়ত ও তাহদীসের মাঝে পার্থক্য করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য শুধু অন্তর্নিহিত সুপ্ত যোগ্যতা ও প্রকাশিত কার্যে রূপায়িত ব্যক্তির। যেমনটি এখনই আমি বৃক্ষ ও বীজের দৃষ্টান্তের আলোকে স্পষ্ট করেছি। অতএব আমার এ কথা গ্রহণ কর আর খোদা ছাড়া কাউকে ভয় করো না। এছাড়া খোদার কাছে দোয়া কর যেন তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদের শ্রেণীভুক্ত হতে পার। এটিই আমরা মহানবী (সা.)-এর হাদীস ও কুরআন বর্ণিত বিষয়াবলীকে ভিত্তি করে আমাদের কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কোন কোন অতীত বুযূর্গ এই বিষয়ে যা বলে গেছেন তা আরও বড় কথা। তুমি কি ইবনে সিরিনের উক্তির প্রতি দৃষ্টি দাওনি, যখন তাঁর কাছে মাহদীর কথা বলা হলো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি কি আবু বকর (রা.) থেকে শ্রেষ্ঠ হবেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, আবু বকর (রা.)

কেন? তিনি কোন কোন নবীর চেয়েও বড় হবেন।

ফাতহুল বায়ানের লেখক সিদ্দিক হাসান– স্বীয় গ্রন্থ 'হুজাজ'-এর মাঝেও এই একই কথা বলেছেন। অনুরূপ কথা আরও আছে কিন্তু আমরা কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় তা থেকে বিরত থাকছি। অতএব পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তোমায় দেখা উচিত যেন, তোমার সামনে নিশ্চিত সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর তুমি যেন সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো। ত্বরাপ্রবণদের দৃষ্টিতে যা কুফরী বাক্য তার পুরোটা আমি তোমার মঙ্গলার্থে স্পষ্ট করেছি। অতএব দেখ! কোথায় এটি আর কোথায় নবুওয়তের দাবী। হে আমার ভাই! তুমি তেমন ধারণা করো না যেমনটি আমার ঈমান ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীরা মনে করে, আমি নাকি এমন এক কথা বলেছি যাতে নবুওয়তের দাবীর উপকরণ রয়েছে। বরং যা কিছু আমি বলেছি তা কুরআনের তত্ত্ব ও এর সূক্ষ্মতার ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছি। কর্মের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। আমাদের নবী সৈয়্যদেনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে খোদার পক্ষ থেকে খাতামান নাবীঈন নিযুক্ত করার পর নবুওয়তের দাবী করা থেকে আমি খোদার আশ্রয় চাই।*

---

* মুহাদ্দাসিয়্যত ও নবুওয়তের বিষয়ে নোট:

এই পুস্তকের ৪৮, ৯৭, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬ ও ১৪৯ পৃষ্ঠায় হযরত আকদাস (আ.) এক ধরনের নবুওয়ত লাভের বিষয়টি অস্বীকার করে এসেছেন, পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শরীয়তবিহীন ওহী একাধারে লাভ করার দাবীও বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন এবং এই ওহী প্রাপ্তির মর্যাদাকে মুহাদ্দাসিয়্যত বলে অভিহিত করেছেন। একই সাথে আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে তিনি মুহাদ্দাসের মর্যাদাকে অর্ন্তনিহিত যোগ্যতার দিক থেকে নবুওয়তের অনুরূপ বলেছেন, যা প্রচ্ছন্ন আকারে মুহাদ্দাসের মাঝে বিদ্যমান থাকে। এ বিষয়ে হুযূর (আ.) নিজেই পরবর্তীতে ১৯০১ সালে রচিত পুস্তিকা **'এক গলতি কা ইযালা'য়** আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "যে সব স্থানে আমি নবী বা রসূল হওয়া অস্বীকার করেছি, সেখানে এ অর্থেই করেছি, আমি শরীয়তদাতা নবী নই এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবীও নই। কিন্তু আমি আমার নেতা রসূল (সা.)-এর আত্মিক কল্যাণ লাভ করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে, তাঁরই মাধ্যমে খোদা হতে আমি গায়েবের জ্ঞান পেয়েছি। এ অর্থে আমি নবী ও রসূল।" এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে **'এক গলতি কা ইযালা'** পুস্তিকা ছাড়াও তাঁর লেখা **'বিভিন্ন বিজ্ঞাপন', 'হাকিকাতুল ওহী'**-সহ অন্যান্য পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য।

(অনুবাদকের পক্ষ থেকে)

তাদের আরেকটি আপত্তি হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ কিয়ামত সন্নিকটবর্তী যুগ ও এর বড় বড় লক্ষণাবলী প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আসবেন না অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব, দাব্বাতুল আরয, দাজ্জাল যার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে, পশ্চিম থেকে সূর্য উদিত হওয়া এ সকল লক্ষণের কিছুই প্রকাশিত হয়নি! কাজেই যেক্ষেত্রে লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়নি সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত মসীহ্ কীভাবে আসতে পারেন? আর হৃদয় কীভাবে প্রশান্ত হতে পারে এবং পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিত বিশ্বাস কীভাবে লাভ হতে পারে?

এর উত্তর হলো, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সবকটি পূর্ণ হয়েছে এবং সেভাবে ঘটেছে যেভাবে নির্বাচিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের সংকলনে রয়েছে। কিন্তু মানুষ তা চিনেনি আর তারা উদাসীনতার ঘোরে আচ্ছন্ন ।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, কিয়ামতের নিদর্শনাবলী দু'ধরনের, বড় বড় লক্ষণ ও ছোট ছোট লক্ষণ। ছোট ছোট লক্ষণাবলী সম্পর্কে মনে রাখতে হবে তা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পাবে, অবশ্য কখনও কখনও রূপকভাবেও প্রকাশ পায়। কিন্তু বড় বড় লক্ষণাবলীর বিষয়টি তা সত্যিকার অর্থে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পেতে পারে না, তা রূপকভাবে প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ের রহস্য হলো, আবির্ভাব ঘটবে হঠাৎ করে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(সূরা আ'রাফ : ১৮৮)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

(সূরা ইউসুফ : ১০৮, ১০৯)

তিনি বলেন,

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

(সূরা আম্বিয়া : ৪১)

পুনরায় বলেন,

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ
فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

(সূরা আল্ শুআরা : ২০১-২০৩)

আবার বলেন,

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

(সূরা যুখরুফ : ৬৭)

তিনি আরও বলেন, وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ (সূরা হজ্জ : ৫৬)

এসব উক্তি থেকে প্রমাণিত হলো, সন্দেহ নিরসনমূলক নিশ্চিত লক্ষণ আর কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হবার বাহ্যিক ও দ্ব্যর্থহীন লক্ষণাবলী কখনও প্রকাশ পাবে না। তা শুধু রূপক বা অর্থগতভাবে প্রকাশ পাবে যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হবে, রূপকতার আবরণে আবৃত না হয়ে সেগুলো প্রকাশ পাবে না। নতুবা বলো আকাশের দরজা কীভাবে খুলতে পারে আর তা থেকে মানুষের চোখের সামনে ঈসা (আ.) কীভাবে নাযিল হতে পারেন? আর তাঁর হাতে একটি বল্লম বা বর্শা থাকবে এবং সাথে ফিরিশ্‌তা অবতরণ করবে! ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হবে আর তা থেকে অদ্ভুত দাব্বাতুল আরয (মাটির কীট) নির্গত হবে, যা মানুষকে বলবে, খোদার দৃষ্টিতে একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম! ইয়াজুজ মাজুজ তাদের কিম্ভূতকিমাকার চেহারায় আবির্ভূত হবে। যাদের কান হবে অতি দীর্ঘ। দাজ্জালের গাধা আবির্ভূত হবে, মানুষ তার দু'কানের মাঝে ৭০ গজ দূরত্ব দেখবে। দাজ্জাল আবির্ভূত হবে, মানুষ তার সাথে জান্নাত-জাহান্নাম এবং সেই ধনভান্ডার দেখবে যা তার পিছে পিছে আসবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত সংবাদ অনুসারে– সূর্য পশ্চিম থেকে উদিত হবে। মানুষ আকাশ থেকে ক্রমাগত এই ঘোষণা শুনবে, মাহদী আল্লাহ্‌র খলীফা– এত সব সত্ত্বেও কাফিরদের হৃদয়ে সন্দেহ এবং সংশয় বিরাজ করবে এটা কীভাবে সম্ভব?

এ কারণে আমি আমার বইতে একাধিকবার লিখেছি, এ সবই রূপক বিষয়। এর মাধ্যমে খোদা তা'লা মানুষকে শুধু পরীক্ষা করতে চেয়েছেন যেন এটি প্রকাশ পেয়ে যায়, কে হৃদয়ের জ্যোতি দিয়ে এগুলোকে শনাক্ত করতে পারে আর কে ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা যদি ধরে নেই, এসব কিছু বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হবে, তাহলে নিঃসন্দেহ এর আবশ্যকীয় ফলাফল স্বরূপ সকল মানুষের হৃদয় থেকে সন্দেহ ও সংশয় সেভাবে দূরীভূত হবে যেমনটি কিয়ামত দিবসে হবার কথা। কাজেই এসব ভীতিপ্রদ ও বিস্ময়কর লক্ষণাবলী বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হবার পর সেদিনগুলো এবং কিয়ামত দিবসের ভেতর কি আর পার্থক্য থাকলো?

হে বুদ্ধিমান! চিন্তা করুন, সে যখন দেখবে, হাতে অস্ত্র নিয়ে আকাশ থেকে এক ব্যক্তি অবতরণ করছে। তার সাথে আছে এমন সব ফিরি্‌শতা, যারা পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে অদৃশ্য ছিল, মানুষ তাদের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করতো। তারা অবতরণের পর সাক্ষ্য দিবে, রাসূল সত্য আর একইভাবে মানুষ আকাশ থেকে আল্লাহ্‌র ঘোষণা শুনবে, মাহদী খোদার খলীফা। আর তারা দাজ্জালের

কপালে লেখা কাফির শব্দ পড়বে এবং দেখবে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হচ্ছে, আর মাটি ফেটে তা থেকে দাব্বাতুল আরয নামক সেই কীট বের হচ্ছে যার পা মাটিতে এবং মাথা গগন চুম্বী। সে মু'মিন ও কাফির উভয়কে প্রভাবিত করবে! তাদের চোখদ্বয়ের মাঝে অর্থাৎ কপালে মু'মিন বা কাফির লেখা থাকবে আর সে উচ্চস্বরে সাক্ষ্য দেবে, ইসলাম সত্য। তখন সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে আর সকল দিক থেকে ঝলমল করবে এবং ইসলামের সত্যতার জ্যোতি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে এমনকি গবাদি পশু, হিংস্র প্রাণী এবং বিচ্ছুও সাক্ষ্য দেবে, ইসলাম সত্য ধর্ম। অতএব এসব মহান নিদর্শন দেখার পর ধরাপৃষ্ঠে কীভাবে কেউ কাফির রয়ে যেতে পারে? বা খোদা ও কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে? কেননা সুবিদিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো এমন হয়ে থাকে যা কাফির, মু'মিন সবাই গ্রহণ করে। যাদেরকে মানবীয় বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে তারা এটি অস্বীকার করতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দিনের বেলা আকাশে যখন সূর্য থাকে আর মানুষ জাগ্রত থাকে, তখন মু'মিন বা কাফির কেউ-ই এর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না। একইভাবে যখন পুরো পর্দা উঠে যায়, সাক্ষ্য ক্রমাগতভাবে প্রকাশ পেতে থাকে, নিদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে, গোপন বিষয়াদী প্রকাশ পেয়ে যায় আর ফিরিশ্‌তারা প্রাকাশ্যে অবতরণ করে এবং আকাশ থেকে ঘোষণা শোনা যায় তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, এসব দিন ও কিয়ামত দিবসের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? আর অস্বীকারকারীদেরই বা পালানোর সুযোগ কোথায়? এ ক্ষেত্রে এমন সব কাফিরের স্বীকার করে নেয়ার বিষয়টি আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর কিয়ামত সম্পর্কে তাদের কোন সন্দেহও আর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়! কিন্তু কুরআন একাধিকবার বলেছে, কিয়ামত পর্যন্ত কাফিররা তাদের কুফরিতে অবিচল থাকবে। কিয়ামত সম্পর্কে তারা তাদের সন্দেহে নিপতিত থাকবে আর অকস্মাৎ তাদের অলক্ষ্যে কিয়ামত এসে যাবে। 'বাগতাহ্' অর্থাৎ 'অকস্মাৎ' শব্দটি এ কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে, সেসব লক্ষণ যার পর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না তা কখনও প্রকাশিত হবে না। আল্লাহ্ তা সেভাবে প্রকাশও করবেন না যার মাধ্যমে পর্দা পুরোপুরী উন্মোচিত হতে পারে আর যা কিয়ামত দর্শনের নিশ্চিৎ দর্পণ হিসেবে কাজ করতে পারে। বরং বিষয়টি কিয়ামত পর্যন্ত তত্ত্বগত বা ভাববাচক থেকে যাবে। সকল লক্ষণই প্রকাশ পাবে কিন্তু এমন প্রকাশ্য বিষয় হবে না যা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না বরং তা এমনভাবে প্রকাশ পাবে যা দ্বারা বুদ্ধিমানরা উপকৃত হবে ঠিকই কিন্তু অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্টরা একে স্পর্শও করতে পারবে না। কাজেই এ ব্যাপারে চিন্তা করুন, কেননা এটি চিন্তাশীলদের জন্য দৃষ্টি উন্মোচনকারী।

আপনি জানেন, দাব্বাতুল আরয (মাটির কীট) ও ইয়াজুজ মাজুজ ইত্যাদির আবির্ভাবের মত সংবাদগুলো এমন, যার বর্ণনায় হাদীস মতভেদ রাখে, একভাবে তা বর্ণনা করেনি। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, কোন কোন সাহাবী দাবী করেছেন যে হযরত আলী (রা.) হলেন দাব্বাতুল আরয (মাটির কীট)। তাঁকে বলা হলো, মানুষ আপনাকে দাব্বাতুল আরয মনে করে। তিনি বলেন, তোমরা কি জানো না, সে মানুষ হলেও তার সাথে কোন কোন পশুর আবশ্যক অনুষঙ্গগুলো বিদ্যমান থাকবে। তার গায়ে পশম ও পালক হবে, তার কিছু অংশ পাখির মত হবে আবার কোন অংশ হিংস্র প্রাণী-সদৃশ হবে, আর কোন দিক চতুষ্পদ জন্তু তুল্য হবে। একটি সুস্থ ও প্রবল গতি সম্পন্ন ঘোড়া অনবরত তিন বার দৌড়ে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে সেই দৈর্ঘ বা সমপরিমাণ রাস্তা বেড় দিয়ে বের হওয়া সত্ত্বেও তা তার মোট দৈর্ঘের দুই তৃতীয়াংশেরও কম হবে। অথচ আমি একজন জলজ্যান্ত মানুষ, আমার চর্মে পশম ও পালক কিছুই নেই। অতএব আমি কীভাবে দাব্বাতুল আরয হতে পারি? কেউ কেউ বলেছে, পবিত্র কুরআন যে দাব্বাতুল আরযের কথা উল্লেখ করেছে তা একটি গোষ্ঠীর নাম, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নয়। যখন মাটি বিদীর্ণ হবে ভূমি থেকে সহস্র সহস্র কীট বের হবে যাদের প্রত্যেককে দাব্বাতুল আরয নাম দেয়া হয়েছে। তাদের চেহারা মানুষের মতো হবে, তবে দেহ হবে হিংস্র প্রাণী, কুকুর ও গবাদি পশুর দেহ তুল্য। বলা হয়েছে, তা এমন যার গ্রীবা হবে দীর্ঘ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষ তাঁকে একই সময়ে সমানভাবে দেখবে। তার পাখির মত ঠোঁট হবে। তার উলের মত তুলতুলে পালক হবে ও তা পশমযুক্ত প্রাণী হবে। প্রাণীকূলের যতো রং হতে পারে এর মাঝে তার সব-ই থাকবে। তার চার পা হবে আর এতে সকল জাতির চিহ্ন থাকবে আর এই উম্মতের যে লক্ষণ তার ভেতর থাকবে তাহলো, সে মানুষের সাথে পরিষ্কার আরবী ভাষায় কথা বলবে। সে তাদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলবে। এটি ইবনে আব্বাসের ভাষ্য। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সে স্নায়ু ও পালকবিশিষ্ট হবে। তার শরীরে সকল প্রকার রঙ ও বর্ণের সমাহার ঘটবে। একজন দুরন্ত অশ্বারোহী একদিনে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তার দুই সিং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব ততটা হবে। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন সে কোমল কেশী, পশম ও পালকযুক্ত এক সৃষ্টি হবে। হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন সে পশম ও পালক বিশিষ্ট রক্তপিপাসু নেকড়ের মত। কোন শিকারী তাকে ধরতে পারবে না আর যে কোন পলায়নরত মানুষ তার কাছ থেকে পালাতে পারবে না।

হযরত আমর বিন আল আস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সে দীর্ঘকায় এক প্রাণী হবে, তার পদযুগল মাটিতে থাকলেও মাথা আকাশের উচ্চতায় পৌঁছবে আর আকাশকে স্পর্শ করবে। একটি প্রবল গতিসম্পন্ন ঘোড়া তিন দিন দৌড়ে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তা দাব্বাতুল আরযের দেহের এক তৃতীয়াংশের সমানও হবে না। হযরত ইবনে যোবায়ের (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এর মাথা গাভীর মাথার মত হবে আর চোখ হবে শূকরের চোখের ন্যায়, কান হবে হাতির কানের মত, তার শিং হরিণের শিং তুল্য, তার গ্রীবা উটের গ্রীবার মতো হবে, বক্ষ হবে সিংহের বক্ষের ন্যায়, রঙ হবে চিতা বাঘের। তার পাজর বিড়ালের পাজরের মতো, লেজ হবে ছাগলের মতো, তার পা হবে উটের পায়ের মত। তার দুই অস্থি-সন্ধির মাঝে দূরত্ব হবে ১২ গজ। আসেম বিন হাবীব বিন আসবাহান এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি– দাব্বাতুল আরয মুখ দিয়ে খাবে আর গুহ্যদ্বার দিয়ে কথা বলবে। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে যখন আবির্ভূত হবে তখন তার সাথে মূসার লাঠি এবং দাউদপুত্র সুলাইমানের আংটি থাকবে আর উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, মানুষ আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন। সে মু'মিন ও কাফির উভয়ের চেহারায় দাগাঙ্কন করবে বা চিহ্ন দেবে আর মু'মিনের চেহারা এর ফলে নক্ষত্রের ন্যায় ঝলমল করে উঠবে। দাব্বা (মাটির কীট) তার দুচোখের মাঝে অর্থাৎ কপালে মু'মিন শব্দ লিখবে আর সে কাফিরের দু'চোখের মধ্যে কাফের শব্দটি লিখবে একটি কালো রঙের তিলকের মত। অপর এক বর্ণনানুযায়ী, তার গলার স্বর হবে অত্যন্ত উঁচু আর প্রত্যেক ব্যক্তি যার হৃদস্পন্দন রয়েছে সে তা শুনবে। সে ইবলিসকে হত্যা ও চূর্ণবিচূর্ণ করবে। তার আবির্ভাবের সময় ও স্থান সম্পর্কে অদ্ভূত ধরণের সব মতভেদ রয়েছে। বর্ণনার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা তা উল্লেখ করছি না। তারা বলে সে একই যুগে ভিন্ন-ভিন্ন স্থান থেকে আবির্ভূত হবে। সে মক্কা থেকে আসবে আবার মদীনা থেকেও বের হবে। ইয়ামেন থেকেও বের হবে আর অলৌকিকভাবে তার রূপক চেহারা একই সময় বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হবে। এর মাধ্যমেই রূপক জগতের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আমার আশ্চর্য লাগে, আমাদের আলেমরা দাব্বাতুল আরযের আবির্ভাবের বেলায় এই সদৃশ্যগত বা অর্থগত বিষয়কে বৈধ জ্ঞান করে এবং বলে, একই সময় সে পূর্বে বা পশ্চিমে উপস্থিত থাকার ক্ষমতা রাখবে কিন্তু ফিরিশ্‌তার বেলায় এমন শক্তির অধিকারী হওয়াকে তারা বৈধ মনে করে না। তারা বলে, ফিরিশ্‌তা যখন আকাশ থেকে অবতরণ করে তখন আকাশ নাকি তাদের অস্তিত্বশূন্য হয়ে যায়! এটি স্পষ্টতঃই মূর্খদের চিন্তাধারা।

দাব্বাতুল আরযের অবস্থা বর্ণনায় একই ধরনের হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর এ সম্পর্কে এত বেশি স্ববিরোধ ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে যার কারণে কোন কোন সাহাবা মনে করেছেন, দাব্বাতুল আরয কোন একজন মানুষই হবে। এ কারণে তাঁরা ভেবেছেন, হযরত আলী (রা.)-ই হলেন দাব্বাতুল আরয। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোন কোন হাদীস বলে, দাব্বাতুল আরয মু'মিন হবে, যে মু'মিনদের সাহায্য করবে আর কাফিরদের লাঞ্ছিত করবে এবং সাক্ষ্য দেবে, ইসলাম ধর্ম সত্য। এমনকি সে ইবলিসকে হত্যা এবং টুকরো-টুকরোও করবে। কোন কোন হাদীস অনুসারে সে একজন কাফির নারী হবে, যে শয়তানের সেবিকা ও দাজ্জালের গুপ্তচর হবে আর তার মাঝে কল্যাণ বলে কিছু থাকবে না। অতএব এ উভয় ধরণের বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া ভার । এর একমাত্র সমাধান হল দাব্বাতুল আরয বলতে যদি আমরা এমন সব পাপাচারী আলেমদের বুঝি যারা মৌখিকভাবে সাক্ষ্য দেয়, রাসূল (সা.) সত্য আর কুরআনও সত্য, তা সত্ত্বেও নোংরা কাজে লিপ্ত এবং দাজ্জালের দাসত্ব করে। এমন মনে হয়, যেন তাদের অস্তিত্ব দু'টো অংশে বিভক্ত। এক অংশ ইসলামের সাথে আর অপর অংশ কুফরীর সাথে। তাদের কথা মু'মিনের কথার ন্যায় কিন্তু কাজ কাফিরের কর্ম তুল্য হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শেষ যুগে তাদের সংখ্যাধিক্য হবে। তাদের দাব্বাতুল আরয বা জগতের কীট নাম দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা জাগতিকতার প্রতি আকর্ষণ রাখবে আর আকাশের দিকে উত্থিত হতে চাইবে না। তারা ইহজগত এবং পার্থিব কামনা-বাসনা নিয়ে সন্তুষ্ট। তাদের মাঝে মানুষের হৃদয় থাকবে না। তাদের ভেতর হিংস্রপ্রাণী, শূকর ও কুকুরের অভ্যাসের সমাহার ঘটবে; আর তুমি তাদেরকে অহংকারী ও আত্মম্ভরী দেখতে পাবে। তারা যেন আকাশে পৌঁছে গেছে এবং একে স্পর্শ করেছে। জাগতিকতার প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে তাদের পা ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। কাজেই তারা সুঠাম দেহী এবং কারারুদ্ধ মানুষের ন্যায়। তারা মানুষের সাথে নিজেদের গুহ্যদ্বারের মাধ্যমে কথা বলবে, মুখের মাধ্যমে নয় অর্থাৎ তাদের কথায় পুণ্যবানদের * ন্যায় কোনরূপ পবিত্রতা, কল্যাণ, দৃঢ়চিত্ততা ও আলো বা জ্যোতি তুমি লক্ষ্য করবে না।

*** টিকা**

এক ব্যক্তি বলেছেন, যদি একথা সত্য হয়, দাব্বাতুল আরয বলতে এ যুগের আলেমদের বুঝায়; তাহলে তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া একটি ন্যায্য ও যথার্থ কাজ গণ্য হওয়া উচিত। দাব্বাতুল আরয এর বৈশিষ্ট্য হলো, সে মু'মিন ও কাফিরদের গায়ে

তাদের একটি আপত্তি হলো, তাদেরই এক প্রখ্যাত আলেম বলেছেন, আমি মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছি এবং তাঁকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে (অর্থাৎ এই গ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি সত্যবাদী, নাকি মিথ্যাবাদী? তিনি বলেন, সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁর সাথে ঠাট্টা করেছেন!★★এর উত্তর হলো, এই ব্যক্তি তার দু'জন দূত আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাদের একজনের নাম হলো খলীফা আব্দুল লতীফ আর অপরজন খলীফা আব্দুল্লাহ্ আল আরব। তারা আমার সাথে দেখা করতে

(চলমান টিকা:)

মার্কা মেরে দিবে। আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করে তারা বলে, দাব্বাতুল আরয− যাকে কাফির আখ্যা দেয়, তোমাদেরও তাকে কাফির হিসেবে মেনে নেয়া উচিত। কেননা, কাফির আখ্যা দেয়া দাব্বাতুল আরয কর্তৃক মার্কা মেরে দেয়ার নামান্তর। এই আপত্তিকারীর উত্তরে বলা হয় যে **'ওসমে'**র অর্থ হলো, কাফিরের অবিশ্বাস আর মু'মিনের ঈমান প্রকাশ করা। অতএব এই প্রকাশ হবে দু'ভাবে। কখনও কথা আর কোন সময় কাজ এবং এর ফলাফলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পাবে। খোদার চিরন্তন রীতি হলো, তিনি কাফির ও অবাধ্যদেরকে স্বীয় নবী ও ওলীদের ঈমানের জ্যোতি বিকাশের কারণ করে থাকেন। তুমি কি দেখ না, কীভাবে আবু জাহ্ল এবং তার মত লোকদের শত্রুতা আমাদের নবী (সা.)-এর নিষ্ঠাকে সমুজ্জ্বল এবং ঈমানকে জ্যোতির্ময় করার কারণ হয়েছে। আবু জাহ্ল এবং তার মত শত্রুরা যদি না থাকতো তাহলে হয়তো মুহাম্মদী সত্যনিষ্ঠতার অনেক জ্যোতি অপ্রকাশিত থাকার আশংকা থেকে যেতো। যখন আল্লাহ্ মানুষের মাঝে আপন নবীর সত্যতা প্রকাশের ইচ্ছা করলেন তখন আবু জাহ্ল ও অন্যান্য শয়তানতুল্য হিংসুক ও সীমালঙ্ঘনকারী শত্রু সৃষ্টি করলেন। তারা সকল ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে আর সম্ভাব্য সকল প্রকার কষ্ট দিয়েছে এবং ঊর্ধ্বলোক থেকে যে জ্যোতি অবতীর্ণ হয়েছে তা নির্বাপিত করার যাবতীয় অপচেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। পূর্ণ সত্য সমাগত হয়েছে মিথ্যা পালিয়েছে। তারা অপছন্দ করলেও খোদার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব এটি বলা যুক্তিযুক্ত হবে, আবু জাহ্ল এবং তার সমমনা লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর

★★ টিকা :

এই বুযুর্গ ব্যক্তির নাম পতাকাবাহী পীর সাহেব। তিনি সিন্ধু প্রদেশের একটি অঞ্চলে থাকেন। আমি শুনেছি তিনি সেখানকার বিখ্যাত পীরদের একজন। তার বয়আত করা জামা'তের লোক সংখ্যা এক লক্ষ বা এরও অধিক। (লেখকের পক্ষ থেকে)

ফিরোজপুরে আসে আর বলে, আমাদের পতাকাবাহী পীর আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে স্বপ্নে দেখেছি আর তাঁকে আপনার (দাবীর) বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে বলুন, এ ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী, প্রতারক, নাকি সত্যবাদী? মহানবী (সা.) বললেন, তিনি সত্য এবং খোদার পক্ষ থেকে। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আপনি খোদার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এরপর থেকে আমরা আপনার বিষয়ে আর আপনার পদমর্যাদা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করি না। আমরা সেভাবে কাজ করবো যেভাবে আপনি বলবেন। আপনি যদি আমাদের আমেরিকা যাবার নির্দেশ দেন, আমরা যাবো আর নিজেদের বিষয়ে আমাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা ইচ্ছা কার্যকর থাকবে না। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন। তাঁর দূতগণ এ কথাই বলেছেন, আর তারা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। বরং যার নাম আব্দুল্লাহ্ আল্ আরব তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। খোদা তা'লা তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ ও পুণ্যের ভাগী করেছেন। আমি মনে করি, তিনি একজন পুণ্যবান মানুষ, তিনি মিথ্যা বলেন না। তিনি খোদার পথে এবং ধর্মীয় কাজে প্রভূত সম্পদ ব্যয় করেছেন। ইসলামের নামকে সমুন্নত করার জন্য তার হৃদয়ে গভীর বেদনা রয়েছে। তিনি আমার কাছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়েই এসেছেন আর তাদের পীর সাহেব পাঠিয়েছেন বলেই এসেছেন। অতএব তুমি সততা ও ইনসাফের ভিত্তিতে চিন্তা করে দেখ। তাদের পীর সাহেব কি রসিকতামূলক কথা পৌঁছানো ও কষ্ট দেয়ার মানসে পুণ্যবানদের রীতি বহির্ভূতভাবে একটি দূরবর্তী দেশ থেকে শীতকালে পথ খরচ ও সফরের কষ্টে জর্জরিত করে তাদেরকে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন? এদের উভয়ই এখনও জীবিত আর পীর সাহেবও বেঁচে আছেন; যদি তোমার সন্দেহ থাকে তবে সেই দুইজনকে এবং পীর সাহেবকে জিজ্ঞেস কর। এছাড়া রসিকতা এবং ঠাট্টা করার বিষয়টি খোদার

(চলমান টীকা)

সত্যতা ও পবিত্র ঈমান এবং তাঁর মহান জ্যোতি প্রকাশের কারণ হয়েছে। একইভাবে আমরা বলি, দাব্বাতুল আরয, শয়তানের সেবক অর্থাৎ নোংরা ও বিশ্রী কথা বলবে, পুণ্যবান লোকদের ন্যায় পবিত্র কথা বলবে না। সে মু'মিনদের চিহ্নিত করবে অর্থাৎ সে তার ঈমানের জ্যোতি প্রকাশ করবে– যেভাবে আবু জাহ্‌ল খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর ঈমানের জ্যোতি প্রকাশের কারণ হয়েছে। কাজেই চিন্তা কর আর সীমালঙ্ঘণকারী বা উন্মাদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (লেখকের পক্ষ থেকে)

প্রতি আরোপ করা এমন স্পর্ধা, যার ভয়াবহতা তুমি নিজেই অনুমান করতে পারো। তুমি জানো, রসিকতা এক ধরনের মিথ্যা আর খোদার সাথে মিথ্যার সম্পর্ক দেখানো কোনভাবেই ঠিক নয়। কেননা, তা একটি নোংরামী ও অশোভনীয় কাজ। যুক্তি ও সর্বস্বীকৃত বিশ্বাস অনুযায়ী খোদা তা'লার সত্তায় এমন কোন দুর্বলতা থাকতেই পারে না। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত, খোদা তা'লা মিথ্যা বলেন না আর প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেন না। তাঁর মিথ্যা বলা অসম্ভব। কেননা, এতে দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও অনর্থক বাজে কাজের লেশ মিশানো আছে আর এতে বাড়তি ও ঘাটতির দিকও রয়েছে। খোদা তা'লা সকল ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে। তাঁর দেয়া সংবাদ, ওহী ও ইলহামের মাঝে মিথ্যার বৈধতা স্বীকার করা এমন সব বিপত্তির কারণ হবে, যা গণনা করে শেষ করা যায় না। **শরহে মওয়াকেফ'** এর লেখক বলেছেন, ঘটনাক্রমেও তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। খোদা যদি মিথ্যাবাদী হন তাহলে তাঁর মিথ্যাও আদি থেকেই চলে আসছে। কেননা, তাঁর সত্তার মাঝে নতুন কোন সংযোজন হতে পারে না। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, মিথ্যা কীভাবে তাঁর আদি গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? কেননা, তিনি যে সবচেয়ে বড় সত্যের ধারক।

তাদের একটি আপত্তি হলো, কুরআন থেকে প্রমাণিত, হযরত ঈসা (আ.) নিহত ও ক্রুশ বিদ্ধ না হয়ে আকাশে উত্থিত হয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি অবতরণ করবেন* আর দাজ্জালকে বধ করবেন। বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানাদি হবে। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করবেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কবরে সমাহিত হবেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মারা যাবেন না। ঈসার মৃত্যুর পূর্বে, যে যুগে খোদা মাহদীকে পাঠাবেন সে যুগে যে তিনি পৃথিবীতে আসবেন এ বিষয়ে ইজমা আছে। তিনি ইয়া'জুজ মা'জুজের বিরুদ্ধে দোয়া করবেন আর তারা তাঁর দোয়ায় মারা যাবে। সুতরাং এ সকল হাদীসকে কীভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে যা সম্পর্কে পূর্বাপরের সবাই অর্থাৎ সাহাবা,

*** টিকা ঃ**

*যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর **রাফা'**র পর পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের কথা থাকতো তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন। কিন্তু তিনি কেবল বলেছেন, তিনি অবশ্যই নাযিল হবেন বা অবতরণ করবেন। অতএব মহানবী (সা.)-এর **'রজু'** (প্রত্যাবর্তন) শব্দ বাদ দিয়ে **'নুযূল'** (অবতরণ) শব্দ বেছে নেয়া, এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ, তিনি ঈসা বলতে ভিন্ন কোন ব্যক্তি বুঝিয়েছেন, আল্লাহ্‌র নবী ও মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ.)-কে বুঝাননি।*

(লেখকের পক্ষ থেকে)

তাবেঈন ইমামগণ ও শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ একমত? এর উত্তর হলো, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এমন আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যা অকাট্য। পবিত্র কুরআন **'তাওয়াফফী'** শব্দ কেবল মৃত্যু দেয়া ও ধ্বংসের অর্থে ব্যবহার করেছে আর মহানবী (সা.) এ অর্থের সত্যায়ন করেছেন এবং সাহাবাদের মাঝে এমন একজন এ অর্থের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যিনি নিজ জাতির ভাষার বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন। তিনি কুরআনের তফসীর করার ক্ষেত্রে নীতি ও ধরন নির্ণয় করতেন। আরবী ভাষাতত্ত্বের গবেষণা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত। বুখারী শরীফে **'মুতাওয়াফ্ফীকা** শব্দ সম্বন্ধে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন এর অর্থ হলো–**'মুমিতুকা'** (নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যুদান করবো)। বুখারী শরীফের তফসীরকারক **'আইনী'** বলেছেন ইবনে আবু হাতেম তার পিতার পক্ষ থেকে জেনে তাকে বলেছেন, আর তিনি বলেন, আবু সালেহ্ আমাদেরকে বলেছেন, আমাদেরকে আলী ইবনে তালহা হযরত ইবনে আব্বাসের বরাতে জানিয়েছেন, **'মুতাওয়াফফীকা'** শব্দের অর্থ হলো, **'মুমিতুকা'**- অর্থাৎ আমি তোমার মৃত্যুদাতা। এছাড়া স্মরণ রেখো, হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে জীবিত আকাশে উত্থিত হবার বিশ্বাস সম্পর্কে ইজমার দাবী ভিত্তিহীন ও ঢাহা মিথ্যা। ইবনে আসীর তার রচিত **'আল্ কামেল'** গ্রন্থে বলেছেন, ঈসার **রাফা'** মৃত্যুর পূর্বে হয়েছে নাকি মৃত্যুর পর, সে বিষয়ে জ্ঞানীরা মতভেদ রাখেন। কেউ কেউ বলেছেন, মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর **রাফা'** হয়েছে আর কতকের মতে তিনি তৃতীয় বা সপ্তম প্রহরে ইন্তেকাল করেছেন। মোতাজেলী ও জাহ্মীয়া মতাদর্শের অনুসারী এক শ্রেণীর মতামত হলো, তিনি সশরীরে উত্থিত হননি বরং মৃত্যুর পর তাঁর আধ্যাত্মিক **রাফা'** হয়েছে। যেভাবে তাঁর **রাফা'** আধ্যাত্মিক ছিল সেভাবে তাঁর অবতরণও আধ্যাত্মিক অর্থে হবে। সহীহ্ বুখারী'তে ইমাম বুখারী (রহ.) পবিত্র কুরআন, হাদীস ও কয়েকজন সাহাবীর উক্তির আলোকে তাঁর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন। অতএব তাঁর জীবিত অবস্থায় রাফা' এবং মৃত্যুর বিপক্ষে ইজমা বা সর্বসম্মত স্বীকৃতির দাবী কিভাবে সাব্যস্ত হয়? একইভাবে মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর কবরে তাঁর সমাহিত হবার ব্যাপারেও একমত নয়। **'আইনী'** বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি পবিত্র ভূমিতে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) সমাহিত হবেন। অনুরূপভাবে তাঁর অবতরণ স্থল সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার ভাই ঈসা আফীক পাহাড়ে হেদায়াত দাতা ইমাম এবং ন্যায় বিচারক হিসেবে আবির্ভূত হবেন। দাজ্জালকে বধ করার জন্য তাঁর হাতে অস্ত্র থাকবে। তখন যুদ্ধ থেমে

যাবে। নঈম বিন হাম্মাদ, যোবায়ের বিন নফীর ও শুরাইহ্, আমর বিন আসওয়াদ এবং কাসীর বিন মুররার বরাতে বর্ণনা করেছেন, এরা সবাই বলেছেন, দাজ্জাল শয়তান বৈ অন্য কেউ নয় অর্থাৎ সে শেষ যুগে আত্ম প্রকাশ করবে এবং মানুষের হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করবে। মসীহ্ (আ.) তাকে স্বর্গীয় অস্ত্র তথা জ্যোতি বা আলোর মাধ্যমে বধ করবেন। সাহাবীদের মাঝে যাঁরা তাঁর অবতরণে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা শুধু নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান রাখতেন। সাহাবীদের পর যারা এর সাথে ব্যাখ্যা যোগ করেছে তারা ভুল করেছে। তাদের মতামত অনুসরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। তারাও আমাদের মতই মানুষ। খোদা তা'লা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর স্বীয় ইলহামের মাধ্যমে আমাদের সামনে সেই বিষয়টি উন্মোচন করেছেন যা তাদের কাছে উন্মোচিত হয়নি। এটি খোদার সেই অপার অনুগ্রহ; যা তিনি মু'মিন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান দান করেন।

খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, তৌরাত হলো ইমাম অর্থাৎ এ উম্মতে ঘটিতব্য প্রতিটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত এতে রয়েছে। সে কারণে তিনি বলেন, فَسْـَٔلُوٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ *(সূরা আম্বিয়া : ৮)* কিন্তু আমরা তৌরাতে আক্ষরিক বা দৈহিক নুযুলের (অবতরণের) কোন নজির দেখিনি বরং তাতে আত্মিক অবতরণের একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এ বিষয়টি আমরা এলিয়া নবীর অবতরণের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। অতএব সুস্থ ও বিশ্বস্ত বিবেক নিয়ে চিন্তা কর। একই সাথে প্রমাণিত হলো, ভবিষ্যত ঘটনাবলী যেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সা.) বা অন্যান্য নবীরা সংবাদ দিয়েছেন তা প্রচলিত ধারণানুসারে বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হয়নি বরং এর কতক আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছে আর কতক রূপক অর্থে। কাজেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে যেখানে এটি হচ্ছে খোদার রীতি, সেখানে মসীহ্র আগমনের সংবাদ বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হবার এমন কি প্রমাণ আছে? আর এর রূপকভাবে পরিপূর্ণতা কেন অবৈধ হবে? বরং আমরা যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাই তাহলে বিবেকের দাবী মোতাবেক যে সমস্ত বিষয় বড় কিয়ামতের লক্ষণ তা রূপকভাবেই বা অর্থগতভাবে পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। কেননা, কিয়ামত কেবল অকস্মাৎই ঘটবে। কুরআনের আয়াতে বর্ণিত ঘটনাবলী হুবহু সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহবাদীদের সন্দেহ নিরসন হবে না। কিন্তু যদি আমরা বড় লক্ষণাবলীর আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হওয়া বৈধ মনে করি তাহলে অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিতে কিয়ামত কিন্তু আর কাল্পনিক বিষয় থাকে না। তাই আমাদের এ বিশ্বাস করা আবশ্যক, কিয়ামতের বড় লক্ষণাবলী বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হবে না। একইভাবে **'নুযুল'** বা অবতরণও এক ব্যক্তির মাঝে

রূপকভাবে হবে যিনি গুণাবলীর দিক থেকে তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখবেন, যেভাবে নবীদের কিতাবে এলিয়া নবীর অবতরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঈসা (আ.) দাজ্জালকে নিজ অস্ত্র দ্বারা হত্যা করবেন বলে যে সব হাদীসের সাক্ষ্যের কথা তারা বলে, সে সম্পর্কে স্মরণ থাকা উচিত, হাদীস এ বিষয়ে সর্বসম্মত মত রাখে বলে আমরা মনে করি না বরং ঈসা সম্পর্কে বুখারী শরীফে যে হাদীস রয়েছে অর্থাৎ মহানবীর উক্তি **‘ইয়াযাউল হারব’** এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে, ঈসা (আ.) কোন যুদ্ধাস্ত্রের মাধ্যমে দাজ্জালকে হত্যা করবেন না। অতএব যেখানে মহানবী (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন, সেখানে তিনি কীভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারেন? অতএব এতে কোন সন্দেহ নেই, দাজ্জাল বধের অস্ত্র হবে আধ্যাত্মিক যা আকাশ থেকে আসবে, যেভাবে ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার ভাই ঈসা বিন মরিয়ম আফিক পাহাড়ে ন্যায় বিচারক, হেদায়াত দাতা ইমাম হিসেবে আবির্ভূত হবেন, তাঁর হাতে একটি বল্লম থাকবে যদ্বারা তিনি দাজ্জালকে বধ করবেন। এ হাদীস থেকে প্রতিভাত হয়, এই অস্ত্র স্বর্গীয়, জাগতিক নয় আর সেই হত্যাও একটি আধ্যাত্মিক বিষয়, দৈহিক নয়। এছাড়া দাজ্জাল বলতে যেখানে শেষ যুগের শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার নিজের মত লোকদের উপর ভ্রষ্টতার ছায়া প্রসারিত করবে... সেখানে দৈহিক হত্যার কি অর্থ হতে পারে? তারা একথা লিখেননি, সে তার নিহত হবার পর কি কবরস্থ হবে নাকি তাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে? অথবা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে নাকি বাগাড়ে নিক্ষিপ্ত হবে, যাকে পাখি ভক্ষণ করবে? এ সবকিছু এ কথার নিশ্চিত প্রমাণ, এক্ষেত্রে হত্যা বা বধ করার বিষয়টি হলো, একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। জেনে রেখো! ঈসার অস্ত্র যা তাঁর সাথে আকাশ থেকে নাযিল হবে সেটি তাঁর নিঃশ্বাসের অস্ত্র যার মাধ্যমে তিনি সকল কাফিরকে বধ করবেন। তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা বিবেকবানদের ন্যায় কেন চিন্তা কর না? তুমি জানো, কোন কোন হাদীস অনুসারে দাজ্জাল হলো শয়তান, তাই ইবলিসকে হত্যার অস্ত্র আধ্যাত্মিক অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতএব যুদ্ধ রহিত হবার হাদীসটি সঠিক যা বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে আর সে সকল হাদীস যা এর বিরোধী তা মাটিতে পুতে ফেলার যোগ্য বা এর ভিন্ন কোন অর্থ করতে হবে। যে এ বিষয়ে বিতর্ক করে সে সেই হাদীসটি ভুলে গেছে যা আল্লাহ্‌র কিতাবের পর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। এটিই সত্য আর অপরিণামদর্শী ও উদাসীন ছাড়া কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই চিন্তা কর আর ত্বরাপ্রবণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

মাহদীর আগমন সংক্রান্ত হাদীসগুলো সম্পর্কে তুমি জানো, এর সবগুলোই দুর্বল এবং নানা আপত্তিতে ক্ষত বিক্ষত। আবার এগুলোর একাংশ অপরাংশের বক্তব্য বিরোধী। এমনকি ইবনে মাজাহ্ শরীফ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এটিও বর্ণিত হয়েছে, ঈসা ছাড়া অন্য কোন মাহদী নেই। অতএব এত কঠিন বিরোধ, অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এসব হাদীসের উপর কিভাবে নির্ভর করা যেতে পারে? মুহাদ্দিসের অজানা নয়, এসব হাদীস-বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে।

সারকথা হলো, এ সকল হাদীসের কোন একটিও স্ববিরোধ ও অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতির থেকে মুক্ত নয়। অতএব এর সবক'টি এড়িয়ে চল আর হাদীসের বিতন্ডাকে কুরআন সমীপে উপস্থাপন কর এবং একে হাদীসের বিচারক নির্ধারণ কর যেন তোমার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর তুমি যেন হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো। চরম স্ববিরোধ, অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং নির্ভরযোগ্যতার মানদন্ডে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও যদি তুমি এসব হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে কর, আর সেক্ষেত্রে তুমি যদি সত্যিই নিশ্চিত বিশ্বাসের পথ অবলম্বন করতে চাও তাহলে মনে রেখো স্বাধীনচেতা এমন কিছু মানুষ আছে যারা সুনিশ্চিত ও অসীম সেই কুরআনকে অবলম্বন করে মিথ্যা যার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না। তাদের আপত্তিগুলোর একটি হলো, এ ব্যক্তি হযরত মসীহ্‌কে পাখির স্রষ্টা, মৃতের জীবনদাতা, পবিত্রতার ক্ষেত্রে বিশেষত্বপ্রাপ্ত, স্বতন্ত্র এবং শয়তানের স্পর্শ থেকে সুরক্ষিত বলে বিশ্বাস করে না যেসব বৈশিষ্ট্যে নবীদের কেউই তাঁর সমতুল্য নন। এর উত্তর হিসেবে জেনে রেখো! আমরা নিদর্শস্বরূপ তাঁর অসাধারণ জীবন দান ও নিদর্শনস্বরূপ অসাধারণ সৃষ্টিতে বিশ্বাস রাখি। কিন্তু অন্য কারো পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র মত প্রকৃত জীবন দান ও আল্লাহ্‌র মত প্রকৃত সৃষ্টিতে আমরা বিশ্বাস করি না। যদি বিষয় প্রকৃতপক্ষে এমনই হয় তাহলে খোদার সৃষ্টি করা ও পুন:র্জীবন দানের বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে যাবে। খোদা তা'লা বলেছেন, فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ *(সূরা আলে ইমরান : ৫০)*। তিনি, **'ফাইয়াকুনু হাইয়ান বিইযনিল্লাহে'** বলেননি। আর একথাও বলেননি, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে পাখি হয়ে থাকবে। ঈসার পাখি বানানোর বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে মূসার লাঠির মতো একটি বিষয়। বাহ্যতঃ তা সাপের মত দৌড়াতে দেখা গেছে কিন্তু নিজ মূল বৈশিষ্ট্যকে এটি স্থায়ীভাবে কখনও পরিত্যাগ করেনি। একইভাবে গবেষকরা বলেন, হযরত ঈসার সৃষ্ট পাখি মানুষের সামনে উড়তো আর দৃষ্টির আঁড়ালে গেলেই মাটিতে পড়ে যেতো এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতো। তাহলে এ থেকে প্রকৃত জীবন লাভ কীভাবে সাব্যস্ত হলো? জীবিত

করার বিষয়টির স্বরূপও এমনই, অর্থাৎ তিনি কখনও কোন মৃতের ক্ষেত্রে, জীবনের সকল আবশ্যক বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে দিতে পারেননি। বরং তিনি নিজ পবিত্র আত্মার প্রভাবে মৃতের জীবনে প্রাণের একটি ঝলক দেখাতেন। যতক্ষণ ঈসা সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতেন, মৃত– জীবিত দেখা যেত আর যখন তিনি চলে যেতেন মৃত তার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতো এবং মরে যেতো। কাজেই এটি প্রকৃতপক্ষে একটি নিদর্শনমূলক জীবনদান, আক্ষরিক বা বাহ্যিক নয়। প্রকৃত ঘটনা যে এটাই আল্লাহ্ তা'লা তা খুব ভালই জানেন। এরপর এর সাথে মানুষের কথার ভ্রান্তি মিশ্রিত হয়েছে আর তাতে তারা যা চেয়েছে যোগ করেছে। যার কাছে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির বিন্দুমাত্র জ্যোতি আছে তার এ বিষয়টি অজানা নয়। অতএব আয়াতগুলোর অর্থ ও মর্ম সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ যেন ভ্রষ্টতা ও অন্ধকার তোমা হতে দূরীভূত হয় এবং তুমি দৃষ্টিবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো।

তাদের একটি আপত্তি হলো, খোদা তা'লা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী যুগে মসীহ্র **'নুযুল'** বা অবতরণের সংবাদ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন وَاِنَّهٗ لَعِلۡمٌ لِّلسَّاعَةِ *(সূরা যুখরুফ : ৬২)*। উত্তরে তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–

وَاِنَّهٗ لَعِلۡمٌ لِّلسَّاعَةِ তিনি একথা বলেননি, **'ইন্নাহু সা ইয়াকুনু ইলমান লিস্ সাআ'** (অর্থাৎ তিনি কিয়ামতের নিদর্শন হবেন)। কার্যতঃ যে বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল তদনুযায়ী তিনি কিয়ামতের নিদর্শনই ছিলেন। এটি এমন নয় যা ভবিষ্যতে কোন এক সময় হবে। যেই বিশেষত্বের নিরিখে তিনি কিয়ামতের নিদর্শন ছিলেন তা হলো, বিনা পিতায় তাঁর জন্ম নেয়া। এর বিবরণ হলো ইহুদীদের একটি ফিরকা **'সদুকী'**রা কিয়ামতে বিশ্বাস করতো না। খোদা তা'লা তাদের কোন কোন নবীর ভাষায় সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের স্বজাতির মধ্য থেকে বিনা পিতায় এক ছেলে জন্ম নিবে, সে তাদের জন্য কিয়ামতের নিদর্শন হবে আর وَلِنَجۡعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ এবং وَاِنَّهٗ لَعِلۡمٌ لِّلسَّاعَةِ *(সূরা মারিয়াম-২২)* আয়াতদ্বয়ে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ সদুকীদের জন্য তাঁকে নিদর্শন বানিয়েছি।

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, এ আয়াতে **'ইন্নাহু'** সর্বনাম কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা, কুরআন অগণিত মানুষকে জীবিত করেছে এবং কবর থেকে তাদের উত্থান করেছে আর এই আধ্যাত্মিক উত্থান, দৈহিক উত্থান বা কিয়ামতের প্রমাণ বহন করে যেভাবে **'মুয়াল্লেমুত তনজীল'** ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সারকথা হলো, وَاِنَّهٗ لَعِلۡمٌ لِّلسَّاعَةِ আয়াতটি মসীহ্র অবতরণের প্রতি ইঙ্গিত করে না বরং এটি প্রমাণিত ও উপস্থিত যুক্তির মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের মুখ বন্ধ করে। সে কারণেই বলেছেন, **'ফালা তামতারুন্না বিহা'**

এ ধরনের কথা এমন কোন নিদর্শনের জন্য বলা যাবে না, পরে যার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি আর যা কোন বিরোধীও দেখেনি।

তাদের একটি আপত্তি হলো, তারা বলে–ইনি যদি সেই মসীহ্ হন যাঁকে ক্রুশ ভঙ্গ করা ও শূকর বধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে-তাহলে তাঁর আগমনের পর শতাব্দীর শিরোভাগে ১১ বছর কেটে গেলো; কোন্ ক্রুশটি ভাঙ্গা হলো, আর কোন্ শূকরই বা বধ হলো, কোন্ যুদ্ধকরই বা রহিত করা হলো এবং কে-ই বা কুফরির পথ পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলো?

উত্তর হলো, সত্য হঠাৎ করে আসে না বরং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবনে আব্বাসের বরাতে 'আইনি'র কর্মে লিখা রয়েছে, ঈসার অবস্থান হবে ১৯ বছর, তিনি রাজা-বাদশাহ্ বা স্বৈরশাসক বা রাজ্যপতি কোনটাই হবেন না। রসূলুল্লাহর জীবনের ১৩টি বছর মক্কায় কেটেছে। সে সময় তাঁর সাথে দুর্বলদের ছোট্ট একটি জামাত ছাড়া আর কেউ ছিল না। তৌরাতে তাঁর যে সমস্ত লক্ষণাবলী লেখা আছে তার ভেতর রোম, সিরিয়া এবং পারস্য বিজয়ের সংবাদও আছে। মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় তা পূর্ণ হতে দেখেনি। খোদার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু খোদার কাছে ফিরে যাবার পূর্বে তাবত জাতি ও দেশের বেশীর ভাগ মানুষ তাঁর অনুসরণ করেনি বরং প্রথম যুগে তিনি কেবল সমস্যার পর সমস্যাই দেখেছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে– জাতি তাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, তাদের দোষারোপ করেছে, প্রত্যাখান করেছে এবং মিথ্যার ছলে তাঁদের সম্পর্কে সকল দুস্কৃতিমূলক কথা রটিয়েছে? একইভাবে তারা সকল নবীদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আর প্রথম যুগে, এঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আর্থিক অনটনেরই শিকার ছিলেন। এই পরীক্ষার ভেতর দীর্ঘকাল কেটেছে শেষ পর্যন্ত, এরা বলে উঠলেন, খোদার সাহায্য কবে আসবে! তখন যারা ধ্বংস হবার ছিল ধ্বংস হয়ে গেল; যেভাবে খোদা তা'লা বলেন, اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ

وَلَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلۡزِلُوۡا

حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ (সূরা বাকারা : ২১৫)

একইভাবে এ যুগের মানুষ আমাকে হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে উদ্যত বা গভীর অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করতে ব্যগ্র এবং সত্যকে পদতলে পিষ্ট করার প্রয়াসী। এরা সবুজ ও সতেজ বৃক্ষকে সেভাবে জ্বালিয়ে দিতে চায় যেভাবে শুষ্ক ঘাস জ্বালিয়ে ফেলা হয়। তারা যে চক্রান্ত করে এর মোকাবেলায় খোদা তা'লাই আমার একমাত্র সহায় আর তিনিই সবচেয়ে উত্তম সাহায্যকারী। আর তাঁর পক্ষ থেকে যে সাহায্যের কথা তারা অস্বীকার করে তা এমন বিষয় যা তুমি অচিরেই

কেবল দেখবে, কিন্তু শুনবে না। বরং সত্যকথা হলো, ইতোমধ্যে এর লক্ষণাবলী চক্ষুষ্মানদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে।

যুগের মানুষ খোদার একত্ববাদের দিকে কীভাবে ফিরে আসছে, পৌত্তলিকদের দেশে কীভাবে ইসলামের সুশীতল বাতাস বইছে আর কীভাবে প্রত্যেক দেশে মানুষ খোদার ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করছে– তুমি কি তা দেখছো না? এটি মানুষের সংশোধনকল্পে আবির্ভূত ব্যক্তির সাথে ঊর্ধ্বলোক থেকে অবতীর্ণ সেই জ্যোতির বিকাশ ছাড়া আর কিছুই না। তুমি যদি ন্যায়পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক তাহলে এর তুলনায় বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? হে অসহায় ব্যক্তি! জাগ্রত হও আর স্বর্গীয় অস্ত্রের মাধ্যমে কীভাবে ক্রুশ ভঙ্গ হয় এবং শূকর বধ হয় তা দেখার জন্য চোখ মেলে তাকাও। রইল জাগতিক অস্ত্রবলে মানুষ নিধনের বিষয়টি– এটি কোন অভিনব বিষয়ই নয়। দেশের অধিপতি রাজা বাদশাহ্‌রা কি একই কাজ করেন না? অতএব এ ক্ষেত্রে তুমি খোদার আধ্যাত্মিক অস্ত্রের অন্বেষণ কর আর অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

আমি এখনিই বলেছি, দাজ্জাল শয়তান ছাড়া আর কেউ নয়। যারা তার অনুসরণ করবে সে তাদের হৃদয়ে কুমন্ত্রনা সৃষ্টি করবে আর তারা তার কর্মীবাহিনী হিসেবে কাজ করবে, তাদের ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতপক্ষে এরই কাজ হবে। এ যুগে মসীহ্ মাওউদ ফিরিশ্‌তার সাহায্যপুষ্ট ও স্বর্গীয় অস্ত্রসহ আবির্ভূত হবেন আর সেই শয়তান ও তার শূকরদের বধ করবেন। এ দিকেই কুরআন বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত ও ইশারা করেছে, তিনি শেষ যুগে বিজয় লাভ করবেন। আর যাদের উপর শয়তান অবতরণ করে তারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়িয়ে বেড়াবে। এরা সকল উচ্চতা থেকে ধেয়ে আসবে। তখন আল্লাহ্ স্বর্গীয় শিঙ্গায় ফুৎকার করার মাধ্যমে বান্দাদের সত্যের পতাকাতলে সমবেত করবেন। আর এমনটি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এক তকদীর ছিল।

এটি ঐশী রহস্যাবলীর অন্তর্গত বিষয় এবং ঐশী রীতি। মানব হৃদয়ে শয়তানের আধিপত্যের যুগে তিনি যখন তাদের সংশোধন চান, নিজ বান্দাদের একজনের হৃদয়ে স্বীয় প্রেরণা সঞ্চার করেন আর তাঁর সাথে ফিরিশ্‌তা বাহিনী থাকে এবং সকল দিক থেকে ফিরিশ্‌তা অবতরণ করে। তাঁরা তাঁর বান্দাদের এই বলে প্রেরণা যোগায়, সোচ্চার হও আর সত্য গ্রহণ কর। তাঁরা তাঁদের কাছে আসে এবং সত্য গ্রহণকল্পে এবং বিপদাবলী মোকাবেলায় শক্তি জোগায়। এ ধরণের প্রেরণা বা আত্মিক আকর্ষণ নবী, রসূল বা মুহাদ্দাসের আগমন ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু অজ্ঞরা সে রহস্য বুঝে না যা থেকে হেদায়াতের মৃদু সমীরণ বিচ্ছুরিত

হয়। এরা সে বিষয়ে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয় আর দৈব দূর্বিপাকের পথে পা বাড়ায়। আল্লাহ্ যে সব কিছুর জন্য একটি কারণ নির্ধারণ করে রেখেছেন তারা এ বিষয়টিকে গভীরভাবে ভেবে দেখে না। আর কার্য-কারণ ছাড়া জগতে কোন কাজই সম্পন্ন হয় না। এসব লোকের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ইহজগতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তারা ভাসা ভাসা চিন্তাভাবনা নিয়ে সন্তুষ্ট কিন্তু তারা গভীরভাবে অভিনিবেশ করে না।

সত্যকথা হলো, আদম সন্তানের হৃদয়ে শয়তানের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ যেমন আছে তেমনটি তাঁর ফিরিশ্তার প্রতিও আর্কষণ রয়েছে। খোদা যখন নবী বা, রাসূল বা মুহাদ্দাসদের মধ্য থেকে কোন সংস্কারক প্রেরণ করতে চান তখন ফিরিশ্তার প্রতি এর আকর্ষণকে শক্তিশালী করেন আর মানুষের অন্তর্নিহিত যোগ্যতাসমূহকে সত্য গ্রহণের অনুকূলে প্রবাহিত করেন। তিনি তাদেরকে এমন বিবেক-বুদ্ধি, মনোবল, বিপদ সহ্য করার শক্তি আর কুরআনের এমন ব্যুৎপত্তি দান করেন যা সে সংস্কারকের আগমনের পূর্বে থাকে না। ফলে তাদের চিন্তাধারা স্বচ্ছতা লাভ করে, তাদের বুদ্ধি ও মেধা প্রখর হয় এবং মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এমন মনে করে যেন তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে, অদৃশ্য থেকে তার হৃদয়ে এক প্রকার আলো অবতরণ করা হচ্ছে আর তার ভেতরে একজন প্রশিক্ষক জাগ্রত হয়ে গেছে। মানুষের মাঝে এমন এক পরিবর্তন এসে যায়– মনে হয় যেন, খোদা তাদের প্রকৃতি ও স্বভাব বদলে দিয়েছেন। তাদের মন, মনন এবং চিন্তাধারায় তিনি প্রখরতা সৃষ্টি করেছেন। অতএব এসব লক্ষণের সমাহার ও প্রকাশ নিশ্চিতভাবে এই সাক্ষ্য বহন করে, সবচেয়ে বড় মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হয়েছেন এবং যে আলো প্রকাশিত হবার কথা ছিলো তা প্রকাশ পেয়েছে। খোদা তা'লা সূরা কদরে এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ (সূরা কদর : ২-৬)

আপনি জানেন, ফিরিশ্তা ও রুহুল কুদুস কেবল যথাসময় ও প্রয়োজনে অবতরণ করে। খোদা তা'লা তাদেরকে বৃথা ও নিরর্থক প্রেরণ করার মত বাজে কাজ করা থেকে ঊর্ধ্বে। অতএব এখানে রূহ্ প্রেরণ করা প্রকৃতপক্ষে একজন নবী রসূল বা মুহাদ্দাস প্রেরণের প্রতি ইঙ্গিতবিশেষ। তাঁর প্রতি এই রূহ্ বা ফিরিশ্তা প্রেরণ করা হয়। ফিরিশ্তা প্রেরণ আসলে ফিরিশ্তার অবতরণের প্রতি ইশারা, যারা মানুষকে

সত্য, হেদায়াত, দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রতি আকর্ষণ করে। আল্লাহ্ তা'লা অন্য এক স্থানে বলেন, اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا *(সূরা আনফাল : ১৩)* অর্থাৎ তাদের হৃদয়কে টেনে আন আর তাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে, দৃঢ়তাকে ও অবিচলতাকে আকর্ষণীয় করে তোল। ফিরিশ্তা যখন আসে তখন এটিই তাদের কাজ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, তিনি এ উম্মতকে কখনও ধ্বংস হতে দেবেন না বরং যখনই তারা বিভ্রান্ত হবে আর অন্ধকারে নিপতিত হবে, তাদের জন্য লাইলাতুল কদরের যুগ আসবে এবং রুহুল কুদুস পৃথিবীতে অবতরণ করবে আর সূরা কদরে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাঁকে পছন্দ করবেন তাঁর প্রতি ফিরিশ্তা প্রেরণ করবেন এবং তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ নিযুক্ত করবেন। অধিকন্তু রুহুল কুদুসের সাথে অনেক ফিরিশ্তা নাযিল হয় যারা মানব হৃদয়কে সত্য ও হেদায়াতের প্রতি আকর্ষণ করে। অতএব এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কাজেই তুমি সন্ধান কর–পেয়ে যাবে, আর দরজার কড়া নাড়ো তোমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। নিশ্চয় এটি এমন এক যুগ, যখন নানাবিধ পার্থিব নিয়ামত ও আধুনিক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তোমরা, তোমাদের বাহন, পোষাক এবং তোমাদের সমাজ সভ্যতায় নিত্য-নতুন নিয়ামত লক্ষ্য করে থাকো। পদার্থবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিক উন্মোচিত হয়েছে। বস্তুবাদী মানুষকে মনে হয় যেন তারা তাদের আধুনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আকাশের সীমায় পৌঁছে গেছে, আর তারা এমন সকল জিনিষ অবলোকন করে যা সবার বুদ্ধি বিবেককে হতবাক করে দেয় আর যুক্তি যেখানে পিছিয়ে থাকে। আমরা সর্বত্র নতুন নতুন শিল্প, নতুন প্রযুক্তি ও এমন সব সূক্ষ্ম এবং বিস্ময়কর কাজ দেখতে পাই যা প্রকাশ্য যাদুর ন্যায়।

পূর্ববর্তীদের মাঝে আমরা এ সকল শিল্পশৈলীর কোন চিহ্ন খুঁজে পাই না। এমন মনে হয়, পুরনো জগতের স্থলে যেন নুতন কোন জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব যেখানে প্রমাণিত হলো, পৃথিবীতে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ঢল নেমেছে আর খোদা তা'লা নিজ কুদরতবলে জাগতিক জ্ঞানের পর্দা উন্মোচন করেছেন, সেখানে আকাশের দ্বার খুললে এতে তোমার আশ্চর্য হবার কী আছে? আমার প্রভু– আমার প্রতি ইলহাম করেছেন এবং বলেছেন, **'ইন্নাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা কানাতা রাতকান ফাফাতাকনাহুমা'**। অতএব এ রহস্যকে অনুধাবন কর আর বিশ্ব প্রতিপালকের করুণা সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না।

তুমি জানো, আধুনিক যুগে একজন চরম দিনহীন ব্যক্তিও এমন এমন নিয়ামত উপভোগ করে যা তার পিতা, পিতামহ বরং অতীতের বাদশাহ্রাও দেখেনি।

এমন কি সোলায়মান (আ.)-ও সর্ব প্রকার সম্মান লাভ করা সত্ত্বেও তা দেখেননি। অতএব খোদা তা'লা যেখানে বান্দাদের জাগতিক নিয়ামতে ভূষিত করেছেন সেখানে তোমরা কীভাবে ভাবতে পারো, তিনি তাদেরকে স্বীয় আধ্যাত্মিক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন? অতএব আমরা তোমার সামনে যা বর্ণনা করলাম সে সম্পর্কে চিন্তা কর আর তুমি যদি খোদাভীরু হয়ে থাকো তাহলে খোদা ও সত্যের অনুসারীদের কাছে নিজের যুক্তি পেশ কর। হে ত্বরাপ্রবণ ব্যক্তিরা! খোদা যতক্ষণ নিজ সিদ্ধান্ত প্রদান না করেন ততক্ষণ ধৈর্য ধর। তোমাদের কী হয়েছে, তোমাদের মাঝে বিরাজমান অকূল নৈরাজ্য কি তোমাদের চোখে পড়ে না? মু'মিনরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে খোদা এ অবস্থায় তাদের পরিত্যাগ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পবিত্রকে অপবিত্র থেকে পৃথক করে না দেন। অতএব খোদার নিদর্শন প্রকাশের দিন সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না। কেননা, তিনি দয়ালু।

তাদের একটি আপত্তি হলো, তারা বলে, ওলীরা কখনও আমরা অমুক বা তমুক বলে দাবী করেন না বরং তাদের অবস্থা এবং তাদের আচার-আচরণ তাদের ওলী হবার পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। যে দাবী করে, সে খোদার ওলী নয় বরং নিঃসন্দেহে সে মিথ্যাবাদী। এর উত্তরে জেনে রেখো, খোদার নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ অতীতের বুযূর্গ মনীষীরা **ওয়ালায়েতের** (খোদার সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব লাভের) বিষয়টি প্রকাশ করাকে বৈধ জ্ঞান করতেন। আর সম্মানিত মুজাদ্দিদ শেখ আহমদ সরহিন্দীর গ্রন্থ এ ধরনের কথায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ *(সূরা দোহা : ১২)* ইবনে জরীর তাঁর তফসীরে– আবু ইয়াসরা গিফারী'র বরাতে বর্ণনা করেছেন, সাহাবারা কৃতজ্ঞতাবোধকে কেবল তখনই কৃতজ্ঞতা জ্ঞান করতেন যখন তা প্রকাশ করা হতো। কেননা, খোদা তা'লা বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ *(সূরা ইব্রাহীম : ৮)*

দেলমী 'ফেরদৌস'এ আর আবু নঈম 'হুলিয়া'য় বলেন, হযরত ইবনে ওমর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে এমন বানিয়েছেন যেন আমার উপর আর কেউ নেই। মানুষ তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি খোদার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ বলেছি। অপর দিকে খোদা বলেছেন, فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ *(সূরা নজম : ৩৩)* নিজেকে নিজে পবিত্র ঘোষণা করা এবং খোদার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের বহির্প্রকাশের মাঝে তফাৎ করতে শেখো, যদিও উভয় অবস্থা আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর সদৃশ। তুমি যদি নিজে উৎকর্ষের দাবী কর আর মনে কর, আমি কিছু একটা হয়ে গেছি আর তোমার সে-ই স্রষ্টাকে ভুলে যাও যিনি

তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাহলে এটি হবে নিজেকে নিজে পবিত্র ঘোষণা করার পরিচায়ক। কিন্তু তোমার যাবতীয় উৎকর্ষকে তুমি যদি তোমার প্রভুর প্রতি আরোপ কর আর বিশ্বাস কর, সকল নিয়ামত তাঁর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আর উৎকর্ষের কোন বহিঃপ্রকাশ দেখে তুমি নিজেকে সেখানে প্রত্যক্ষ কর না বরং এক্ষেত্রে সর্বত্র খোদার শক্তি, কুদরত, অনুগ্রহ ও কৃপা তোমার চোখে পড়ে। নিজের প্রতি কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব বা যোগসূত্র আরোপ কর না, বরং নিজেকে সেই মৃত লাশের ন্যায় দেখতে পাও, যে সম্পূর্ণভাবে গোসলদাতার ইচ্ছা অনিচ্ছার অধীনস্থ। তাহলে এটিই হলো খোদার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে যাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে তারা তড়িঘড়ি আপত্তি করতে উদ্যত। তারা খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট কৃতজ্ঞ বান্দাদের এবং লোক দেখানোর ব্যাধিতে আক্রান্ত মিথ্যাবাদীদের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। পরস্পর সাদৃশ্যের কারণে বিষয়টি তাদের কাছে ঘোলাটে হয়ে যায়। তাদের আপত্তির উত্তরে এই হলো আমাদের শেষ বক্তব্য। খোদা তা'লা তাদের এবং আমাদের মাঝে মীমাংসা করবেন, কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মিমাংসাকারী।

জেনে রেখো! এছাড়া তাদের আরও অনেক দুর্বল আপত্তি আছে বরং তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিটি সূক্ষ্মতাই তাদের দৃষ্টিতে আপত্তিকর। আমরা তাদের বড় বড় আপত্তিগুলোর উত্তর প্রদান করে শেষ করলাম। ছোটোখাটো দুর্বল আপত্তিগুলোর বিষয়ে মনে রাখতে হবে, এ গ্রন্থে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়নি। আর এই পুস্তকটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে পূর্ণ নিরাময়কারী একটি পুস্তক, যা একান্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পাঠ করলে আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা এ পুস্তকে খোদার কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নত থেকে অনেক সঠিক, সুনিশ্চিত ও দৃঢ় প্রমাণাবলী মালার মত গেঁথে উপস্থাপন করেছি। আর বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথভাবে যুক্তি তুলে ধরেছি। খোদা তা'লা জানেন, আমি তাদের আপত্তির খন্ডন করতে গিয়ে কোন আমিত্বের আশ্রয় নিইনি। আর কেউ আমার প্রতি শত্রুতা রাখে- শুধু এ কারণেই আমি কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করি না। পৃথিবীতে সে ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ আমার শত্রু নয়, যে খোদা ও তাঁর রসূলের শত্রু। তাঁদের জন্যই আমার প্রতিশোধ নেয়া। যারা গালি দেয় আমি তাদের গালি দেই না আর যারা অভিশাপ দেয়, আমি তাদের অভিশাপ দেই না। আমি আমার একান্ত পবিত্র ও মূল্যবান সময় বৃথা কাজে নষ্ট করি না। আর আমি আমার বিষয় খোদার হাতে সোপর্দ করছি, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

আমার প্রভু যদি আমাকে লাঞ্ছিত করেন তাহলে কে আছে যে আমাকে সম্মান দিতে পারে? আর তিনি যদি আমাকে সম্মানিত করতে চান তাহলে কে আমাকে লাঞ্ছিত করতে পারে? কাজেই আমার সব বিষয় খোদার হাতে ন্যস্ত। তাঁর দৃষ্টিতে যদি আমার কোন মূল্য থেকে থাকে তাহলে তিনি আমাকে তাঁর ক্রমবর্ধমান ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে রাখবেন। আর তা না হলে তিনি আমাকে অপমানিত ও অপদস্থ অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন। তিনি ছাড়া আমাকে ধ্বংস করতে পারে বা পরিত্রাণ দিতে পারে এমন কাউকে আমি চিনি না। আমি তাঁর কৃপার আশা রাখি আর তাঁর সাহায্যের অপেক্ষায় থাকি। তিনি আমার প্রভু, আমার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেছেন এবং আপন নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন। আমার হৃদয়ে কি আছে তা তিনি সম্যক অবহিত আর তিনিই পরম দয়ালু। আমি কেবল তাঁর দ্বারেই মাথা পেতে মৃত্যুবরণ করতে চাই। আর জয় পরাজয় যাই আসুক না কেন তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত আমি কোন অবস্থাতেই তা পরিত্যাগ করবো না। খোদা ছাড়া আর কে সাহায্য করতে পারে? তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক ও সর্বোত্তম সাহায্যদাতা। আমার জাতি আমাকে কষ্ট ও অভিশাপ দিয়েছে এবং কাফির আখ্যায়িত করেছে আর তারা বলে, এ ব্যক্তি কাফির ও দাজ্জাল। আমার এমন এমন নাম রেখেছে যা তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করবে না। আমাকে এমনসব উপাধি দিয়েছে যা তারা নিজেরা পেতে চায় না। আমার ঈমান সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে। অতএব আমার সকল বিষয় খোদার সামনে সোপর্দ করছি, আমার ও তাদের হৃদয়ে কি আছে তা তিনি ভাল জানেন। কোন গোপন কথা তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নয়। বিশ্ববাসীর মনের খবর আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত স্মরণ করাচ্ছি :

إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِينَ

(সূরা হুজরাত : ৭)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(সূরা হুজরাত : ১১)

وَأَقْسِطُوا ؕ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(সূরা হুজরাত : ১০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ○

(সূরা হুজরাত : ১২-১৩)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

(সূরা নিসা : ৯৫)

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

(সূরা বাকারা : ১৯৫)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ

(সূরা আ'রাফ : ৫৭-৫৯)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

(সূরা আসসফ : ১০)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

(সূরা বাকারা : ২৫২)

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ

(সূরা ফাতের : ১১)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

(সূরা মু'মেন : ৫৭)

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(সূরা আয্ যারিয়াত : ৫১)

খোদা তা'লা আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী প্রদান করে বিশেষত্ব দান করেছেন, আমার কথা ও বাণীকে আশিষমন্ডিত করেছেন। আমার দোয়ায় বরকত সৃষ্টি করেছেন এবং আমার শ্বাস-প্রশ্বাস, আমার আবাস স্থল ও গৃহের দেয়ালসমূহে তিনি আধ্যাত্মিক জ্যোতি অবতীর্ণ করেছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমার সাথে থাকেন। আর তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন শত্রুভাবাপন্ন বিরোধীরা বুঝতে পারে, ইসলামে এটি একটি স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত নিয়ামত। আর মুসলমান ছাড়া বাইরের লোকদের এর মাঝে কোন অংশ নেই। আর তারা যেন এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে, খোদার দৃষ্টিতে মুসলমানদের পদমর্যাদা কেমন? অতএব খোদার কসম! এটি একটি সত্য বিষয়। যে সুস্থ হৃদয় ও সঠিক মনমানসিকতা নিয়ে আমার কাছে আসতে চায় আর কল্যাণমন্ডিত হবার মানসে কাকুতি-মিনতি করে, আমার আহাজারি ও বিগলিত চিত্তের দোয়ায় সে তার আরাধ্য বিষয়টি লাভ করবে এবং সকল ক্ষেত্রে সে সফলতা লাভ করবে। দুর্ভাগ্যবশত সে ব্যতিত যার অনুকূলে সৌভাগ্য-লেখনি শুকিয়ে গেছে। হে আমার ভাই! আমি আমার এই কাহিনী-বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে তোমার সামনে তুলে ধরেছি। অতএব আমার এই পুস্তকটি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর আর এ বিষয়ে সুবিচার কর, আমি তোমার একজন হিতাকাঙ্খী।

সকল ক্ষমতাধরের সর্বাধিপতিকে তুমি ভয় কর। তিনি প্রকৃত সর্বাধিরাজ বা অধিপতি যাঁর নূরের ছটায় আকাশ ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সবকিছু আলোকিত। তাঁর প্রতাপে ফিরিশ্তারা ত্রস্ত আর আর্‌শ তাঁর মহিমায় সদা কম্পমান। তিনি পুণ্যবান মু'মিনদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত নির্ধারণ করেছেন যার ধারা কখনও বন্ধ হবে না এবং এমন জীবন লাভের বিধান করেছেন যার পর কোন মৃত্যু নেই। হে সম্মানিত কাবাগৃহের প্রতিবেশীগণ অর্থাৎ আরব মুসলমানগণ! আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের মাঝে অনেক গুণাবলীর সমাহার ঘটিয়েছেন আর তাঁর দয়ার নিদর্শন স্বরূপ আপনাদের এমন এক হৃদয় দান করেছেন যা সত্যের সমর্থনে স্পন্দিত। হে সম্মানিত জাতি! অতএব আমার ব্যাপারটিতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন। এটি এমন বিষয় নয় যা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া যায়। কেউ জানে না কখন উর্ধ্বলোকে কার ডাক পড়বে। জেনে রেখো! এ দিনগুলো হলো, নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও চরম নৈরাজ্যের যুগ। পৃথিবী ভয়াবহভাবে প্রকম্পিত হয়েছে, ইসলামের বিরুদ্ধে বিপদাপদ অনেক বৃদ্ধি

পেয়েছে। অতএব খোদার প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ কর, তুফান ও প্লাবনের যুগকে ভয় কর এবং সেই সুদৃঢ় হাতলকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধর যা কখনও ভাঙ্গার নয়, আর মহাসম্মানিত প্রভুর সন্তুষ্টির সন্ধান কর। তাঁর ভয়কে প্রাধান্য দিয়ে অন্য সব ভয়ভীতিকে পদপিষ্ঠ কর।

আমরা খোদার নিকট আকুতি করবো, তিনি যেন নিজ সন্নিধান থেকে তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য দান করেন আর বিশ্বাসযোগ্য ইলহাম করেন। আর দৃষ্টিভ্রম এবং কুধারণাবশত তড়িঘড়ি করে কোন মতামত ব্যক্ত করা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেন। আমরা তাঁর কাছে দোয়া করবো, তিনি যেন তোমাদের নিজ রাজত্বে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

আমাদের শেষ দোয়া হলো, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক-প্রভু।

লেখক

সামাদ খোদার মুখাপেক্ষী

গোলাম আহমদ (খোদা তাকে মার্জনা করুন এবং সাহায্য করুন)

১৩১১ হিজরী, রবিউল আউয়াল মাসের শেষের দিকে লেখা, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান।

একটি খুব সুন্দর কবিতা

যুগে বিরাজমান নৈরাজ্য সম্পর্কে দয়ালু খোদার পথের দিশারী এক ব্যক্তির আবশ্যকতা এবং সৃষ্টিকূলগর্ব নবীকূল শিরোমনির প্রশংসায় এই পুস্তক রচয়িতার খুব সুন্দর একটি কবিতা:

আমার দেখা অরাজকতা উল্লেখ করতে আমার অশ্রুবন্যা বয়ে যাচ্ছে,
মুষলধারে বর্ষণরত টানা বৃষ্টির মত নানাবিধ নৈরাজ্য আমি অবলোকন করছি।

ধ্বংসাত্মক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু সবদিকে বয়ে চলেছে,
মানুষের পুণ্য হ্রাস পেয়েছে আর ভ্রষ্টতা অনেক বেড়ে গেছে।

হেদায়াতের আবাসভূমি প্রচন্ড কম্পনে আজ প্রকম্পিত,
তাকওয়ার নির্মল ঝর্ণার পানি ঘোলাটে হয়ে আজ কর্দমাক্ত।

কোন আর্তনাদই যেন ঊর্ধ্বলোকে আর গ্রহণযোগ্য নয়,
কোন দোয়াই যেন গৃহীত হয়ে আর সাহায্য বয়ে আনতে পারছে না !

দুস্কৃতি ও অবাধ্যতার ধ্বংসাত্মক প্লাবন যখন চারিদিকে ফুঁসে উঠলো,
মনে হলো এর চেয়ে জীবননাশী মহামারী দেখা দিলেই বুঝি ভাল হতো !

কেননা বুদ্ধিমানের কাছে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার চেয়ে,
মানুষের পক্ষে বরং মরে যাওয়াটাই অধিক উত্তম ও শ্রেয়।

ইসলামের রক্ষাপ্রাচীর আজ দৈবদুর্বিপাকের শিকার,
এটি সে সব পাপের কারণে যা প্রসারমান ও ক্রমবর্ধমান।

নৈরাজ্যের আগুন সর্বত্র দাউ দাউ করে জ্বলছে,
সকল প্রকার পাপ অনেক গভীরে শিকড় গেড়েছে।

চারিদিক থেকে সকল নেকড়ে ও চিতা থাবা মেরে চলেছে,
আর বিচ্ছুর দলগুলোও তাদের হুল ফুঁটিয়ে যাচ্ছে।

ঐশী গ্রন্থ প্রদত্ত হেদায়াতের ঝর্ণার নির্মল পানি আজ কলুষিত,
কেননা এ ঝর্ণায় বন্য গাভী ও বন্য হরিণ নির্দ্বিধায় চরে বেড়াচ্ছে।

ভ্রষ্টতা প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর মত দেখা দিয়েছে,
অমানিশার কালো রাত তার ভ্রষ্ঠতার জাল বিস্তার করেছে।

ধর্ম-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষগুলোকে আমি এক ভিখারীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি,
এর গৌরবোজ্জ্বল অতীত স্মরণে আমার চোখ থেকে অশ্রুগঙ্গা বয়ে চলেছে।

আমি এ যুগকে মিছে নিদ্রায় আচ্ছন্ন দেখছি,
আর প্রত্যেক অজ্ঞকে দেখছি তার কুপ্রবৃত্তির মাঝে অহংকারে নিমজ্জিত।

আমি তারকা বিহীন অমানিশার কালো রাত দেখতে পাচ্ছি যেন তা হরিণের কালো চোখ,
আর এমন রোগ বালাই প্রত্যক্ষ করছি যার ভয়াবহতা দিচ্ছে মৃত্যুর অশনি সংক্ষেত।

এরা নোংরামী এবং ঔদাসিন্যের কারণে খোদার পথ ভুলে গেছে,
বিদ্রোহ, অবাধ্যতা ও জোচ্চুরী ছাড়া এদের আর কোন কাজ নেই।

এদের সব মাথাব্যাথা নিছক নিজ স্বার্থ ও পাওনা নিয়ে,
এদের সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমান ভোগ-বিলাসকে কেন্দ্র করে।

এরা অজ্ঞতাবশত সুপেয় দুধ নষ্ট করেছে,
ফাটা দুধটুকু ছাড়া পেয়ালায় এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

যমদূত উন্মুক্ত তরবারী হাতে এদের শিয়রে দাঁড়ানো,
এরা কার্পণ্যের রাজা অনুশোচনা এদের কাছে ধারেও ভিড়ে না !

জগত আপন ভয়াবহ চক্রান্তের জালে এদের শিকার করছে,
বড়ই আর্শ্চযজনক এই পৃথিবী এবং এর ষড়যন্ত্র!!

জগত এদেরকে দারিদ্র, ক্ষুধা ও অনাহারের বিষয়ে ভয় দেখায়,
আর এসবের ছত্রছায়ায় সে এদেরকে নানাবিধ পাপের দিকে আহ্বান করে।

সে এর অধিবাসীদের উদাসীনতার সুযোগে ধ্বংস করতে উদ্ধত,
এসব ইতরের মনোবলও সে হরণ করেছে, পায়ের রগও কেঁটে দিয়েছে।

জগত সত্য ধর্ম সম্পর্কে এদের হৃদয়কে উদাসীন করে দিয়েছে,
এরা পার্থিব চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে একেই অবলম্বন করেছে।

এর চাকচিক্যময় মুখায়ব লেলিহান আগুনের দিকে পরিচালিত করে,
এর ঔজ্জ্বল্য ও ঝলকানী হৃদয়কে মোহগ্রস্থ ও প্রতারিত করে।

যে ধ্বংস হবার তাকে এ হাতছানি দিয়ে নিজের দিকে ডাকে,
ফলে নবীনরা প্রত্যেকেই এর নিকটবর্তী হয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়।

চক্রান্তের ছদ্মাবরণে সে কুমারীর ন্যায় মোহনীয় ভঙ্গীতে হাঁটে,
সে কৃত্রিম চাকচিক্য প্রকাশ করে মানুষকে প্রতারিত করে।

এর চক্রান্ত বড়ই সূক্ষ যার রহস্য বুঝা দায়,
কেননা সে এর জাল বড়ই দক্ষতার সাথে বুনেছে এবং রহস্যাবৃত করে রেখেছে।

কখনও একে এর চক্রান্তের ফলে আত্মরক্ষাকারী ঢাল বলে মনে হয়,
কখনও বা তা নগ্ন ধারালো তরবারী সম হয়।

এর প্রবল সম্মোহনী দৃষ্টি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে,
আর ব্যাভিচারীদের ধ্বংসের তরে এ যেন এক কৃষকটি রমনীর সাজে উপস্থিত।

আমি এই বার্ধক্যে উপনীত বৃদ্ধাকে দেখে হতবাক,
আর সে দর্শকদের চোখে অতীব মোহনীয় ও ফুলসম।

এর সৌন্দর্য দেখে সংযমকে নিজের তরে আবশ্যক করে নিলাম,
প্রভু! তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় ও প্রত্যাবর্তনস্থল বলে দোয়া করলাম।

তাই আমার প্রভু একে আমার সেবাদাসী বানিয়ে দিয়েছেন,
এমন দাসী যার সাক্ষাত বা বিচ্ছেদ আমার ইচ্ছাধীন।

এটি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল খোদার অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়,
রক্ষাকর্তা খোদা যাখে চান এটি দান করেন, কেউ বা বঞ্চিত হয়।

এ জগত স্বীয় প্রেমিকদের জন্য বড়ই সংকীর্ণমনা ও নিরস,
তারা প্রবল প্রেম ও আকর্ষণে এর পিছু ছুটে আর সে তাদের প্রদর্শন করে পৃষ্ঠ।

এর অভিলাষীরা এরই লাশের চারিপাশে কুকুরের মত হামলে পড়ে,
কিন্তু এদের অবস্থা দেখে মৃত্যুও এদেরকে তিরস্কার করে।

এর প্রতি আসক্তিই হলো সব ভ্রান্তির মূল,
অতএব যে চক্ষুষ্মান! একে ভালোবাসার ব্যাপারে সাবধান!!

এরই ধারালো দাঁতগুলো এর পূজারীদের পিষেছে,
তুমি তাদেরই স্মৃতিচিহ্ন, তাই তোমাকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।

প্রতিটি হৃদয়ে জগতের অন্ধকার ছেয়ে গেছে,
কেবল সেই সৌভাগ্যবান হৃদয় ছাড়া যাকে স্বাচ্ছন্দ্যদাতা স্বয়ং রক্ষা করেছেন।

আমি যখন মুসলমানদের এর লোভে কুকুর-সদৃশ দেখতে পেলাম
আমার নয়ন বেয়ে অশ্রু বন্যা গড়িয়ে পড়লো আর মন হলো ভীত ত্রস্ত।

আমি এদের পাপাচারিতা ও উদাসিনতা সম্বন্ধে যখন অবহিত হলাম,
আমি ধৈর্যচ্যুত হয়ে কেঁদে ফেললাম, এক্ষেত্রে আমি ধৈর্য রাখতেই পারি না।

এরা পৃথিবীর প্রেমে আঁছড়ে পড়েছে আর প্রবৃত্তির মোহে এরা আচ্ছন্ন,
অথচ ধর্মের প্রাসাদে এক সর্বগ্রাসী নেকড়ে হানা দিয়েছে।

চারিদিকে অমানিশার ঘোর অন্ধকার, কেন আমি মরলাম না হায়!
পেয়েছি আলোর অমৃত সুধা, তাই আমার মরা হলো দায়।

এমন এক নৈরাজ্য বিরাজ করছে যা ধ্বংসাত্মক তুফান সম,
আমি একে সমুদ্রের ঢেউসম দেখছি বরং এটি আরও ভয়াবহ।

আমি পরীক্ষা কবলিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত দেখছি,
আর দুর্বল চিত্ত প্রত্যেক মানুষ এক্ষেত্রে হোঁচট খেতে বাধ্য।

এদের দুরাবস্থা ও কর্মফল আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে,
এমতাবস্থায় আমার প্রভু ছাড়া আর কে আমার চিকিৎসা ও সাহায্য করবে?

হে আমার প্রভু! আমার মনিবের উম্মতের এই দুর্দশা সুধরে দাও,
এ কাজটি আমাদের জন্য অতীব কঠিন হলেও তোমার জন্য একেবারেই সহজ।

তুমি টেনে না তুললে কেউ উন্নতি করতে পারে না,
তুমি কারও ভাগ্যে না রাখলে কেউ কারও তৃষ্ণা মেটাতে পারে না।

উপর্যপুরি বিপদের কষাঘাতে ছিন্ন-বিছিন্ন আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা ,
আমরা মৃত, অতএব এখন আমাদের কৃত পাপের কথা না বলে আমাদের উদ্ধার কর।

আমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তুমি সুদূর প্রসারী খড়গ উন্মুক্ত করো না,
হে অপদস্ত জাতির খোদা! তুমি সদয় দৃষ্টিপাত কর আর মার্জনা কর।

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিলে
আমরা নির্ঘাত লাঞ্ছিত মৃত্যুর শিকার হবো আর শত্রুপক্ষ বড়াই করবে।

তুমি আমায় সাহায্য না করা পর্যন্ত আমি এই রণক্ষেত্র ত্যাগ করবো না,
ধ্বংস বা সফল্য এর বাইরে আমার জন্য কোন বিকল্প নেই।

আমি জানি, আমাদের পাপ অনেক বড়,
কিন্তু একই সাথে এটিও জানি, তোমার কৃপা বৃহত্তর।

হে প্রভু! আমাদের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ কর, আমাদের পরিতৃপ্ত কর এবং সম্মান রক্ষা কর,
আমরা তোমার সুমহান শক্তির দোহাই দিয়ে মিনতি করি কেননা তুমিই সরচেয়ে ক্ষমতাধর।

আমরা মানুষের সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে নিরাশ আর আশা-ভরসার সকল দুয়ার রুদ্ধ,
হে সেই মহান অস্তিত্ব যে গোপন বিষয়ে অবগত! আমরা কেবল তোমারই দ্বারস্থ হয়েছি।

হে তুমি, যাঁর উৎকর্ষ সীমাহীন! তুমি অতীব মহিয়ান ও গরিয়ান,
সকল প্রশংসা তোমারই, যা গুনে শেষ করা বা আয়ত্তে আনা যায় না!

তোমার মহিমা অনুযায়ী তুমি আমাদেরকে স্নেহ-ভিক্ষা দাও,
তুমি যেমন ক্ষমতাধর, তদনুযায়ী তোমার (দুর্বল) বান্দাদের সামলে নাও।

হে আমার প্রভু! সর্বক্ষেত্রে তুমি আমার হাত ধরে রেখো,
আর সেই অসহায় নি:সম্বল মানুষটিকে সাহায্য করো যাকে অভিশপ্ত ও কাফের বলা হয়েছে।

আমি তোমার দ্বারে সর্বস্বান্ত-রিক্তহস্ত হয়ে এসেছি, আর তোমার সাহায্য হলো বিরাট ও বিশাল,
আমি তোমার কাছে পিপাসার্ত রূপে এসেছি, আর তোমার সাগর সুপেয় পানিতে টইটুম্বুর।

নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের ছাপ ম্লান ও মলিন হয়ে গেছে,
তাই আমি তোমার কাছে আকুতি জানাই, কেননা তুমিই বানাও, তুমিই গড়।

আমি প্রতি দিন প্রসারমান ও ক্রমবর্ধমান নৈরাজ্য দেখতে পাচ্ছি,
আমরা মরে যাচ্ছি আর শত্রুপক্ষের মৃতরা ক্রমশ কবর থেকে বেরিয়ে আসছে।

তারা হেদায়াতের পথকে সমূলে উৎপাটন করার দৃঢ় সংকল্প করেছে,
আর এমন অনেক অভাগা আছে যারা নিজ দুর্ভাগ্যবশত: খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

আমি ধর্ম বিষয়ে উদাসীনদের বস্তু জগতের মোহে কাঁদতে দেখছি,
আর যে ধর্মের জন্য কাঁদে, তাকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

অতএব হে ইসলামের সাহায্যকারী খোদা! হে আহমদ (সা.)-এর প্রভু!!
আমাকে তোমার বিশেষ সাহায্য দিয়ে উদ্ধার কর, কেননা আমাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে।

হে সেই রসূলের প্রভু! যাঁকে তুমি সকল মহান পদমর্যাদা দান করেছো,
আর এমন পদমর্যাদা দান করেছো, যা দেখে জগৎ বিস্মিত।

তুমি সদা-সর্বদা স্নেহ, দয়া ও রহমতেরই পরিচয় দিয়েছো,
আমি কখনও বঞ্চিত থাকিনি বরং বরাবর সম্মানই পেয়েছি।

তাই আমাকে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদের গ্রাসে পরিণত করো না,
তুমি আমার সেই অদ্বিতীয় খোদা যে সকল ভ্রান্তি ক্ষমা করে থাকো।

তুমি তত্ত্বাবধায়ক আর তুমিই সকল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু,
তুমিই সুরক্ষক, তুমিই আমায় সাহায্য কর এবং সম্মান দান কর।

প্রভুর দ্বার ছাড়া বাকী সবই নিছক লাঞ্ছনা,
প্রভুর জ্যোতি ছাড়া বাকী সবই নোংরামী ও পঙ্কিলতা।

আমাকে তোমার পক্ষ থেকে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান ও হেদায়াত শিখানো হয়েছে,
তুমি যাকে যোগ্য মনে কর তাকে নিজ কৃপায় হেদায়াত দাও আর আলোকিত কর।

আমার কাছে যখন স্পষ্ট হলো, আমার জ্ঞান সুগভীর,
তখন আমি বুঝে নিলাম, আমাকে অচিরেই কাফির আখ্যা দেয়া হবে।

তাঁর অনুগ্রহে হেদায়াত লাভ করার পর,
অস্বীকারকারীদেরকে আমি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে এসেছি।

নিশ্চয় সত্যান্বেষীর কাছেই হেদায়াত ফিরে ফিরে আসে,
কিন্তু যে নিজের দু'চোখ বন্ধ করে রেখেছে তার পক্ষে দেখা কীভাবে সম্ভব?

খোদার কসম! যে সন্ধান করে সে কখনও বঞ্চিত থাকে না,
যে হেদায়াত লাভের চেষ্টা করে তাকে সাহায্য করা হয়।

যার সবচেয়ে বড় চিন্তা-ভাবনা হলো ভোগ-বিলাসিতা ও দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ,
তার পক্ষে পবিত্রতা অর্জন করা কীভাবে সম্ভব?

হে কাফির আখ্যাদাতা! এই স্বেচ্ছাচার পরিহার কর,
আর সেই প্রভুর ক্রোধকে ভয় কর, যিনি বলেছেন 'লা তাকফু' সুতরাং সাবধান!

নিশ্চয় ধর্মের জ্যোতির বিস্তারের সময় এসে গেছে।
তুমি আমাদের বৃক্ষকে ফলের মাধ্যমে চিনতে পারবে।

হায় পরিতাপ! সে ব্যক্তির ধ্বংসের জন্য!
যে না জেনে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আর কাফির আখ্যা দেয়।

আমি আমার জাতির কাছে দূরবর্তী কোন দেশ থেকে হঠাৎ ভেসে আসিনি,
নিশ্চয়ই তারা আগে থেকেই আমাকে চিনতো তা সত্ত্বেও এরা অস্বীকার করেছে!

যারা আমার সাথী ছিলো, তারা সকলে আমা হতে মুখ ফিরিয়ে নিলো,
কবরে নিঃসঙ্গ পরিত্যাক্ত ব্যক্তির মত আমাকে একা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

হায়! তাদের কথার বাড়াবাড়ি যদি প্রকাশ না পেত,
কিন্তু যে কথা প্রকাশ্য সভায় বলা হয় তা-কি গোপন থাকতে পারে?

আমার শত্রু সত্যকে অগ্রাহ্য করে নেকড়ের মত হুঙ্কার দিচ্ছে,
কিন্তু আমি যে কথা উল্লেখ করি তারা তার জ্ঞান রাখে না।

তার চোখকে আধ্যাত্মিক কোন জ্যোতি দেয়া হয়নি,
তাই সে অজ্ঞতাবশত মাটির কীটে পরিণত হয়েছে এবং অস্বীকার করে যাচ্ছে।

এরা এমন জাতি, যারা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাকে বিনষ্ট করেছে,
তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে আর নিজেদের মিথ্যাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছে।

আমার প্রভু, আমার হৃদয়ের গোপন কথা আর তাদের গুপ্ত রহস্যকে জানেন,
আর সকল প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত বিষয় তাঁর সামনে উপস্থিত ও প্রকাশ্য।

আমি যদি মহা সর্বাধিপতি খোদার দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত হতাম,
সেক্ষেত্রে আমাকে মিথ্যাবাদী ও কাফির আখ্যাদাতা জাতির শত্রুতা নির্ঘাত ক্ষতি করতো।

তারা আমাকে কাফির আখ্যা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আমাকে লানত করার বিষয়ে সদা প্রস্তুত,
অথচ তারা জানে না, সুরক্ষক তত্ত্বাবধায়ক খোদা সবকিছু দেখেন।

যখন আমাকে বলা হলো, তুমি রসূল! তখন আমি ভাবলাম,
আমাকে এমন এক বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে যা জাতির পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

আমি সত্যের জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তারা অন্ধত্বের কারণে বক্রতা বেছে নিলো,
অতএব বল, অন্ধ ও দৃষ্টিবান কি সমান হতে পারে?

আহমদ (সা.)-এর পথ ও হেদায়াত ছাড়া আমাদের আর কোন ধর্ম নেই,
হায়! কাফির আখ্যাদাতা কি ভাবছে তা যদি আমি জানতে পারতাম?

দোষারোপকারীর সকল অত্যাচার আমি উপেক্ষা করে আসছিলাম,
কিন্তু তা ছিল সর্বগ্রাসী এক মহা অত্যাচার।

অনুসন্ধানীর জন্য অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছি (লিখেছি),
ভেবেছিলাম, একজন চিন্তাবিদ আলেম এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবে।

হে চরমপন্থী অহংকারী! তুমি আমার লাঞ্ছনা কামনা করছ!
অথচ সম্মানিত খোদা আমাকে সম্মান দিচ্ছেন।

যখন আমি মুসলমান হওয়ার দাবী করলাম তখন তুমি আমাকে কাফির আখ্যা দিলে।
হে ধৃষ্ট! তোমার তাক্ওয়া কোথায় গেল?

আমার বিবৃতি প্রদানের পর তুমি অস্বীকার করে পালাবে কোথায়?
হে হতভাগা! তবে কি তুমি অদৃশ্যজ্ঞাতা অন্তর্যামী?

হে প্রবৃত্তির টানে মোহগ্রস্ত! তুমি নিজ হাতে মরণ সুধা পান করো না,
তোমার কি হয়েছে? তুমি নিজেকে কেন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছো?

তোমার মাঝে খোদাভীতি না থাকলে নির্দ্বিধায় আমাকে অবিশ্বাসী বলতে পারো,
সাবধান! এমন যুগ আসন্ন যখন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে এবং সব বিষয় অবহিত হবে।

সকল সৌভাগ্যবানদের হৃদয় সত্য সনাক্ত করতে পারে,
আর দুর্ভাগা তখনই বুঝে যখন সে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আমি আমার আমিত্ব, জড় দেহের মোহ এবং প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করেছি,
তাই এখন গালাগালি আমায় কষ্ট দেয় না আর প্রশংসা আমাকে অহংকারীও করে না।

আর কত শত্রু চরম কষ্ট দেয়ার পর আমার কাছে এসেছে,
আমি তখনও অবজ্ঞা দেখাই নি আর পূর্বেও কোন সময় অবজ্ঞা করতাম না।

আমি তার প্রতিও ভালোবাসা প্রদর্শন করি–যে আমাকে ভালোবাসে না,
আর আমি তার জন্যও দোয়া করি, যে আমাকে অভিশাপ দেয় এবং অপলাপ করে।

অতএব নম্রতাকে অবলম্বন কর, কেননা নম্রতা ও কোমলতা সকল পুণ্যের মূল,
আর আমার প্রভু প্রত্যেক অহংকারীর মাথা গুঁড়িয়ে দেন।

আমি সেই অন্ধের অবস্থা দেখে বিস্মিত যে নিজ চোখের চিকিৎসা করে না,
দৃষ্টিবান থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর হাসি ঠাট্টা করে।

তুমি কি সে সকল আবর্জনাকে ভুলে গেছো, যা খেয়ে তুমি সন্তুষ্ট ছিলে?
অথচ যা অতি উত্তম ও সবচেয়ে পবিত্র তাকে তুমি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছো।

হে ধূর্ত খেঁকশিয়াল! তুমি অজ্ঞতাবশত আমার নাম শিয়াল রেখেছ?
কিন্তু চিন্তা শক্তি খাটালে আমাকে তুমি সিংহ হিসেবেই দেখতে পাবে।

আমাদের কথা শুনে তত্ত্বজ্ঞানীদের অশ্রু ঝরে পড়ে,
কিন্তু অথর্ব তা শুনে হাসিঠাট্টা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

তুমি অন্যায় অহংকার ও ঘৃণাবশত আমাকে দোষারোপ কর।
কিন্তু এটি কীভাবে সম্ভব? সত্যে প্রতিষ্ঠিতকে কীভাবে দোষারোপ করা যেতে পারে?

আমরা গোটা জগতের অত্যাচার সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করেছি,
আমরা সেই প্রভুর কোলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি যিনি সর্বশক্তিমান।

আমরা হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করেছি, খোদা তা'লাই সত্যবাদীর জন্য যথেষ্ট,
তাঁর অনুগ্রহে সত্যবাদী গৃহীত ও মনোনীত হয়।

যার তরবারী মানুষকে হত্যা করে সে বীর পুরুষ হতে পারে না,
প্রকৃত বীর পুরুষ সে– যে অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করে।

আমার অভিজ্ঞতা হলো অত্যাচার অত্যাচারীদের নাকে অপকর্মের ছাপ রেখে যায়,
কিন্তু অত্যাচারীর দেয়া কষ্টের ছাপ মিটে যায়।

হে ত্বরাপ্রবণ! তুমি কি আমাকে কাফির আখ্যা দিচ্ছো ?
কোন্ সেসব লক্ষণ যার ভিত্তিতে তুমি আমাকে কাফির আখ্যা দাও?

নিশ্চয় আমার নেতা হলেন, রাসূলদের শিরোমনি আহমদ (সা.),
আমার প্রভু খুব ভাল জানেন, পথিকৃৎ নবী হিসেবে তাঁকে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট।

নি:সন্দেহে মুহাম্মদ (সা.) হলেন হেদায়াতের সূর্য,
আমরা ঈমানের সাথে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছি আর এ কারণেই আমরা কৃতজ্ঞ।

তাঁর পদমর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে,
তাঁর ঔজ্জ্বল্য এতো বেশি যা কল্পনাও করা যায় না।

খোদার নবীকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে কি?
রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) চেহারাকে বাদ দিয়ে তাঁর চেয়ে বেশি আলোকিত চেহারা আর আছে কি?

হে সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু! তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক,
সকল অন্ধকারের জন্য তোমার চেহারার নূর হলো একটি সূর্য তুল্য।

অদ্বিতীয় খোদা ও তাঁর বাহিনী তোমার প্রশংসা করেন,
আর প্রভাত যখন উদিত হয়–তখনও তা তোমার প্রশংসা করে।

আমি নবীদের ইমাম (সা.)-এর প্রশংসার গান গেয়েছি,
কিন্তু তিনি আমার প্রশংসার ধরা ছোঁয়ার বাইরে অতীব গরিয়ান ও শ্রেষ্ঠতর।

তাঁরা মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য সব ধরনের গর্ব পরিহার করেছে,
তাঁর মহা প্রতাপের জৌলুসের কাছে সূর্যও অতি তুচ্ছ।

হে জগদ্বাসী! তাঁর প্রতি সালাম ও দরূদ প্রেরণ কর।
তাঁর খাতিরে যাবতীয় বিতন্ডার পথ পরিত্যাগ কর, যার ফলশ্রুতিতে পুরস্কৃত হবে।

খোদার কসম! আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ করেছি,
আর আমি তাঁর জ্যোতিতেই প্রতিটি মুহূর্ত আলোকিত হই।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর কল্যাণে সৃষ্ট বাগানে অর্পন করেছেন,
সেখান থেকে আমি ফল কুড়াই এবং সতেজ হই।

আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁর ধর্মের জন্য একটি ব্যাকুলতা রয়েছে,
নিশ্চয় আমার বিবৃতি আমার অন্তরের কথা তুলে ধরছে।

আমি মুস্তফা (সা.)-এর প্রদত্ত জ্ঞান ভান্ডারের উত্তরাধিকারী হয়েছি,
আমার প্রভুর দান অগ্রাহ্য করে অবাধ্য হওয়া আমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব?

আর এটা কীভাবে সম্ভব? যে ক্ষেত্রে আমি ইসলামের ভালোবাসায় এর সপক্ষে দাঁড়িয়েছি,
আর দিনরাত এর জন্য কাঁদি এবং ব্যাকুল থাকি।

আমার অশ্রু চোখের কোণ থেকে উপচে পড়ছে,
আমার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত আগুনের ন্যায় হাহাকার বিদ্যমান।

আমার ঈমান খাঁটি কস্তুরির মতো সৌরভ ছড়িয়েছে,
আমার হৃদয় তৌহীদের কারণে সুরভিত প্রাসাদ সম।

প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমার খাদ্যাহার আসে
এমন স্বচ্ছ সুপেয় পানিরূপে যার স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হয় না।

কথা বলার সময় আমার তত্ত্বজ্ঞান অন্ধকারকে আলোতে বদলে দেয়,
আমার কথা খোদার অনুগ্রহে আলোক উজ্জ্বল মোতি তুল্য।

আমার যুক্তির দিকে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রেমিকের ন্যায় চেয়ে থাকে,
আমার কথা প্রতিটি সন্দেহের কোমর ভেঙ্গে দেয় আর এর মূলোৎপাটন করে।

আমার ইলহামের ঔজ্জ্বল্য রাতকে আলোকিত করে,
আর আমার দিব্যদর্শন প্রভাতের ন্যায়, যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই।

আমার বাণী প্রখর তরবারীর ন্যায় ধারালো,
আর আমার কথা পাথরের গায়েও দাগ কাটে।

স্বর্গীয় শক্তির মাধ্যমে আমি আমার নিজের অস্তিত্বকে পরাস্ত করেছি,
ফলে, আমার হৃদয় প্রবল বেগে প্রবহমান নদী সদৃশ হয়ে গেছে।

আমার অবিরাম দোয়া যুদ্ধের সময় শত্রুকে নিধন করে,
অতএব শুভ সংবাদ সেই হৃদয়ের জন্য যা একে ভয় করে আর সাবধান হয়।

আমার জাতি গালমন্দ ও অভিশাপ দিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে,
এমন কত মুখ আছে, যার সামনে খঞ্জরও হার মানে না।

যখন আমার জাতির নেতারা আমাকে অবজ্ঞা করলো-
আমি বললাম, তোমরা সরে যাও! অচিরেই গুপ্ত বিষয় প্রকাশিত হবে।

জাতির একশ্রেণী আমার সত্যতা অস্বীকার করে না,
কিন্তু আরেকটি দল আমার সকল কথাকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে।

আমি যে কাজই করার ইচ্ছা করেছি তারা তাতে বাঁধা সৃষ্টি করেছে,
তাদের সকলেই আমাকে ভয় দেখায় অথচ আমার প্রভু আমাকে শুভ সংবাদ দেন।

আমি এ বিষয়ে সেই খোদার কসম খেয়েছি, যিনি মহা মহিমান্বিত!
তিনি আমার শত্রুকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাকে কোপানলে ফেলবেন।

আমি সাহায্যকারী খোদার সাহায্য বঞ্চিত নই,
যখন রাতের ঘোর অন্ধকার আমাকে ঢেকে ফেলে তখন একটি জ্যোতি আমাকে আলোকিত করে।

আমার প্রভু আমাকে পথ দেখিয়ে সত্য হেদায়াত পর্যন্ত নিয়ে গেছেন,
তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান থেকে সম্মান দিয়েছেন, তাই আমি সম্মান পাচ্ছি।

আমার সম্মানিত প্রভু দানের ক্ষেত্রে বড়ই উদার,
আর আমার কাছে আমার দাতা প্রভুর উপচে পড়া দান রয়েছে।

তাঁর ছায়া আমার উপর সদা প্রসারিত,
আমার উপর তাঁর ক্রমবর্ধমান ও অফুরন্ত নিয়ামত রয়েছে।

একজন মুজাদ্দিদের আবির্ভাবে– তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো?
এসো! যুগের বিশৃঙ্খলার ভয়াবহতার দিকে চেয়ে দেখ এবং চিন্তা কর।

হে অহংকারী! তোমার সামনে সর্বগ্রাসী নৈরাজ্য বিরাজ করছে,
তারপরে তুমি মু'মিনদের গালি দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাও আর বাজে কথা বলো।

ইসলামের জন্য এটি মহা বিপদের যুগ!
আমার মত মানুষকে কাফির বলা হচ্ছে অথচ বাগান শুকিয়ে কাঠ!

কুফরীর কিছু লক্ষ্মণ রয়েছে আর ধর্মেরও রয়েছে কিছু লক্ষণ,
অতএব সেসব লক্ষণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হও এবং চিন্তা কর।

তুমি কি মনে কর, খোদা তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন?
তুমি কি সে সকল ঐশী প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেছো, যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট?

খোদার প্রতিশ্রুতি এমনভাবে পূর্ণ হতে দেখবে যা তুমি ভাবতেও পারো না!
কিন্তু প্রখর দৃষ্টি তা দেখবে এবং উপলব্ধি করবে।

শত্রু জানতে পেরেছে, আমি সাহায্যপ্রাপ্ত,
কিন্তু তারা বিদ্বেষবশত প্রত্যাখ্যান করেছে।

হে ভাইয়েরা! আনন্দিত ও উৎফুল্ল হও। তোমরা কত সৌভাগ্যবান,
তোমাদের জন্য রইল বড় এক নতুন ঈদের শুভেচ্ছা।

সত্যের তরবারীকে কোন যুগে কেউ ভাঙতে পারে না,
কিন্তু তারা যা লৌহদ্বারা প্রস্তুত করছে তা ভেঙ্গে দেয়া হবে।

বল দেখি, খোদার পক্ষ থেকে নির্দশন লাভ করে যে সমর্থনপুষ্ট হয়,
এবং যার পক্ষে রহস্য উন্মোচিত হয়-এমন ব্যক্তিকে গালি দেওয়া কি সাজে?

আমার প্রভুর হাতেই সকল সম্মান ও নেতৃত্ব নিহিত,
আর যে তাঁর স্নেহপুষ্ট সে তোমাদের চক্রান্তে কখনও অপদস্ত হবার নয়?

কে আছে যে আমার শত্রুতা করবে যে ক্ষেত্রে আমার প্রভু আমাকে ভালোবাসেন?
আর কে সে যে আমাকে পাথর ছুড়বে যে ক্ষেত্রে আমার প্রভু আমাকে সম্মান দিয়েছেন?

প্রতিদিন আমরা সাহায্যের পর সাহায্যের নিদর্শন দেখি,
সেই পরম প্রেমাস্পদ আমাদের কাছে এসে শুভ সংবাদ দেন।

আমি এমন নই যার লক্ষ্য অর্জনে কোন তরবারী বাঁধ সাধতে পারে,
অতএব কুফরীবাজ কীভাবে আমাকে গালি দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারে?

সে জানে, গালি দিয়ে সে স্বয়ং তাকওয়ার পথ পরিত্যাগ করছে,
এ ধরনের বাচাল ওয়াজকারীদের জন্য মিম্বরও আক্ষেপে কাঁদে।

আমাদের দৃষ্টিতে তার ওয়াজ কেবল নৈরাজ্যের কারণ,
তার শত্রুতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর বেড়ে চলেছে।

সে আমায় কাফের আখ্যা দানে এতদূর এগিয়েছে যার ফলে আমরা ভাবলাম,
কুফরী ফতোয়া প্রদানের মোহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করতে হলেও–সে করবে।

আমি তার কাজে হতবাক! সে নিজের দুষ্কর্মকে পরিত্যাগ করে না,
অথচ হিতোপদেশদাতা তাকে সকল প্রকার সদুপদেশ দিয়েছেন।

এ যুগের বিস্ময়কর বিষয় হলো, আমি নাকি কাফের!
বরং সবচেয়ে বড় কাফের আর তাও এক হিংসুকের দৃষ্টিতে!

আমি হিংসুকের দল এবং তাদের গালা-গালিকে কীভাবে ভয় করতে পারি?
যেক্ষেত্রে, আমার প্রভু আমায় প্রতিনিয়ত দয়া করছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন, সাহায্য করছেন।

আমি আমার প্রভুর পথে আগত বিপদাপদকে ভালোবাসি,
কেননা, তা আমার জন্য সকল আমোদ-প্রমোদ থেকে পূত-পবিত্র।

হে ভয়াবহ শত্রু- যে রাগের বসে হিংস্র প্রাণীর মত আক্রমণ করে,
সত্বর তুমি জানতে পারবে তোমার কী পরিণতি হবে।

যেসব গোপন রহস্য তোমার অজানা তুমি তার অনুসরণ করো না,
এমন কত সত্য জ্ঞান রয়েছে যা গোপন ও প্রচ্ছন্ন থাকে।

তোমার অজ্ঞতার দীর্ঘসূত্রতা আমাকে বিস্মিত করেছে!
অথচ সুপুরুষ সেই অজ্ঞতার পর যার চৈতন্যোদয় হয়।

বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি কি জীবিতকে মৃতের মত কবরস্থ করতে চাও?
আর তুমি যা গোপন করো, আমার প্রভু তার সবই জানেন।

হে হেদায়াত প্রত্যাখ্যানকারী! হৃদয়ের ব্যাধি আর কত তোমাকে আক্রান্ত রাখবে?
দুর্ভাগ্যের পথে তুমি আর কতদিন এগুতে থাকবে?

খোদার কসম! নিশ্চয়ই আমি একজন মু'মিন, কখনো কাফিরতো নই।
আমার মতো মানুষ অনাচারী হলে তাকওয়া যাবে কোথায়?

হে শয়তানের পথে বিচরণকারী! তাকওয়া অবলম্বন কর!!
সাবধান হও! সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী খোদা সম্পর্কে হিতোপদেশ গ্রহণ কর।

কত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে জাগ্রত হয় এবং ক্ষান্ত হয়!
আর প্রভুর শক্তি এবং সেই তরবারীকে ভয় করে যা রক্ত ঝরায়।

খোদার কসম! আমি তাঁর পক্ষ থেকে সংস্কারক হিসেবে এসেছি।
এমন সময় এসেছি! যখন কাবুকারী আগ্রাসী দানব সকল মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর কিতাবের জ্ঞান শিখিয়েছেন,
আর আমাকে তা দেয়া হয়েছে যা প্রচ্ছন্ন ও গোপন ছিল।

কুরআন মজীদের লুক্কায়িত রহস্য আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছে,
সর্বজ্ঞানী এবং স্বাচ্ছন্দ্যদাতা খোদা এটা আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

যেন সব অধরা কুমারী তাদের উজ্জ্বল মুখায়ব নিয়ে বেড়িয়ে এসেছে,
এমন সব গুহার মাঝ থেকে যা ছিল অতল গহ্বরে।

শোন! এ যুগ পুনরায় হেদায়াতের পানে ফিরে যাচ্ছে,
আমার আগমন তোমাদের জন্য শুভ হোক, তোমরা উৎসব করো ও আনন্দিত হও।

আমার স্রষ্টা আমাকে বেছে নিয়েছেন এবং সম্মান দিয়েছেন,
তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন এবং মনোনীত করেছেন; অতএব চিন্তা কর।

খোদার কসম! আমার বিষয়টি আমার সামনে মোটেই অস্পষ্ট নয়,
আমি তাঁর জ্যোতি ভালো চিনি এবং অস্বীকার করি না।

যখন মানুষের ধার্মিকতা কমে যায় তখন তার খোদাভীতিও হ্রাস পায়,
সে দুর্ভাগ্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হয় আর প্রতারণার আশ্রয় নেয়।

যে হীনতাবশত কুধারণা করে সে অবশ্যই অধঃপতিত হয়,
অতিমাত্রায় হিংসাকারী কুধারণার কারণে অবশ্যই ধ্বংস হয়।

সে জানে না হায়! মৃত্যু কত কাছে,
নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে মৃত্যু এসে যাবে।

মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে আর নির্ধারিত মুহূর্ত এসে পড়ে
তখন অনুশোচনার হা-হুতাশ কী উপকার সাধন করে?

হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের মৃত্যুরক্ষণ স্মরণ কর
সাবধান! আগ্রাসী পিশাচ যেন তোমাদের ধ্বংস না করে।

তোমাদের আয়ূষ্কালের মূল ভীত নড়ে গেছে,
রয়ে গেছে একটি নিবুনিবু প্রদীপ অথবা এর চেয়ে তুচ্ছ কিছু।

মৃত্যুর ছোঁয়া অচিরেই তোমাকে মৃত্যুর কফিনে বহন করে নিয়ে যাবে।
অথচ ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য নিয়ে গর্ব করতে ব্যস্ত তুমি।

শোন! খোদা ছাড়া কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়,
আর খোদা ছাড়া যত সাথী আছে সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করবে।

তাঁকে পাবার চেষ্টায় তত্ত্বজ্ঞানীদের রক্ত ঝরার কথা স্মরণ কর।
এখনও কি তোমার ভয় করার সময় হয়নি? নাকি তুমি বল্গাহীন স্বাধীন ?

নিশ্চয় মৃত্যু শক্তিশালী ও প্রবল গতি সম্পন্ন ঘোড়া সদৃশ,
যে মুহূর্তে আদেশ জারি হয়– তারা ধূলা উড়িয়ে ছুটে আসে ।

আমাদের শেষ দোয়া হলো- 'সকল প্রশংসা সেই মহান অস্তিত্বের,
যিনি আমাদের পবিত্রকৃত লোকদের পথে পরিচালিত করেছেন।'

খোদার অপার অনুগ্রহ ও কৃপায় সমাপ্ত হলো।